পূর্ণেন্দু পত্রী

৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

এই উপন্যাসের প্রথম পাঠক
বন্ধুবর নিমাই সুরকে

জীবন যদি ইচ্ছাকৃত ঘটনাবলীর সমষ্টি হয়, তাহলে এত অন্তর্দ্বন্দ্ব কেন জীবনে?

এক

গ্রামের নাম বাখুরী। তার তিনভাগ স্থল। একভাগ জল। গুটি দশেক পুকুর, জমিদারবাবুদের প্রকাণ্ড মজা পদ্মদীঘি, পানায় পাঁকে বুজে যাওয়া গড়খাই আর গ্রামের সীমানা-সরহদ্দের মধ্যে খালের যেটুকু অংশ পড়ে সব মিলিয়ে একভাগ। স্থল তিনভাগের মধ্যে ধানের জমি আছে। পানের বরজ আছে। খামারের জন্যে খালি জায়গা আছে। গ্রামের শেষ প্রান্তে শ্মশান আছে। বাকী যা সব ঘর-গেরস্থি। ঠাকুর-দেবতার মন্দির। আর একটি যা ইস্কুল। প্রাইমারী।

গাঁ একটা কিন্তু পাড়া দুটো। মধ্যিখানে খাল। চন্দনপিঁড়ির খাল। রূপনারায়ণের সঙ্গে লাগোয়া। বাখুরী থেকে মাইল দেড়েক দূরের বাজারে পৌঁছে শেষ। কলকাতা থেকে বড় নৌকোয় খাল-মুখ পর্যন্ত মাল চালান আসে। তার পর ডিঙিতে বোঝাই হয়ে সে-সব বাজারে পৌঁছয়।

দুটো পাড়ার দুটো নাম। উত্তর পাড়া। আর দখিণ পাড়া। জাত-গোত্র এক। কিন্তু অবস্থা এক নয়। দু-পাড়ার লোকই চাষ-আবাদ করে। তার মধ্যে দখিণ পাড়ায় পানের বরজটা বেশি। তাদের ঘরে তাই কাঁচা টাকার গরম। উত্তর পাড়াতেও পানের বরজ আছে। তবে একটা দুটো। ক্ষেত-খামারেই তাদের মনোযোগ বেশি। প্রায় ঘরই ভাগচাষী। দু-পাড়ারই কিছু সংখ্যক লোক কলকাতা ও বাইরের শিল্পাঞ্চলে চাকরি করে।

সম্মান বেশি উত্তর পাড়ার। গাঁয়ের পুরনো ইট-খসা জমিদারবাবুদের জীর্ণ-অট্টালিকার জাঁকজমক আর অবস্থাপন্ন ও শিক্ষিত কয়েকঘর ব্রাহ্মণবংশ এই পাড়াতেই। বুড়ো-শিবের আটচালায় পুজো-পার্বণ, গাজন-চড়ক, রাসের উৎসব, ময়লা-অষ্টপ্রহরের গান ইত্যাদি সব কিছু আনন্দের অধিবাস বলে উত্তর পাড়ার মানুষের মনে একটা চাপা গর্ব আছে।

দখিণ পাড়ার যে কিছুই নেই তা নয়। মা শীতলার মন্দির আছে। তবে সেটা মাটির। বুড়ো শিবের মত শান্-বাঁধানো নয়। মা শীতলার ভাঙা নোনা-লাগা, দুমড়নো মন্দিরে প্রত্যেক শনিবার 'ভর' বসে। ভিনগাঁয়ের

লোক ঢাক-ঢোল বাজিয়ে পুজোর ডালা সাজিয়ে মানত-মানসিকের পাঁঠা বলি দিয়ে যায়। যে রোগের যে ওষুধ, যে ব্যামোর যে বিধান, শীতলা মা'র পায়ের তলায় ভিরমি-খাওয়া 'বিষোহরি'র গোঁ গোঁ করা অবিশ্রান্ত গর্জনের মধ্য সে-সব স্পষ্ট শুনতে পাওয়া যায়। সে ওষুধে বাঁজার কোলে ছেলে আসে। যে-পোয়াতির প্রতি বছরে গর্ভ নষ্ট হয়ে যায়, তার চোখের জলে ভাঁটা পড়ে। হারানো জিনিস ঘরে ফেরে আবার। এমন কি চোরের বাড়ির নিশানা পর্যন্ত বাতলে দেয় কোন কোন দিন। তাই দশ-বিশ ক্রোশ জুড়ে বাখুরী গাঁয়ের মা শীতলার এত নাম-ডাক। বলে—'জাগ্রত শেতলা'। বেশি আসে মেয়েরা। বেশির ভাগ রোগ মেয়েলী। বাজনা-বাদ্যিতে সরগরম এই নিয়মিত পূজানুষ্ঠানটির জন্যে দখিণ পাড়ার লোকও মনে মনে আত্মপ্রসাদ উপভোগ করে। উত্তর পাড়ার উৎসব মাঝে মাঝে। এটা যে নিয়মিত।

শীতলা মা'র 'ভর'কে নিয়ে একটা গল্প চালু আছে।

একবার নাকি এক বুড়ী পান-সুপুরি দিয়ে মায়ের মন্দিরের দরজায় ধন্না দিল। কার কি প্রার্থনা বা জিজ্ঞাসা তা ত কোনদিনই বলতে হয় না। ভর-লাগা 'বিষোহরি' মন থেকে টেনে বার করে সে-সব মন্ত্রের জোরে। এবারেও তেমনি বললে—বেটি, তোর হারিয়েছে। গোঁ গোঁ। হারিয়েছে ত? গোঁ গোঁ। ফিরে পাবি। ফিরে পাবি। ভয়-ভাবনা নেই। গোঁ গোঁ।

বুড়ী ত শুনে মন্ত্রমুগ্ধ। সাধে কি আর বলে 'জাগ্রত শেতলা'। সত্যির বোল সত্যি—হারিয়েছেই ত বটে।

বুড়ী বলে—তা বাবা-ঠাকুর, কি করে সে হারানিধিটিকে ফিরে পাই বলে দিবেন নি?

গোঁ গোঁ। পাবি রে বেটি, পাবি। ঠিক ত্রিকাল সোন্ঝের সময় বাসি কাপড় ছেড়ে গা ধুয়ে, মায়ের নামে সোয়া-পাঁচ আনার মানসিক তুলে তোদের বাড়ির যে বৌ-এর কুসু ছেলে নষ্ট হয় নি তাকে চালের বাতাটা খুঁজে দেখতে বলিস। পেয়ে যাবি।

বুড়ী একদম হতভম্ব। চালের বাতায় কি খুঁজে পাবে? তার যে গরু হারিয়েছে আজ তিনদিন। গাভিন গাই!

ভক্তিমানেরা বলে মা শীতলা জাগ্রতই বটে। কিন্তু 'বিষোহরি' ত মানুষ। মানুষের ত ভুল-চুক, মনের 'বেরভম' হবেই এক-আধদিন।

চারপাশে মিহি ধুলোর রাজত্ব। তার ওপর এমনি ভুল-চুকে-ভরা অসংখ্য মানুষের মাটির সংসার, মোটামুটি জীবন।

ধরিত্রী ধান দেয়। আকাশ জল ঢালে। রোদ তাপ ছড়ায়। বাতাস নিশ্বাস যোগায়। মহাজনের কাগজে টিপসই দিলে ধার-কর্জ মেলে। জমিদারের হাতে-পায়ে ধরলে খাজনা বাকী রাখা যায়। দেবদেবীর কাছে মানত-মানসিকে আশীর্বাদ ফলে। কেউ জন্মালে এ-পাড়ার দাই ও-পাড়ার আঁতুড় ঘরে গিয়ে রাত জাগে। কেউ মরলে ও-পাড়ার শ্মশানে এ পাড়ার লোক কুই সাজায়। এর মৃত্যু ওর বুকে শেল হানে।

বিদ্যা ও বুদ্ধির বিড়ম্বনা এখানে সংক্রামিত হয় নি। ব্যাধি এখানে প্রতিকারহীন। দুঃখ ও মৃত্যু বিধাতার দান। শ্রম ও শক্তি জীবিকার শ্রেষ্ঠ অবলম্বন। উদরপূর্তিই জীবন। জীবনের গতি মন্থর ঢিমে ও পুকুরের জলের মত সীমাবদ্ধ। শুধু চতুর্দিকে উদার প্রকৃতি রচনা করে রেখেছে মানুষের সবচেয়ে বৃহত্তর মহত্তর স্বপ্ন সম্ভাবনা বা আকাঙ্ক্ষারাশির মত চিত্ররূপময় নৈসর্গিক পটভূমি।

রজনী এই উপাখ্যানের নায়ক। বাড়ি তার উত্তর পাড়ায়। সাঁত-বংশের ছোট ছেলে। এককালে এই সাঁত-বংশ বড় বংশ ছিল। রজনীর বাপ-ঠাকুর্দা কি তারও আগের পূর্বপুরুষদের কেউ কেউ বংশানুক্রমে জমিদার-বাড়ির খিদমত খেটে এসেছে বাঁধা মাইনেয়। গাঁয়ে তাদের মান-মর্যাদা আছে।

রজনীরা তিন ভাই। বড় সুরেন। মেজ রমণী। ছোট রজনী। সুরেন চারটে ছেলের বাপ। রমণীর বৌ বাঁজা। রজনীর মনে বে'-র উচ্চবাচ্য নেই। জন্ম থেকেই রজনী এক বেখাপ্পা জীব। কারুর মতে মেলে না। কারুর বাঁয়ে ফেরে না। সকলের কাছে যা সিধে ওর কাছে তা বাঁকা। ওর মনের হদিস পাওয়া ভার।

অথচ রজনীর শরীরের গড়ন-পিটনটা দু-দণ্ড দাঁড়িয়ে দেখার মত। সুরেন বেঁটে-খাটো। রমণীর চারকোণা মুখ, চ্যাপ্টা চোয়াল, চোখে-মুখে রুক্ষ মেজাজের ছাপ। তবু রমণীই সকলের চেয়ে কিছু ফর্সা। রজনী সুরেনের মতই কিংবা আরও একটু বেশি কালো। কাদাটে রঙ। কিন্তু তার শরীরের সবটাই মাপা-জোখা। প্রায়ই ভুল-চুক, কাজে অবহেলা অমনোযোগ দেখে বিধাতা পুরুষ হয়ত বিশ্বকর্মাকে খুব দাবকানি দিয়েছিলেন একদিন। সৌভাগ্যক্রমে সেইদিনটাই ছিল হয়ত রজনীর জন্মদিন। তাই মানুষকে

দেখতে যা হয় তা না হয়ে মানুষকে দেখতে যেমন হওয়া উচিত সেইরকম স্বাস্থ্যটাই পেয়েছে রজনী।

রজনীর বেখাপ্পা স্বভাবের কাহিনী কানে শুনে যে-সব মেয়ের বাপ শুভকাজের ভরসা করতে পিছোবে, রজনীর খোদাই-করা চেহারাখানা চোখে দেখে তাদের মন গররাজী হতেও কষ্ট পাবে কিছুটা।

শ্রীপতি বাড়ী গত বছর কথাটাকে মনের মধ্যে তালাচাবি মেরে রেখেছিল। এ-বছর উঠে-পড়ে লেগেছে, যাতে তার ছোট মেয়ে সুখি-র দুহাত আর রজনীর দুহাত—চার হাতে জোড়া লাগে। সুখির ভাল নাম সুখদা। বয়স নানারকম। যারা কচি-কাঁচা গুটগুটে ধরনের গেঁড়ি মেয়েকে ঘরের বৌ করে আনতে চায়—তাদের কাছে এগারো। আর রজনীর জন্যে আলাদা হিসেব। বলে, এখন তেমন বাড়-সার নেই বটে। বে'র জল গায়ে পড়ুক। দেখবে বর্ষাকালের কচি-কলাগাছের মত চ্যাড়-চ্যাড় করে বেড়ে যাবে।

শ্রীপতি একদিন ঝড়ুকে গিয়ে বললে—বাবা ঝড়, ইদিকে শুনে যা একটু।

কি বলছিনি শ্রেপতি কাকা।

তোকে বাবা একটা কাজ করতে হবে।

শ্রীপতি ঝড়ুর হাত দুটো ধরে ফেলে। এত লোক থাকতে ঝড়ুর হাত ধরা কেন? না, ঝড়ুই হল রজনীর সঙ্গী-সাঙাত। ওর মনের অন্ধি-সন্ধি জানে। কানে তুললে ওর কথাই তুলবে।

আর এত ছেলে থাকতে রজনীকেই বা পাত্র বাছাই করা কেন? যার স্বভাব-চরিত্রে এত দোষ, যে কিনা একগুঁয়ে-এককাট্টা, উড়ো উড়ো মন, তার হাতে আবার একটা মেয়ের সারাজন্মের জীবন-মরণের ভার তুলে দেওয়া কেন? না, বংশ ভাল। ছেলে দেখার আগে দেখতে হয় বংশ। তার পর দেখতে হয় বংশের সম্পত্তি। মোটা ভাত মোটা কাপড়ে মেয়ের জীবনটা কাটবে কিনা। কিংবা কোনদিন যদি বিষয়-সম্পত্তি ভাগ-ভিনো হয়ে যায়, হিসেব কষে দেখতে হবে—ছেলের ভাগে তার কতটা অংশ আসে। তাতে গতর খাটিয়ে পয়সা এনে মাথা গুঁজবার চালা বেঁধে, নিজের বলতে একটা পুকুর-ডোবা, ছোট্ট একটু শাক-সব্জীর বাগান গড়ে অন্তত সাদাসিধেভাবে সংসারযাত্রাটা চলে যাবে কিনা। সেদিক থেকে রজনী সবটাতেই উতরেছে। আর ঐ যে উড়ু-উড়ু মন, স্বভাব-চরিত্রের বেতালা গতি, বিয়ের আগে সব পুরুষ-মানুষই অমন থাকে—বিয়ের পর সব সেরে যায় নিয়মমাফিক।

তা ছাড়া আরও কারণ আছে। গ্রামের মধ্যে রজনী ছাড়া চাষীর ঘরের আর কোন ছেলে মাইনর স্কুলের পড়া-লেখা শেষ করে হাই-স্কুলের ছাত্র হবার সৌভাগ্য বা ক্ষমতা পায় নি। শেষ পর্যন্ত পড়লে হয়ত অনেক দূর এগোত ওর জ্ঞান-বুদ্ধি। বাবা মারা যাবার পর দাদারা পড়া-শোনার পালা চুকিয়ে দিলে। চাষীর ঘরের ছেলে পাছে লেখাপড়া শিখে হাইকোর্টের জজ-ব্যারিষ্টার হয়ে ওঠে, সেই ভয়েই হয়ত।

আসলে রজনীর স্বভাবে অস্বাভাবিক যা কিছু তা গড়ে উঠেছে তার বাবার অপঘাতে মৃত্যু হওয়ার পরের দিনগুলো থেকেই। শেষ বয়সের সন্তান বলে রজনীর প্রতি তাঁর বড় নিবিড় স্নেহদৃষ্টি ছিল। বাবাকে হারিয়ে রজনী যেন বিরাট বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে একা হয়ে গেল। ক্রমে যত বাড়তে রইল বয়েস, ততই কমতে থাকল চোখের হাসি, মুখের কথা, মানুষ-জনের সঙ্গে মেলামেশা। আকাশ, রোদ, গাছপাতা, শূন্য মাঠ, ভরাট অন্ধকারের মধ্যে চুপচাপ বসে আকাশ-পাতাল ভাবাটাই হয়ে উঠল তার স্বভাব। ভদ্র ও শিক্ষিত বংশের ছেলে হলে এই স্বভাবটাকে দার্শনিক আখ্যা দেওয়া যেত। রজনীর বেলায় লোকে বললে, ছেলেটা পাগলাটে।

আর ওদিকে সুখদাও চাষীর ঘরের আর পাঁচটা মেয়ের চেয়ে চালে-চলনে ভিন্ন জাতের। সে কৃতিত্ব বাপ হিসেবে শ্রীপতির এক ফোঁটাও নয়। সুখদার মামার বাড়ি ইষ্টিশান-ঘেঁষা ভদ্রলোকের পাড়ায়। সেখানকার মেয়ে স্কুলে চার-পাঁচ বছর লেখাপড়া করেছে। সেলাই জানে। একা একা না পারলেও দশ-জনের সঙ্গে গলা মিলিয়ে গান গাইতে পারে। সভ্য জগতের চাল-চলন, নিয়ম-নীতির সংস্পর্শে সুখদার শরীরে মনে লজ্জাবতী কিশোরী হয়ে ওঠা পর্যন্ত দিনগুলো কেটেছে বলেই শ্রীপতির এত ভাবনা মেয়ের গুণের যোগ্য একটা পাত্র বাছাই করার।

বড় মেয়ে তুলসীর বিয়ের জন্যে এত মাথা ঘামাতে হয় নি শ্রীপতিকে। কিন্তু ভদ্রসমাজের ছোঁয়া লেগে সভ্য-ভব্য হয়ে উঠে সুখদা যেন চাষীর ঘরের বিয়ের রীতি-নীতিকে জটিল করে তুলেছে বাছ-বিচারের ঝামেলায়। ঝড়ু বলে—কি রকম কাজ না জেনে হুট্‌ করে কথা দিয়ে যদি না রাখতে পারি, তখন?

রজনীর পেট থেকে তোকে একটা কথা বার করতে হবে।

ঝড়ু আগেই আঁচ করেছিল কথাটা। শুধোয়—কি কথা?

ছেলেটা বে' করবে কিনা। তুই ত ওর মতি-গতির খবর জান্‌ খানিক খানিক। বাবা, তোর গরীব কাকার এই উপ্‌গেরটুকু কর।

কথা দিতে পারব নি কাকা। উ রজো ভারী এককাট্টা। যদি বলে হ্যাঁ ত হ্যাঁ। যদি বলে না ত না। এর আর নড়-চড় নেই। তবে চেষ্টা করবোঁনি কি আর—এ্যাঁ?

শ্রীপতি ঋড়ুর কথাবার্তার মধ্যে খানিকটা আশ্বাস-বিশ্বাসের সুর পেয়ে বাড়ি চলে যায়। কিন্তু উদ্বেগে শ্রীপতির মন দিবানিশি উশখুশ উশখুশ। ঋড়ু হয়ত এতদিনেও বলে নি। ভুলে গেছে।

ঋড়ু সত্যিই বলে নি। বলে নি মানে বলবার মত ভরসা করতে পারে নি।

শ্রীপতি আহত স্বরে ঋড়ুকে একদিন বলে—বাবা ঋড়ু, তুই বুড়ো কাকার কথাটা রাখলু নি।

ঋড়ু মনের ভেতরে লজ্জা-সঙ্কোচ বোধ করে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে বাঁচানোর ফন্দিটাও মগজে টেনে আনে।

শ্রেপতি কা', আমি তোমাকে একটা কাজ করতে বলি। আগে-ভাগে রজোকে না জানিয়ে, ওর দাদাদের কি ওর মার কাছে গিয়ে কুটুম্বিতের কথাটা পাড়। রজো না কইলেই না। কিন্তু বাড়ির লোকজন রাজী হলে, আজ না হোক তুদিন বাদেও রজনী রাজী হবে।

কথাটা শ্রীপতির মনে লাগে। মনে ভাবে—আরে ই ছেলেটার ঘটে বুদ্ধি আছে ত।

ঋড়ু সত্যি সত্যিই ছিল রজনীর এককালের প্রাণের ইয়ার। কিন্তু সে তিন চার বছর আগেকার কথা। তখনকার রজনী আর আজকের রজনীতে আসমান-জমিন ফারাক।

ঋড়ু মনে মনে রজনীকে পর্যালোচনা করে।

যেদিন থেকে চারুবালার পা পড়েছে এই গ্রামের মাটিতে, সেদিন থেকেই রজনীর কপালের লিখন গেছে পালটে। মনে হয় যতদিন না চারুবালা এই গ্রামের বাস ওঠাবে—ততদিন রজনীর এই এক দশা। নইলে যার রূপ-যৌবন গেছে, ঢোসকা পড়েছে গায়ে-গতরে, তার জন্যে এখনও রজনীর এত আঁতের টান কেন?

চারুবালা আর রজনীর ভালবাসাবাসি একদিন ছিল চাপবাঁধা দইয়ের মত জমাট। এখন মুয়োনো ঘোলের মত ছিবড়ে কাটা। পাঁচ বছর আগেকার

সে ব্যাপার নিয়ে আজ কেউ মাথা ঘামায় না। তবু এখনও চারুর চালাঘরে রজনীর যাওয়া আসা দেখে কারুর কারুর মনে এক পলকের জন্যেও খানিক সন্দেহ উঁকি মারে। ভাবে—চারুবালা মন্তর-তন্তর জানে কিছু। শহরের বেপাড়ার মেয়ে। মানুষকে বশে-বাগে আনাই ওদের জাত-ব্যবসা। এসব পাঁচজনের জানা কথা। ঝড়ু কিন্তু আরও কিছু জানে বেশি। রজনীর মুখেই শোনা। বছর দেড়-দুই আগে রজনী আচমকা একদিন ধরলে, ঝড়ু চ' একটু খালের ধারে গিয়ে বসি।

খালের ধারে জমাট কেয়াবনের ঝাড়। গেঁয়ো চাকন্দ আর বন-ঝামা গাছের বন। ফুল নেই, ফল নেই। গাছে পাখীদের কিচির-মিচির নেই। সব চুপচাপ। কেবল খালের জলে ভাটার টানের খলখলানি। আর আকাশে ফালি-কাটা কুমড়োর মত চাঁদের গায়ে চকচকে আনাজ কোটা বঁটির ধার। ট্যাঁকের দুটো বিড়ির একটা ধরায় রজনী নিজে। ঝড়ুকে দেয় আরেকটা। রজনী সেদিন এমন নিরাসক্তভাবে কথা বলে গেল, যেন ওর নিজের জীবনের ঘটনা নয়, অন্য কারুর। শুধু শেষটায় বললে—এখন নিজেকে দোষী মনে হয়। কিন্তু যে পাপ হয়ে গেছে তার কি আর প্রায়শ্চিত্ত আছে? তীর একবার ছুঁড়লে—তাকে কি ফেরানো যায়?

রজনী নিজে মুখে বলেছিল বলেই জানা। নইলে কে আর বাড়ি চড়াও হয়ে খুঁটিয়ে-মিলিয়ে দেখতে গেছে—কার পেটে কার ছেলে, কার ছেলের মুখে কার ছবি।

দুই

চারুবালার কথায় পাঁচ বছর আগের ঘটনায় পিছিয়ে যেতে হয়।

দখিণ পাড়ার শীতল পরামানিক শহরের চাকুরে। কাজটা লোহার দোকানের দালালি। মাঝে-সাঝে দু-একবার গ্রামে আসে। একবার এসেছিল মা মরতে। আর একবার বৌ মরতে। মরেছিল কলকাতায়। কিন্তু শ্রাদ্ধ-শান্তি সব কিছু হল গ্রামেই। টাকা-পয়সারও শ্রাদ্ধ হল অনেক।

তার পর শুরু হল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। বোমার ভয়ে কলকাতা থেকে যখন দলে দলে লোকজন দূর-দূরান্তের গ্রামে-গঞ্জে পালাতে শুরু করেছে সেই সময়ে শীতল পরামানিক একদিন গ্রামে এল। সঙ্গে ঐ চারুবালা। চারুবালার সঙ্গে

বড় বড় বাক্স-পেটরা। আর কোলে দুধের ফেনার মত তুলতুলে একটা সাদা বেড়াল। আর খাঁচায় দাঁড়ে বাঁধা ময়না। গ্রামের চারদিকে জল্পনা-কল্পনা, সঙ্গে উটি কে ? 'তুমি কার ঝিয়ারী কার বৌ, কার চাকের ভরা মৌ ?' উত্তরটাও খুঁজে নেয় মন থেকে মনের মত করে। চারুবালা তাহলে শীতল পরামানিকের দ্বিতীয় পক্ষের বৌ।

শীতল পরামানিকের বুড়ো হাড়ে এখনও এত রস লুকিয়ে ছিল!

যাদের বয়স কম কিন্তু মনের জলুনি-পুড়ুনি বেশি তাদের বুকের ভেতরের অনেকখানি জায়গা চারুর ঝাঁজাল যৌবনের স্পর্শহীন ছোঁয়ায় পুড়ে কালশিটে পড়ে গেল একমাস দু'মাসের মধ্যে।

দম্ভ-দেমাকে মাটিতে পা পড়ে না চারুর। গোবর-জলে উঠোন নিকোতে তার গা ঘিনঘিন করে। দেওয়ালে পচা পোকা-পড়া গোবরের নেদী দিতে দেখলে নাকে চেপে ধরে দামী রঙীন শাড়ির ঝলমলে পাড়। নিত্য-প্রয়োজনে বাঁশবনে আসতে-যেতে লোক দেখলে দশবার থুতু ছিটোয় মাটিতে। সন্ধ্যে হলে গুনগুন করে গান গায়। আলতা-পরা পায়ের চেটো থেকে খানিকটা কাপড় তুলে পা গুটিয়ে বসে থাকে জ্যোৎস্না রাতে খালের ধারে। কখনো আলগা থাকে না গা-বুক। সব সময় শাড়ি-ব্লাউজে সাঁটা।

চারুর যা কিছু দোষ বা গুণ—তার সবটাই বাখুরী গ্রামের চলতি জীবনের বিপরীত। দুর্ভিক্ষের কবলে জমি-জিরেৎ, সোনা-দানা খুইয়ে যারা অবস্থাপন্ন অবস্থা থেকে অনেক নীচে নেমে এসেছে, তাদের বাড়ির বৌ-ঝিদের চোখে চারুর চলন অতিরিক্ত বাঁকা। আর উঠতি বা বাড়তি অবস্থাপন্নদের বৌ-ঝিরা মনের জ্বলন্ত ঈর্ষায় চারুকে যত হীন করতে চায়, ততই যেন রূপ-রহস্যে-ভরা শহুরে চারুর সঙ্গ-লাভের জন্যে তাদের আগ্রহ বড় হয়। তাই কোন কোন দিন পয়সাওলা চাষীদের ঘরে তক্তপোশে পা ঝুলিয়ে উৎসুক আগ্রহশীলা মেয়েদের সামনে সত্যি-মিথ্যেয় মেশামেশি কলকাতা শহরের নানান কাহিনী শোনাতে বসে চারুবালা।

কানে সোনার দুল। সোনার হার গলায়। হাতে সোনার চুড়ি। কোমরে রূপোর গোট। বাঁ হাতের ছোট্ট রুমাল দিয়ে মাঝে মাঝে নাক-মুখ মোছে। একটু হাওয়াতেই বহুদিনের একটা ভারী সোঁদা সোঁদা গন্ধে-ভরা ঘরটা হিমানী-পাউডারের মিহি সুবাসে মাতোয়ারা হয়ে ওঠে। তক্তপোশের নীচে পায়ের রঙ-চটা স্যাণ্ডেলটাকে বুড়ো আঙুলে নাড়ে-চাড়ে।

যেন অবাক হবার মত কিছু নয়—এমনি অবিচলভাবে তাকিয়ে থাকে প্রতি-বেশীরা। অথচ তাদের সতর্ক দৃষ্টিতে চারুর শরীরের ক্ষুদ্রতম ভঙ্গিটিও এড়ায় না।

হাসলে অল্প টোল খায় একদিকের গাল। আতপ-চালের মত সাদা দাঁত। পাকা তেলাকুচো ফলের মত ছোট্ট ঠোঁট দুটি। কপালে সিঁথিতে সিঁদুর। আবার দু-হাতের দশটা আঙুলের নখগুলোতেও সিঁদুর মাখানো।

চারু নিজেই জুতো পায়ে আঁচল উড়িয়ে বাজার করতে হাটে বেরোয়।

শুনে পাড়ার বুড়ীরা কপালে সাতটা সরু রেখা ফুটিয়ে তোলে।

ঘোর কলি গ ঘোর কলি। নইলে মেয়েমানুষের এত দাপ-দাপট হয় গা! তুই ঘরের বৌ ঘরে থাকবি। তা নয়, মদ্দ-মানুষের গায়ে গা লাগিয়ে হাটে বেরোচ্ছু?

ঘাটে নাইতে কি গা-ধুতে নেমে এ-বাড়ির ও-বাড়ির বৌ-ননদেরা এ-ঘাট ও-ঘাট থেকে গলা হাঁকিয়ে আলোচনা করে চারুকে নিয়ে।

আ লো হাট করা যেমন তেমন—পুরুষমানুষের কাছে রূপ-যৌবনের গরব-গুমোর দেখানোটাই আসল। মাগীর চোখ দুটো দেখেছু? যেন কথা কয়। আর তা না হলে শেতলকাকার মত সদাশিব নিরীহ লোকটার মন বিগড়োতে পারে!

আরেকজন অন্য ঘাট থেকে সায় দেয়।

আগো দিদি, বলে নি যে বন-গেঁয়ে শিয়েল রাজা। উ চারুবালারও হয়েছে তাই। কোলকাতা শহরে উ রকম কত চারুবালা হাটে-মাঠে গড়াগড়ি যায়। ওর ঘাড়ে হাগবে এমন কত সুন্দরী আছে সিখেনে। তাদের কাছে উ চারুবালা খেঁদা-পেঁচা যদি না হবে ত ওর বরাতে আর মানুষ জুটল নি তোমার ঐ বুড়ো-মদ্দ কাকাটি ছাড়া?

কেবল যাদের বয়স কম কিন্তু মনের আশা-আকাঙ্ক্ষা-উদ্যম বেশি, চারুর হাটে বেরোনোয় খুশি হয় তারা। চারুর বিন্দুমাত্র উপকার করতে তারা সদা-সচেষ্ট। প্রকাশ্যে নিন্দে করে একজোটে। কিন্তু অন্তরের উপাসনার ক্ষেত্রে তারা স্বতন্ত্র। একে অন্যের ওপর ঈর্ষাতুর। মনের সংগোপন আশাকে রোদ জল আলো-বাতাস দিয়ে তারা আলাদা আলাদা ভাবে লালন-পালন করে।

চারু যেন কাকে একদিন বলে,—একটা হারমনিয়ম এনে দিতে পারেন কেউ?

শুনে গ্রাম-সুদ্ধ লোক অবাক।

চারু আরেকদিন বলে—আচ্ছা—কেউ খোল বাজাতে জানে না এখানে? কিংবা ডুগি-তবলা?

কেন জানবে না? খোলও আসে। খোলঞ্চিও আসে; বাঁয়া-তবলাও। পাড়ার একদল গাইয়ে-বাজিয়ে ছেলেকে নিয়ে চারুর বাড়িতে প্রায়ই আসর বসে গানের। শীতল পরামানিক বাড়ি আসে হপ্তায় হপ্তায়। যাতে চারুবালার কোনরকম আপদ-বিপদ, বা অসুবিধে না ঘটে তার তদারক করতে।

গানের আসরে কীর্তনই হয় বেশি। মাঝে মাঝে হিন্দী গান দুটো-একটা। কীর্তন শোনার দোহাই দিয়ে বয়স্করাও চারুর উঠোনে দাওয়ায় ভিড় করে। কেউ কেউ বাইরের বেঞ্চে বসে শোনে—

তোরা দে দে আমায় সাজায়ে দে গো
সাজায়ে দে গো
আমি যোগিনীর বেশে যাব সেই দেশে
যেথায় নিঠুর হরি
সা···জায়ে দে গো।

গানে যেন মধু ঝরে। অবিচল স্থির মূর্তিতে বসে গাইতে গাইতে বন্ধ-করা চোখটা খুলে চারু যার দিকে তাকায়, তার বুকের ভেতরে এক হল্‌কা আগুন জ্বলে ওঠে দপ্‌ করে।

রজনীর তাসের আড্ডা ছিল চারুবালার পাড়ায়। অর্থাৎ দখিণ পাড়ার মাঝখানে। সে আড্ডা এখন কবে বসে কবে না-বসে তার স্থিরতা নেই। রজনীও তাই সন্ধ্যের মুখে হাজিরা দেয় গানের আসরে। দোতলায় ওঠার সিঁড়ির তলায় এককোণে চুপ করে বসে থাকে। চারু গায়—

যদি মিলায়েন বিধি মন গুণনিধি
আমি বাঁধিব অঞ্চলে করি।
তারে অঞ্চলে করে বেঁধে আনিব।

তাড়ির নেশায় চুর-হওয়া রজনীর ভারী মাথাটা ঘাড়ের ওপরে এখুনি ভেঙে পড়বে এমনি টলমল করে। থেকে থেকে নিজের মাতাল মনের ভেতরে গানের অসম্ভব প্রতিক্রিয়া সামলাতে না পেরে বুড়ো লোকদের মত 'বাহবা' দিয়ে ওঠে। চারু কটাক্ষ হেনে তাকায়। চারুর মুখের মৃদু বিরক্তি চারুর উপাসকদের মুখে আরও বিস্তৃত হয়।

একদিন গান শেষ হবার পর সবাই উঠে গেলা ঐ রকম। ওর না আসাটাই
সিঁড়ির কোণে সেই ভেড়েল-মাতাল লোকটা শু৹
বিরক্ত করে যে। 'আসেন নি, কোনদিন
তাড়ির গন্ধে গা বমি বমি করে চারুর। মদে তাড়িতে অং৹
আর রজনীতে তফাতটা তাই।
রজনী মাটিতে মুখ গুঁজে অঘোরে নাক ডাকাচ্ছে। নাম জানে না। আবেগহীন
কেবল—এই যে শুনছেন, আপনি উঠুন। সবাই উঠে গেছে। খাল
এত কথা যাকে বলা তার প্রাণ অসাড়।
চারুকে বাধ্য হয়েই কানের কাছে মুখ নামিয়ে আবার ডাকতে হয়। রজনীর গাঢ় তন্দ্রা অসংখ্যবারের ডাকাডাকিতে হয়ত একটু পাতলা হয়ে আসে। বলে—বেশ ত গান হচ্ছিল—হোক হোক। বন্ধ হল কেন?
শুনুন, গান বন্ধ হয়ে গেছে। আপনি উঠে যান।
যার গালে ঠাস করে একটা চড় বসাতে পারলে চারুর জ্বালা জুড়োত, তাকে ভদ্রভাষায় অনুরোধ করতে হচ্ছে ভেবে চারুর জ্বালা দ্বিগুণ বাড়ে।
শুনুন, আপনি উঠে যান। এভাবে নেশা করে আর এখানে আসবেন না। শুনছেন, উঠে পড়ুন।
কেন ছলনা করতেছ বিবি-বৌ? তুমি গান গাইতেছ। আমি বেশ সুন্দর শুনতে পাচ্ছি। মাতাল হয়েছি বলে কি এত মাতাল যে তোমার গলার গানটাও বুঝতে পারি নি!
বিবি-বৌ!
গায়ে পর-পুরুষের হাত লাগলে যেমন বিরক্ত হবার মধ্যেও ভাল লাগে, নামটা শুনে তেমনি অনুভূতি ঘটল চারুর মনে। বুঝল নামটা পাড়ার ছোঁড়াগুলো বানিয়েছে তাকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করার জন্যে।
চারু আগের চেয়ে আরও ঝাঁজাল বিরক্তিতে বলে—আমাকে বিরক্ত করবেন না। আপনি উঠুন।
রজনী জড়ানো গলায় বলে—কেন, তুমি একেবারে কি এত লাটসাহেব যে একটু টেনে তুলে ধরতে পারতেছ নি আমাকে।
আপদ গেলেই চারু বাঁচে। আর সে নিজে ছাড়া এ-বাড়িতে দ্বিতীয় প্রাণী কেউ নেই যাকে বলবে, মানুষটাকে বার করে দিয়ে দরজার কপাটটা ভেজিয়ে দাও ত। তা যখন হবার নয়—তখন যাকে পায়ে

ঠেলার কথা তাকে হাতে ধরে টেনে তুলল চারু। টলতে টলতে চলে গেল রজনী।

পরদিন সকালে কাজে যাবার পথে রজনী চারুর দরজায় মুখ গলিয়ে ডাকে—চারুদি।

চারু দরজার দিকে একটু এগিয়ে এসে নতুন বিরক্তি নিয়ে তাকায় রজনীর পেটা পেটা শক্ত মজবুত আদুল শরীরটার দিকে।

কি বলছেন?

কাল রাত্রে আমি কি অন্যায় করেছি কিছু? নেশার ঘোরে জ্ঞান ছিল নি। ভোরের বেলা ঘুম থেকে উঠে ভাবনু, কি জানি মাতালের মন, যদি কোন অপরাধ করে থাকি ত ক্ষমা চেয়ে নিয়ে আসি।

না, না, কিছুই ত করেন নি আপনি।

সেইটে হলেই হল।

রজনী চলে যায় তার নিজের কাজে। দখিণ পাড়ার ভেতর দিয়ে নদীর ধারের দিকে। দখিণ পাড়ার পান বরজেই বছরে বেশি সময় খাটে সে। পানের কাজে ভারী পারদর্শী।

চারু যে গ্রামকে 'জংলী গাঁ' বলে মনে-প্রাণে ঘেন্না করে এসেছে এতদিন, সেই গ্রামের একজন গেঁইয়া মানুষের সরলতায় সারা সকালটা অভিভূত হয়ে রইল সে। আর সারাদিনের কাজের ফাঁকে ফাঁকে বার কয়েক নিজের মনে মনে আওড়াল—বিবি-বৌ, বিবি-বৌ।

শীতলকে চারু ডাকে—বুড়ো। শীতল তাতেই খুশি। চারুকে শীতল ডাকে—বৌ। চারু তাতে কোনদিন সাড়া দিতে ভুল করে নি। তবু চারুর মনে হচ্ছে—শুধু 'বৌ' বলে সম্বোধন করার মধ্যে তার সব পরিচয় নেই। তার সারা দেহে পরিপুষ্ট যৌবন। সেই যৌবনের একটু ছোঁয়া পাবার জন্যে কত মানুষের মন কেঁচোর মত কিলবিল করে, তা চারুর অজানা নয়। রাত্রে তার দরজায় প্রায়ই মৃদু টোকা পড়ে। গলা খাঁকারির শব্দ পাওয়া যায় উত্তরের জানালার দিকে। কলকাতার বিশেষ পরিবেশের জল-হাওয়ায় মানুষ-হওয়া চারু এসবের অর্থ খুব সহজেই বুঝে নিতে পারে। চারুর মনে হল রজনীর ডাকটাই ঠিক। সে বিবি-বৌ।

পর পর কদিন আসে না রজনী। কাকে ডেকে চারু বলে—আপনাদের দলের একটিকে যে কদিন দেখি নি। কি হল তার?

অ, রজনীর কথা বলতেছ চারুদি ? হ্যাঁ, সে শালা ঐ রকম। ওর না আসাটাই ভাল। ভারী বিরক্ত করে গানের সময়।

না, না,, তা হোক—হয়ত আমার উপর রাগ করেই বা আসেন নি, কোনদিন হয়ত কড়া কথা বলেছি কিছু। ডাকবেন ত।

চারুবালার আহ্বান যথাসময়ে পৌঁছয় রজনীর কাছে।

কিন্তু রজনী নির্বোধ। তার জীবন বুঝি কয়েকটা ফাঁপা, ভোঁতা, আবেগহীন অনুভূতির জোড়াতালি। তাই এই আহ্বানে অন্যের মত তার রক্তে খোল খঞ্জনি বেজে উঠল না। সে অনায়াসে জবাব দিলে—আচ্ছা, যাওয়া যাবে।

তিন

প্রথম কয়েকদিন আলাপের পর চারুকে রজনীর ভাল লেগেছিল। কিন্তু তাকে ভালবাসার জন্যে কখনো লালায়িত হয় নি। চারুকে নিয়ে অন্যদের কুৎসা রটনার পক্ষেও উৎসাহ ছিল না তার। কিন্তু ক্রমে ক্রমে ঘনিষ্ঠ বন্ধুমহল থেকে চারুর নামের সঙ্গে জড়িয়ে রজনীর নামেও কুৎসা ছড়াতে শুরু হল। এবং সে কুৎসা লোকের কাছে বিশ্বাসযোগ্য হল নানা কারণে।

চারুর কোন একটা তুচ্ছ দরকারে রজনীর খোঁজ করা চাই। ঘর ছাইবে কে ? রজনী। পুকুর পাড়ের ভাঙা বেড়াটাকে কাঁটা-বাবলা দিয়ে মেরামত করবে কে ? রজনী। রান্নাশালের পশ্চিমদিকের দেওয়াল উপর্যুপরি বর্ষার ঝাপটায় ক্ষয়ে গেছে। তাতে মাটি লাগাবার দায়িত্ব কার ? রজনীর।

শীতল পরামানিকের বুঝি কিছু হয়েছে কলকাতায়। নিজেও আসে না। টাকাও পাঠায় না। কোনরকম খোঁজ-পাত্তা নেই।

বুড়ো হলেও শীতলের ওপর চারুর মায়া-মমতা ছিল। রজনীর সামনে টসটস করে মাটিতে জল গড়িয়ে পড়ে চারুর চোখ থেকে।

রজনী বলে—কাঁদ কেন বিবি-বৌ। আমাকে রাহা-খরচটা দাও না। আমি গিয়ে পারি ত সঙ্গে করে আনব শেতলদাকে।

চারু রজনীর চিবুক নাড়িয়ে আদর জানায়।

রজনী শহর থেকে দুদিন পরে ফেরে। ব্যস্ত-সমস্ত চারু পিঠের ওপর ভাঙা খোঁপা নিয়ে ছুটে আসে। জড়িয়ে ধরে রজনীকে নানা প্রশ্নে।

শীতল অসুস্থ। পড়ে গিয়ে পায়ে চোট লেগেছে। এখন ভাল। টাকা পাঠিয়েছে পনেরটা। একটু চলাফেরার ক্ষমতা পেলেই আসবে।

চারু বলে—তুমি আজ রাত্রে এইখানে খাবে। এসো কিন্তু।

রাত্রে রজনী যখন খেতে বসেছে, চারু তার ডানদিকে সাদা বেড়ালটাকে আদর করতে করতে বলে—যাই হোক ঠাকুরপো, তুমি ছিলে বলে মনে শান্তি পেলুম। নইলে কি ভাবনাই যে দিনরাত ঘাড়ে চেপে ছিল।

রজনী বলে—শেতলদা তোমাকে খুব ভালবাসে বটে দেখনু। তন্ন তন্ন করে সব জিজ্ঞেস করল কিনা।

তুমি কি জবাব দিলে ?

আমি বললাম-তোমার কিচ্ছুটি ভাবনা-চিন্তের নেই শেতলদা। আমি ত রোজই প্রায় যাই, ভালই আছে। অসুবিধের কিছু নেই। রান্নাশালের চালটা সেরে দিয়েছি। তার পর একদিন একবেলা জন দিয়ে দলিজের সামনে যে বাবলার গোড়াগুলো পড়েছিল, চিরে দিলুম। বলতেছিল জ্বালন নেই। এইসব যা ঘটেছে সব বললুম।

তুমি গণৎকার কিনা। তাই মনের খবর টেনে বল। বল নি যে আমি দিন-রাত সুখের বিছানায় গড়াগড়ি খাচ্ছি ?

কেন বিবি-বৌ, তোমার ত অসুখ-বেসুখ করে নি।

সেই জন্যেই ত বলি গণৎকার।

আগে রজনী কোনদিন চারুর ঘরে ঢোকে নি। হ্যারিকেনের আলোয় সারা ঘরখানা আলো পায় না। তবু আলো-অন্ধকারের জড়ানো রহস্যের মধ্যে চারুর সাজানো-গুছনো ঘরখানা রজনীকে খুশি করে। রজনী নিজে যে ঘরে শোয়, সেখানে তক্তপোশ আছে বটে একটা কিন্তু তার তলায় কাঠ-কাঠরা নারকেল পাতা, নারকেল-ডেলো, কুঁচনো সাঁড়া স্তূপীকৃত করে জমানো। এদিকে ওদিকে গুড়ের কলসী। পুরনো তেঁতুলের হাঁড়ি। দেওয়ালের কোণে একটা বহু প্রাচীন নক্সা-কাটা পুরনো দরজা আর তারই গায়ে কোদাল কুড়ুল হেলিয়ে দাঁড় করানো। দেওয়ালে বড় বড় বাঁশের গোঁজ পোঁতা মশারী টাঙানোর জন্যে। মাথার ওপরে খড় বিনিয়ে বিনিয়ে বানানো গোটা দুই সিকে। তার একটায় কাসুন্দির হাঁড়ি। আর একটায় আমচুর। সমস্ত ঘরের ভ্যাপসা টক-মিষ্টি গন্ধটা রজনীর গা-সওয়া।

চারুর ঘরে পা দিয়েই রজনীর নিজেকে অনেক ছোট মনে হয়। যে চারুর

ঘর ছবির মত সাজানো, দেওয়ালে কাঁচ-বাঁধানো বড় ছবি, ঘরে ঢুকতেই মুখোমুখি কাঁচের প্রকাণ্ড আয়না, সাজবার-গুজবার জন্যে কত শিশি কৌটো সাবান, তেলের বোতল, বিছানার ওপরে নক্সা-কাটা পাতনী, কুলঙ্গীতে সাদা পাথরের মহাদেব, আরও কত কিছু সম্পত্তি যে চারুর আপন অধিকারে—সে যে তাকে আদর-যত্ন করে, চিবুক নাড়িয়ে আদর জানায়—এর জন্যে কৃতজ্ঞতায় মনটা আপ্লুত হয় রজনীর।

চারু বলে—বসো, দাঁড়িয়ে কেন?

রজনীর পাশে বসে চারু তাকে হাতের পানটা দিয়ে বলে—এবার দেখ দেখি, নিজের চোখে দেখ। তুমি যেদিন বুড়োর খবর আনতে গেলে—ঘাটে পড়ে গেলুম পা পিছলিয়ে। কি যে ঘাট বাবা, শুধু ঢকঢক করে নড়ে তাল-কাঠগুলো। তা সেই পড়ে যাবার পর থেকে যেন বিষ-ফোঁড়ার মত ব্যথায় টাটিয়ে আছে গোটা পা-টা। দেখছ ত কেমন শক্ত হয়ে গেছে জায়গাটা।

রজনী শক্ত কি নরম কিছুই বুঝতে পারে না। তবু চারু যে কষ্ট পাচ্ছে তারই একটা অনুভূতি সে জোর করে নিজের মনে উপলব্ধি করতে চেষ্টা করে। আর সে অকারণে চারুর পাশ থেকে সরে আসতে চায়।

দিনে দিনে রজনীর ওপর চারুর আকর্ষণ বেড়ে চলে। রজনী কিন্তু চারুকে ঠিকমত বুঝতে পারে না। চটুল হাস্য-পরিহাসে, গায়ে-পড়া আদরে-আবদারে রজনীর মুগ্ধ শান্ত অবিচলিত আত্মাকে যেন কোন মন্দ অভিপ্রায়ের তাড়নায় বিদ্রোহী করে তুলতে চায় সে।

রজনী তাই নিজের মনের সঙ্গে চারুকে কেন্দ্র করে অনেক কথোপকথন করে। চারুর চোখের চাউনি ও শরীরের অঙ্গভঙ্গীর মধ্যে যে স্বরূপটি ফুটে ওঠে রজনী তাকে গায়ে মাখার বদলে দূরে সরিয়ে দিয়ে ভাবে, এ অসম্ভব। আমার মধ্যে এমন কি গুণ আছে, এমন কি আকর্ষণ আছে যাতে চারু ভুলবে। আসলে ও-সব খেলা। পুরুষের মন ও হৃদয় নিয়ে মেয়েদের খেলা করার যে বারোয়ারী ধারণা ও অভিযোগ সব মানুষের মধ্যে অল্প-বিস্তর অল্প বয়স থেকেই বিনা অভিজ্ঞতায় গজিয়ে ওঠে, রজনী কথাটাকে সেদিক থেকে ভাবে না। পাঁচ-জনের শোনা-কথায় তার ধারণা হয়েছিল চারু পতিতা। পুরুষকে দেহ ও দেহদানের আনন্দ বিক্রি-করা জীবন যাপনের পথে চলতে চলতেই শীতল পরামানিকের সঙ্গে তার পরিচয়, প্রেম

ও পরে পালিয়ে এসে স্থায়ী সংসার গড়া। যে মেয়ে অসংখ্য পুরুষকে দেহ উন্মুক্ত করে দিয়েও কাউকে ভালবাসে নি,. আজ সে শুধু একটা বুড়ো শীতল পরামানিককে নিয়ে সুখী হয় কেমন করে? তাই চারুর চোখে ও শরীরে এত ছলা-কলা। তবুও যে চারুর সঙ্গে রজনীর দৈহিক সম্পর্কহীন একটা নিবিড় আত্মীয়তা গড়ে উঠতে লাগল তার কারণ চারুর ভদ্র ব্যবহার, মিষ্টি কথা, বেদনা-মাখানো একটি সুডৌল মুখশ্রীর আকর্ষণ ও অহংকারহীন মন। আর অন্য দিকে এতগুলি গুণ থাকা সত্ত্বেও রজনী যে চারুর সঙ্গে সবরকম দূরত্ব রেখে চলেছে তার কারণ রজনীর জীবনে গ্রাম-সমাজের চিরাচরিত সংস্কারের কিছুটা ছাপ, বংশ-মর্যাদা বোধ, পাপ-পুণ্যের পাটিগণিত-ঘেঁষা হিসেব। এই হিসেব বড় বিচিত্র।

রজনীর সঙ্গে তার বন্ধুদের একদিন তর্ক বাধল। রজনী তার মনের দ্বন্দ্বের একটা উত্তর পাবার জন্যেই আচমকা প্রশ্ন করে বসল—তাহলে গ্রামের লোক রাঙা-বুড়ীকে ঘেন্না করে না কেন? ছোট-কর্তাকেই বা দেবতুল্য মানুষ বলত কেন?

এ 'কেন'-র উত্তর নেই। উত্তর হতে পারে এই রকম যে ছোটবাবু বড় বংশের ছেলে, জাতে উচ্চ, মানে-সম্মানে জ্ঞানে-গুণেও উচ্চ, সুতরাং তাঁর কথার বিচার-বিবেচনা করা চাষী-ভুষীর ভোঁতা বুদ্ধিতে সম্ভব নয়, সমীচীনও নয়। ওঁরাই প্রতিপালক। ওঁদের দোষ-গুণের দায় ওঁদেরই।

ছোটকর্তা গ্রামের জমিদার বংশের ছোট ছেলে। 'রাঙা-বুড়ী' তাঁর বিয়ে না করা স্ত্রী। বহু বছর আগে, তখন ছোটবাবুর যৌবনকাল, জমিদার বংশেরও আজকের মত ধূলিস্মাৎ ভগ্নদশা হয়নি, মেজবাবুর বড়ছেলের বিয়েতে বেনারস থেকে বাঈজী হিসেবে এসেছিল কুসুমকুমারী। গ্রামের অতি-বৃদ্ধরা এখনও সে প্রসঙ্গ উঠলে বলে—স্বর্গের কিন্নরী-অপ্সরীর মত রূপ। কে বলবে যে বাঈজী। আর তেমনি হল গে ছোটবাবু! কী মন! কী মানুষ! যেন স্বর্গের দেবতা অভিশাপে মর্তে এসে পড়েছে।

ছোটবাবু মারা গেছেন। রাঙাবুড়ী শনের নুড়ির মত সাদা চুলে মাথা ভরিয়ে আজও বেঁচে আছেন, পদ্মপুকুরের পাড়ে ছোটবাবুর নিজের তদারকে গড়া তিনকুঠরি মহলে। এখনও তাঁর বিগত-যৌবন শরীরটার দিকে তাকালে চোখ ফেরাতে দুদণ্ড সময় লাগে। অহল্যা-দ্রৌপদী-কুন্তি ইত্যাদি প্রাতঃস্মরণীয়া পঞ্চকন্যাদের সতীত্ব ও মহত্ত্ব সম্পর্কে বহুকাল ধরে অগণিত অশিক্ষিত মনে যে

শুদ্ধ-পবিত্র একটা মূর্তিরূপ গড়ে উঠেছে, অনেকে রাঙাবুড়ীর মধ্যে সেই রূপটিকে প্রত্যক্ষ করে থাকে। রজনীর এই জন্যই হেঁয়ালি লাগে। রাঙাবুড়ীর কি জাত•তা কি কেউ জানে? কই তবু ত জাত খোয়ানোর অপরাধে তাঁর বিচার হয় নি কোনদিন। রাঙাবুড়ীকে জমিদার বংশের অন্দরমহলে অচ্ছুত করে রাখা হয় নি। রাঙাবুড়ীর শিবপুজোর জন্যে নতুন পুরোহিত ডাকা হয় নি। অথচ শশীর মা'কে স্বামী-শ্বশুরের বাস্তভিটেয় চোখের জল ফেলে উঠে যেতে হল চিরকালের জন্যে। মোড়ল-মাতব্বরদের ডাকা সভায় সমস্ত গ্রামের লোকের সামনে বিচার হল শশীর মা'র। জীবিকার্জনের অন্য রাস্তা না পেয়ে মেয়েরা অতি-সহজে যে শরীর-মূলধন-করা ব্যবসায় নামে সেই অপরাধের বিচার। চাষী-ভূষীদের চেয়ে ব্রাহ্মণদেরই রাগ বেশি। কারণ শশীর মা ব্রাহ্মণ বংশেরই বিধবা বৌ। তার সহায়-সম্বল কিছু নেই। জমির ফসল ঠকিয়ে খাচ্ছে ভাগারীরা। তার কিন্তু বিচার হয় নি। শাস্তির টাকা সাতদিনের মধ্যে শোধ দিতে না পেরে শশীর মা ভিন্ন গাঁয়ে বসবাস উঠিয়ে নিয়ে গেল।

রজনীর মন সময়ে সময়ে এ-সব প্রশ্নের মীমাংসা খোঁজে। কিন্তু ঠিকমত উত্তর না পেয়ে তার চিন্তা-ভাবনায় জটিলতা জট্ পাকায়।

ক্রমে চারুর বাড়িতে গানের আসর বসার প্রথাটা রইল। কিন্তু নিয়মানুবর্তিতা গেল। এখন আসরে ছোকরাদের জটলা কম। বুড়োদের জমায়েতই বেশি। চারু কীর্তন গায়। বহুদূরের বৃন্দাবন থেকে বিরহী রাধিকার অশ্রুভারাক্রান্ত হৃদয়ের আকুলতা চারুর গলা থেকে কান্নার মত গলে গলে পড়ে। কৃষ্ণহীন কুঞ্জবনের শূন্যতা শ্রোতাদের অন্তরে মোচড় খেয়ে ওঠে। খোল বাজে তালে তালে। যেন চিত্তভারাতুর রাধিকার চঞ্চল গতিছন্দের তালে তালে নূপুরের বিষণ্ণ নিক্কণ। শ্রীরাধিকার বিরহ-মিলনের জীবন কেউ কোনদিন চোখে দেখে নি। বৃদ্ধ শ্রোতাদের মধ্যে কারো কারো মনে হয় চারুর চেয়ে আরও সুন্দর হলেও মুখখানা নিশ্চয় ঐ রকমই ছিল রাধিকার। নইলে তার বুকের ব্যথা এর গলায় এমন রোদন করে কি করে?

যাদের বয়স কম আর আকাঙ্ক্ষা একটু উত্তাপে টগবগ করে, তাদের কাছে চারুর গানের অর্থ আজকাল পালটে গেছে। শ্রীরাধিকাকে বিরহানলে জ্বালিয়ে যে কৃষ্ণ মথুরায় গিয়ে গ্যাঁট হয়ে বসেছিল, তার চেহারা-চরিত্র যত অজানাই হোক, চারুর প্রাণ যে-কৃষ্ণের জন্যে হারমনিয়মের সুর ছাপিয়ে, খোলের লহরা ছাপিয়ে, দমকা বাতাস ছাপিয়ে হাহাকারের মত কেঁদে বেড়াচ্ছে, সে শীতল

পরামানিক নয়। শীতল পরামানিক এখন আয়ান ঘোষ। চারুবালার কৃষ্ণ হল রজনী।

যারা একদিন চারুর কাজল আঁখির ক্ষণিক পলকপাতের ভিখারী ছিল, তারা চোখের সামনে রজনীর ওপর তার একচোখো পক্ষপাতিত্বের দৃষ্টান্ত দেখে দেখে আশাহীন নৈরাশ্যে ভেঙে ভেঙে শেষে রজনীর বিরুদ্ধে ঘোঁট পাকাতে শুরু করলে। তাদেরই দলের দু-একজন মাঝে-সাঝে সহৃদয় ভঙ্গীতে রজনীকে সাবধান-সতর্ক হতে অনুরোধ জানাল।

রজনী বেশি বাড়াবাড়ি ভাল নয়। তুই সাদাসিধে গাঁয়ের ছেলে, যেমন আছু তেমন থাক। উ মাগীর জন্যে তোর এত মাথা ঘামানোর কি দরকার? এ-পাড়ার ভাবগতিক ভাল নয়।

বাথুরী গ্রামের মধ্যিখানে খাল। দু-পারে দুই পাড়া। বাঁকা দুমড়নো তেরচা বাঁশের সাঁকোটা পেরুলেই সরু রাস্তা। দু'পাশে ঝোপ-ঝাড় আর খড়িবন। খড়িবন পেরিয়ে একটু পরেই নাপিতদের খামারের গা ছুঁয়ে যে পেট মোটা বাঁক, তার থেকে আর একটু এগোলেই গঙ্গা আদকের মুদীখানা দোকান। গঙ্গা আদক দু-পাড়ার মধ্যে প্রসিদ্ধ মাতাল। মাতলামির মুখে সে যা বলে সবই তত্ত্বকথার মত শোনায়। গঙ্গার চরিত্র দোষটাও শৈশবাবধি এত প্রসিদ্ধ যে সেটাও তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হিসেবে সমাজে সমাদর পেয়ে আসছে।

দোকান মুদীখানার। ঘর একটাই। কিন্তু দু-ভাগে বিভক্ত। উত্তর দিকে বাঁশের উঁচু পাটাতনের ওপর দোকান। কাঠের র‍্যাকে নানান সাইজের ডিবে-ডাবরা। কৌটোর গায়ে সাদা কাগজে কালো কালির আঁকাবাঁকা হরফে জিরে, মরিচ, মিছরী, ফটকিরি, বিট-লবণ, ধনে, রাই-সরিষা, হরিতকী ইত্যাদি নামগুলো লেখা। কাঁচের জারে লজেন্স, বিস্কুট, কিসমিস। মুখ-আলগা বস্তার ভেতরে ডাল, নুন, হলুদ, লঙ্কা, খোল। গঙ্গার বসবার আসনের সামনেই ওজন করার দাঁড়িপাল্লাটা ঝুলছে ঘরের আড়কাঠা থেকে টাঙানো দড়িতে। তার দু-পাশে বড় বড় টিনে নারকেল, সরষে, কেরোসিন ইত্যাদি তেল ও চিটেগুড়। তাল গুড় থাকে পাটাতনের নীচে কলসীতে।

দক্ষিণ দিকে পাতা তক্তপোশ। এইখানে নিয়মিত আড্ডা বসে। প্রয়োজনে যাত্রা পার্টির রিহার্সাল চলে গভীর রাত পর্যন্ত। আমোদ-ফুর্তির সময়ে গঙ্গার এক গেলাসের ইয়ার যারা তারা যে যার ঘর থেকে ঐ নিষিদ্ধ পদার্থ ভাঁড়

বোঝাই করে এনে দোকানে জমা করে। তার পরে পাঁচজনের জমানো জিনিস পাঁচজনে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে খায়। •

যাওয়া-আসার পথে রজনীকে দেখলেই গঙ্গা দোকান থেকে মুখ বাড়ায়।

ও রজনী, ও বাবা, শুনে যা, শুনে যা না একবার।

রজনী এলেই ট্যাঁকের গোল টিনের কৌটো থেকে একটা বিড়ি বার করে বলে—এই নাও বাবাজী, এট্টা দিশী সিগরেট টেনে নাও।

রজনী বিড়ি খাওয়ার জন্যে একটু বসে। গঙ্গা আদক কথা বলে না-থেমে অনর্গলভাবে।

জান বাবাজী, পাড়ার লোকে তোমার নামে দু-পাঁচ কথা বলা-কবা করে। আমি বাবু শুনি, ভগবান কান দিয়েছে তাই। কিন্তু উচ্চবাচ্য করি নি। মুখ্যু হতে পারি, হ্যাঁ, তুমি সাতবার বল না যে গঙ্গা আদক গোমুখ্যু, আমি 'প্রতিবাদ' করবে কি ? করবো নি। কিন্তু তা বলে জ্ঞানগোম্যি আছে বাবা। দুনিয়ার অনেক খপোরাখবোর রাখি। ঘরে বসেই খপোর পাই। জান বাবাজী, সব শালাই দিনের সাধু আর রাতের চোর। বলে মানুষ ত কুন ছার, অমন ভগবান বলে যে 'শ্রেঃকষ্টো', তিনি বলে কিনা শতেক গোপিনী নিয়ে লীলা-খেলা খেলতেন। আর তুমি আমি ত ভগমানের নখের যুগ্যি নয়, নাকি বল ? আচ্ছা একটু বসো দেখি একটা জ্ঞানের বই দেখাই তোমাকে। এইটি কি ?—না বন্ন পরিচয় দ্বিতুয় ভাগ। মূল্য এক আনা দাম। এমন কিছু নয়। কিন্তু বাবাজী, এর অক্ষরে অক্ষরে জ্ঞান। রোজ ইটি পড়তে হয়। এই যে ওক্ষরগুলি দেখতেছ নি, এই যে অ, ইটি কি ? না অজোগার। ভক্ত প্রেহ্লাদ 'ক' ওক্ষরের দিকে তাকিয়ে কেঁদে উঠেছিল। কেন ? না 'ক' ওক্ষরে কিষ্টো। ইও তেমনি, অ-এ অজোগার। অজোগারকে বাবাজী কখনো বিশ্বাস করবে নি। উ শালা সাপের জাত। ভারী ভয়ঙ্কর। আগে পাকে পাকে জড়ায়। তার পর ছোবল মারে। তোমার চারুবালা হল শহুরে সাপ। সময় থাকতে পালিয়ে এস বাবাজী। নইলে ফাঁদে লটকাবে একদিন।

গ্রাম-দেশে মানুষও হাঁটে। মানুষের কথাও হাঁটে। হাঁটতে হাঁটতে এই সব ঘটনাবলী শাখা-প্রশাখায় পল্লবিত হয়ে রজনীর সংসারে এসে পৌঁছয়।

রজনীর মা বুড়ী। চোখে ছানি। সব শুনে বুড়ী এমন কান্না জুড়ে দেয়, শুনলে মনে হবে যেন এইমাত্র কেউ মরেছে বাড়িতে।

রজনীর চেহারা সুভদ্রা চোখে দেখতে পায় না। গায়ে হাত বুলিয়ে বলে—আরে

অ রজনী, ই তোর কি চেহারা হয়েছে বাবা চেলাকাঠের মত। কেন তুই নিজের এমনধারা সব্বোনাশ করুতেছু?

বড় ভাই সুরেন সব শুনেও নির্বিকার। চাষ-বাস গরু-বাছুরের কাজ নিয়েই তার কারবার। ধবল একটা হেলে গরুর পায়ের কেঁটি বাছতে বাছতে সে আপন মনে বলে—গরুটাকে খেলো বাবু কেঁটিতে। এত করে গইলটাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখি, রোজ সোন্‌ঝেয় পেঁজ খোসার ধুঁয়ো দি তবু ই শালা কেঁটির জাত মরার নয়।

বড়-বৌ বীণাপাণি এসে অভিযোগ জানায়।

পাড়ায় আর মুখ দেখাবার জো রইল নি। তোমরা ওর বে-থার বন্দোবস্ত করতেছ নি কেন? ধেড়ে বয়সের আইবুড়ো। কেচ্ছা-কেলেঙ্কারী আরও না গড়ালে বুঝি তোমাদের আক্কেল হবে নি।

সুরেন বলে—বড়-বৌ, কালো হেলেটার মুখে কোলো হয়েছে। আজকে এট্টু নুলে-নুনে মিশিয়ে খেতে দিতে হবে। তোমরা ডাবায় যে ফ্যান দাও তাতে নুন মিশিয়ে দাও ত? নাকি!

বড়-বৌ বীণাপাণি সুরেনের কাছ থেকে সরে এসে কাছে-পিঠে কোন মানুষ না পেয়ে অদৃশ্য বাতাসকে উদ্দেশ করে স্বামীর ওপর তার মনের বিরক্তিটা প্রকাশ করে—জানো, ইনি হলেন আরেক অবতার!

খেতে বসে রমণী দাদার ওপর হম্বি-তম্বি করে রজনীর সামনেই।

তোমার আদর-আশকারাতেই এত বাড়। নাহলে সাঁত বংশের মুখে কালি দিয়ে উ কিনা একটা বেশ্যা মাগীর সঙ্গে ঢলাঢলি করে?

সুরেন বলে—আমাকে আবার কবে আদর-আশকারা দিতে দেখলু তুই? তোদের কি বারণ করেছি শাসন করতে? আমাকে কারুর কুম্নু দরবারে তোমরা টেনো নি।

রমণী তবু লেজ-কাটা টিকটিকির মত ছটফটায়।

ডাক না। ঐতো ঘরে এসেছেন। ডেকে জিজ্ঞাসা কর না উ এ-সব অন্যায় কাণ্ড-কারখানা বন্ধ করবে কিনা? না করে, সংসার থেকে বেরিয়ে যাক। ভিনো হয়ে যাক।

ঘরের ভেতরে সুভদ্রার কানা চোখে জল ছপছপ করে। ভাবে—উ রজোর আর দোষ কি। রুলি ও নাড়ীতে ত ওর বাপের রক্তই বইতেছে। ঠিক যেমনটি ছিলেন তিনি, তেমনটি হয়েছে রজো।

মেজ-বৌ পদ্ম বাড়ির আর সকলের চেয়ে রজনীকে ভালবাসে বেশি। ভাসুর আছে বলে মাথায় ঘোমটা দিয়ে পরিবেশন করছিল সে। রমণীর হাতের উপরেই এক হাতা গরম ডাল ফেলে দিলে। রমণী চমকে কটমটিয়ে পদ্মর দিকে তাকাতেই পদ্ম চোখ উল্টে ইশারা করলে—আহা, কি হচ্ছে!

খেয়ে উঠে শোবার ঘরে গিয়ে পদ্ম পাকা গিন্নীর মত শাসন করে রমণীকে। ছিঃ ছিঃ, ঠাকুরপো ঘরের মধ্যে আছে। তার কানের কাছে অমন করে বললে মানুষটার 'পেরাণে' লাগবে নি! ছেলে-মানুষ!

মেয়েলী ন্যাকামো শুনলে রমণীর রাগ পা থেকে মাথায় চড়ে বসে।

তুই শালী ফ্যাচফ্যাচ করবি নি। অনেকদিন পিঠে লাথি-ঝাঁটা পড়ে নি বলে খুব বেড়ে উঠেছু। ঠাকুরপো কচি ছেলে, দুধের বালক, তাই তার হয়ে সাউকুড়ি ফলাতে এসেছু তুই!

রজনীর জন্যে তিল তিল করে যে রাগটা বুকে পুষেছিল রমণী, সেটা পদ্মর গালে সশব্দে ফেটে পড়ার পর পদ্মর ভিজে চোখের মত রমণীর রাগটাও ঠাণ্ডা হয়ে এল। কাজে বেরোবার আগে রমণী রজনীকে ডেকে শান্ত বিনীত গলায় আবদার জানালে।

আমার কথাটা তুই রাখবি নি রাজু। কেন একটা কেলেঙ্কারী বাধাতে যাচ্ছু। তুই চারুবালার বাড়ী যাওয়া ছাড়। উ পাড়ার লোকজন আনাড়ী। হুট করতে ঠেঙা-লাঠি করে।

রমণীর মুঠো থেকে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে রজনী বলে—তোমরা উড়ো কথায় কান দাও কেন? যাদের নিজেদের মনের মধ্যে পাপ তারাই ওসব রটায়।

এরই কিছুদিন পরে এক অন্ধকার ঘুরঘুট্টি রাতে দু-তিনটি ছায়ামূর্তি রজনীকে জড়িয়ে ধরল আষ্টেপৃষ্ঠে। রজনীর শরীর তখন নেশার ঘোরে অবশ। গলার স্বর শুনেও বুঝতে পারল না কারা তাকে ধুলোয় ফেলে পিটছে।

সকালে ঘুম ভাঙার পর রজনী বুঝতে পারল পিঠের হাড়, বুকের পাঁজরা, পায়ের দাবনা যেন যন্ত্রণায় টুকরো টুকরো হয়ে শরীরের বাঁধন ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে। শরীরের চেরা লম্বা ক্ষতগুলোর মুখে রক্তের দানা।

ঘরের ভাই মার খেয়েছে। রমণীর বুকে এটা শেলের মত বেঁধে। সে আগুনের মত দবদবায়।

ঘরে-ঘরে মোদের যতই ভেদ-বিভেদ থাকুক না কেন, পরে মেরে ঠেঙিয়ে যাক আর মোরা তা গায়ে মেখে শুবো?

রমণী সুরেনকে তাতায়। দাদা, তুমি মোড়ল-মাতব্বরদের কাছে বিচার জানাও। এর একটা হিত-বিহিত চাই।'

সুরেন বালতি নিয়ে বসেছে দুধ দুইতে। সুরেনের ছোট ছেলে বাছুর ধরেছিল দুধের বাঁটের পানান তোলার জন্যে। তার কোন দুষ্টুমিতে গরুটা আচমকা নড়ে উঠতেই খানিকটা দুধ পড়ে গেল মাটিতে।

সুরেন বিরক্ত হয়। আঃ হাঃ। ইরে, ই ছাবালটা তো ভারী দুষ্টু হল দেখি। দেখলে কতখানি দুধ দিলে ভুঁয়ে ফেলে। একদম বট আঠার মত দুধ। হাই— ঠিক করে ধরতে পারু নি।

রমণী বলে—কি গ, তুমি মত দিবে না দিবে নি।

সুরেন আশ্চর্য হয়ে যায়। রমণীটা চিরকালের হজুগে। মেজাজ গরম করতে ওর ভারী সুখ। সুরেন বোঝায় কেন তুই মাথা গরম করতেছু রমো? দোষ করেছে, ঠেঙিছে। বিচারে মোদেরই দোষ ঠাউরোবে সকলে। রজনীকে বরং বকে-ঝকে দুবোখন। তুই চেপে যা।

রমণী গলা চড়িয়ে দেয় সপ্তমে।

এইটে তোমার বিবেচনা হল, হ্যাঁগা। দোষ যে করেছে, ধরেই নিলাম করেছে, ত সেইটা কার কাছে করেছে? তার বিচারক কে? গ্রামে ত মোড়ল-মাতব্বর ছিল। তাদের জানাতে পারলো নি? এবার যদি আমরা গিয়ে দল বেঁধে ওদের ঠেঙিয়ে আসি, কেমন হয়?

রমণীর কাছে এই ঘটনার তাৎপর্য আলাদা। দখিণ পাড়ার লোক উত্তর পাড়ার লোককে ঠেঙিয়েছে, বিচার হবে এইটারই।

রমণী তার দলবলকে প্রস্তুত হতে বলে বিচারের দিন আরেকটা বড় রকমের ঠেঙা-লাঠির জন্যে। বিচারের আটচালাটা উত্তর পাড়ার এলাকা-এক্তিয়ারের মধ্যে বলেই সে সুবিধেটা সহজ।

বিকেলের রোদ যখন ঢুলুঢুলু করছে তালগাছের চুড়োয়, রমণী জমিদারবাবুদের কাছারিতে প্রণাম ঠুকে দাঁড়ায়।

ন-বাবু, আপনার কাছে এনুম। একটা বিচার জানতে— আজ্ঞে।

ন-বাবু অর্থাৎ জমিদার বংশের ন-ছেলে সেরেস্তার দলিল-দাখিলের কাগজ-পত্রের হিসেব-নিকেশে ডুবিয়ে রাখা চোখটা সোনা-বাঁধানো সরু ফ্রেমের চশমার ঝকঝকে কাঁচের ভেতর থেকে একটু ওপরে তুলে তাকান।

কে? রমণী, বোস্।

একটা বিচার জানবার আছে—আজ্ঞে।

কিসের বিচার। রজনীকে ঠেঙিয়েছে, তার ত ?

আজ্ঞে বাবু।

সে সব শুনেছি আমি।

আজ্ঞে সব শুনেছেন। কে বললে ?

সুরেন এসেছিল দুপুরে।

দাদার ওপর শ্রদ্ধাবিগলিত হয়ে রমণী বাড়ি ফেরে।

রমণী ভাবে—দাদাও চটেছে। তার যুক্তিতে টলেছে। নিজের শক্তির ওপর রমণীর বিশ্বাস ও গর্ব বাড়ে।

কিন্তু বিচার-পর্বটা চুকে গেল গোপনে। আসামী আর ফরিয়াদী দু'পক্ষের কয়েকজন লোক আর কিছু মোড়ল-মাতব্বরের উপস্থিতিতে।

রমণী জানতে পারে সুরেনই আগে থেকে এই ব্যবস্থাটা করে এসেছে জমিদার-বাবুর সঙ্গে। সুরেনের ওপর রাগে রমণী দাঁতে দাঁত ঘষটায়।

শীতল পরামানিককে কলকাতা থেকে আনিয়েছিল দখিণ পাড়ার লোকেরা। সব বৃত্তান্ত শুনে শীতল জলে উঠল কাঠে-আগুনে। বলে—ভাল মানুষ ভেবে শালাকে ঘরে ঢুকতে দিতুম। টাকা পয়সা পর্যন্ত হাতে তুলে দিয়েছি কোনরকম সন্দেহ না করে। এখন দেখছি শালা বাইরে খুব মৌনে-মুষ্টো, ভিতরে ভিতরে ষোল আনা শয়তান। তোমরা ওর টুঁটিটা ছিঁড়ে ফেলতে পারলে নি ?

বাইরে শীতল পরামানিক একমুখে দশমুখ। চোখের কালো মণি দুটো রাগে ঠিকরে পড়ে বুঝি। কিন্তু ঘরের ভেতরে এলেই আলাদা মানুষ। চারুর রাগ অভিমান থামাতে হিমসিম খায়। বৃদ্ধ বয়সের ভালবাসা এমনিতেই কিছুটা করুণা প্রার্থীর মত। তার উপরে যেখানে চারুর মত বৌ।

রাগে চারুর পুরন্ত বুকের কাপড় ঘন ঘন ওঠা-নামা করে।

বুড়ো বয়সে তোমার ভীমরতি ধরেছে, নয় ? না হলে তুমি আমাকে কিছু জিজ্ঞেস-পত্র না করে গ্রামের কতকগুলো বদমাস লোকের কথায় নাচতে যাও। তুমি তাহলে আমাকেও অবিশ্বাসী মনে কর। তুমি জান, রজনী না থাকলে তোমার ঐসব সাধু-সন্নেসীর বাচ্চারা কি কাণ্ডটাই বাধাতো। ওদের উৎপাত কি কম নাকি ? সে-সব কতবার বলেছি, তখন ত কানে ওঠে নি। আমি শেষ কথা বলে দিলুম—রজনীর গায়ে হাত পড়লে আমি গলায় দড়ি দেবো। সে আমার ছোট ভায়ের মত।

বিচারের দিন শত্রুপক্ষকে বিস্মিত করে, মিত্রপক্ষের মুখ ম্লান করে দিয়ে জমিদারবাবুর কাছারিতে শীতল পরামানিক রজনী সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়—আজ্ঞে ওসব মিথ্যে রটনা। আমার স্ত্রী ভায়ের মতন ভালবাসে ওকে।
বিচারের রায় শুনে আত্মহারা রমণী সুরেনকে মনে মনে ক্ষমা করে।

চার

পুনরাবৃত্তির আবর্ত থেকে কাহিনীকে মুক্তি দিয়ে এবার আরও কিছু পরের ঘটনায় পৌঁছনো যাক।
ইতিমধ্যে কালস্রোত এগিয়ে গেছে তার অপরিহার্য নিয়মে। মানুষের ইচ্ছায় সে নিয়ন্ত্রিত হবার নয়।
জীবনও কি কালস্রোতের মতই মানুষের ইচ্ছাধীন নয়? জীবন যদি ইচ্ছাকৃত ঘটনাবলীর সমষ্টি হয় তাহলে, তাহলে এত অন্তর্দ্বন্দ্ব কেন জীবনে? মানুষের চলার পথের যে দিকে নিষেধের লাল সংকেত, দেখ সেই অপরিচয়ের দিকেই ধাবিত হচ্ছে মানুষের অপরিণামদর্শী জীবন। বলিষ্ঠ নীতির চেয়ে কখনো কত প্রতাপশালী হয়ে উঠছে এতটুকু ক্ষুদ্র একটু অকৃতার্থ প্রবৃত্তি অথবা পাপ অথবা একটু বাসনার বীজ, যা বীজাণুর মত সংক্রামক। নিয়মের জগতে অনিয়মের ভাঙন ডেকে আনাটা কি মানুষের জীবনের সহজাত প্রবণতা।
রজনীর জীবনের পরবর্তী অধ্যায়ের গতিপথ বেঁকে গেছে এই অনিয়মের দিকেই। সচেতন ইচ্ছার প্রবল বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও তার আত্মার অন্তর্গত এক অভিলাষ তাকে উদ্দীপ্ত করেছে চারুর সঙ্গে দৈহিক মিলনে। এই মিলনের মধ্যে শুধু দেহের নয়, আত্মার কিংবা অন্তরেরও পরিপূর্ণতা উপলব্ধি করেছিল সে। যে পূর্ণতার আকৃতিকে পৃথিবীর যুগ-যুগান্তের শিল্প-সাহিত্য সম্মানিত করেছে কত মহৎ বিশেষণে। রজনীকে কিন্তু সম্মানের বদলে প্রায় সম্মার্জনীর তাড়নাই খেতে হয়েছে লোক-সমাজের কাছ থেকে। ক্রমে লোক-সমাজের প্রভাবেই তার মনে হল চারু বুঝি সত্যিই গ্রাস করে বসেছে সমস্ত জীবনের ভবিষ্যৎ। তাই আবার নিয়মের জগতে ফিরে আসার বাসনা বাসা বেঁধেছিল তার মনে।
পাশের গ্রাম শালতিয়ার নন্দ সাঁতের মেয়ের সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধ এসেছিল রজনীর। নন্দর মেয়ে কুন্তিবালা বেশ মেয়ে। চাষী-ভূষীর ঘরে অমন উজ্জ্বল গৌর বর্ণ কটা মেয়ে পায়। বিয়েতে সকলেই রাজী। রাজী হয়েছিল রজনীও। বিয়ের

দিন তারিখ ঠিক হবো-হবো। সেই রকম একটা সময়ে দেশসুদ্ধ লোককে অবাক করে রজনী একদিন জানালে, সে বিয়ে করবে না। কেন? কারণ-যুক্তি কি? রজনী সে কথার জবাব কাউকেই দিল না।

নন্দ সাঁতের লোক আসে রজনীর বাড়িতে। বলে—মেয়েকে আমরা আরও একখান গয়না বেশি দুবো।

রজনী বলে—না গ না। এখন বে' করবো নি। কানের কাছে দিন-রাত্তির ঘ্যানর-ঘ্যানর কোরো নি। তাহলে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যাব।

নন্দ সাঁতের লোক ফিরে গিয়ে আবার আসে।

রজনীর মাকে জিজ্ঞেস করে—পাত্রের কি দাবি-দাওয়া আছে আরও? জিজ্ঞাসা করুন না একবার। আমাদের বাবু জামাই বাবাজীর মনে কুনু রকম খুঁত রাখবেন নি।

রজনীর 'না' ছাড়া 'হ্যাঁ' নেই।

বিয়ে বন্ধ হয়ে গেল।

যারা আকাশে চোখ তুলে বেলা বলে দেয়, মেঘ দেখে বৃষ্টির লগন চিনে ফেলে, মাটি চেখে ফসলের বাড়-বাড়ন্ত বোঝে, তারাও রজনীর চাল-চলন ঠিকমত বুঝে উঠতে পারে না।

কিন্তু মনের যদি কোন দেবতা থাকে, একমাত্র তিনিই জানেন দেড়-বছর আগেকার রজনীর অন্তর্জগতের সত্যিকারের ইতিহাসটা কি।

চারুকে গিয়ে রজনী একদিন বলে—বিবি-বৌ, আমার একটা বিয়ের সম্বন্ধ এসেছে গ।

খুশিতে উছলে পড়ে চারু। টোল খায় একদিকের গাল।

বেশ ত, টুকেটুকে একটা বৌ ঘরে নিয়ে এসো না। রাঁধবে, বাড়বে, যত্ন-আত্তি করবে।

রজনীর ইচ্ছে করে কৃতজ্ঞতায় চারুকে জড়িয়ে ধরে দু-হাতে।

আরেকদিন গিয়ে রজনী বলে—আমার শ্বশুর কি কি দিবে-থুবে শুনেছ?

তোমার বিয়ে। তুমি না বললে কে বলবে আর।

তুমি ত কই জিজ্ঞেস করতেছ নি কিছু?

জানি, তুমি নিজেই বলবে। না বললে প্রাণ আঁকুপাঁকু করবে তোমার।

রজনী আরও কিছু শুনতে লালায়িত হয় চারুর মুখ থেকে। চারু এসে আদর করে তার চিবুকটা নেড়ে দিয়ে যাক। হাসিতে-খুশিতে ঢলে পড়ুক গায়ে।

কথার পর কথা দিয়ে একটা সুখী আনন্দোচ্ছল জীবনের স্বপ্ন এঁকে দিক তার বাস্তবমুখী কল্পনার জীবনে।

বিবি-বৌ, আমার গা ছুঁয়ে বলত, তুমি আমার বে'র কথা শুনে খুশি হয়েছ কিনা। রজনী চারুর দিকে হাত বাড়ায়।

চারুর চোখের দৃষ্টিতে হৃদ্যতাহীন একরকম জোলো চাউনি দেখে রজনী বাড়ানো হাত বেশী বাড়ায় না।

চারু বলে—কেন আমি তোমার কে যে আমার খুশি-অখুশিতে তোমার যাবে-আসবে।

চারুবালা কথাটা বলেছিল সোহাগের সুরে। কিন্তু রজনীর কানে কেমন যেন বেসুরো ঠেকল। রজনী এমন বেখাপ্পা প্রশ্ন কখনো শোনে নি চারুর মুখ থেকে। রজনী চারুর কে? সত্যি সত্যি কেউ কি?

শীতল পরামানিক আসে যায়। রজনী চারুর বিপদ-আপদের নিত্য সঙ্গী। চারুর কষ্টে আগে বুক বাড়ায় সে। চারুর ঝঞ্ঝাট স্বেচ্ছায় সে কাঁধে তুলে নেয়। আর কি? আর কিছু কি আছে?

চারুর একটা বেড়াল ছিল। সেই-ই চারুর সন্তান। তাকেই সবসময় বুকের কাছে টেনে জড়িয়ে শুতো। সেটা মরে যাবার পর থেকে নিঃসঙ্গ চারুর চলায়-বলায় কিসের যেন ভাবান্তর ঘটল। রজনী খানিক বুঝতো। খানিক বুঝতো না। সাতাশ বছরের ভরা-যুবতী চারুর বুকে হয়ত জেগেছিল মাতৃত্বের বাসনা। হয়ত চারুর দুরন্ত যৌবন-তৃষ্ণাকে সম্পূর্ণ চরিতার্থ করার সামর্থ্য ছিল না বৃদ্ধ শীতল পরামানিকের। হয়ত রজনীর সুগঠিত পেশীবহুল দীর্ঘকায় চেহারার আকর্ষণে চারু নিজেকে সংবরণ করতে না পারার যন্ত্রণায় ছটফট করতো। তার পর?

একটা লম্বা সরু সাদা পাকাটি আঙুলে মটমট করে ভাঙতে ভাঙতে রজনী বলে—বিবি-বৌ, তুমি ঠাট্টা করতেছ?

চারুর সে কথার উত্তর দেয় না। উঠে যায়। ঘরে ছেলেকে শুইয়ে দিয়ে এসে বলে—হায় গ, পোড়া গন্ধ উঠেছে। ডালটা বুঝি চুঁয়ে গেল।

রজনীও উঠে আসে। গঙ্গা আদকের দোকানে এসে বলে—কই গ খুড়ো, তোমার থাকে ত এক গেলাস দাও।

গঙ্গা আদকের দোকান তাড়ির দাতব্যখানা। রজনীর জন্যে একটা গেলাস সেখানে অভাব হবার কথা নয়।

কিন্তু চারুর ওপর মনে মনে আড়ি-করা দিনগুলোর বিরস শূন্যতা তাড়ির রসালো স্বাদে ভরাতে পারে না রজনী। •চারুর চোখ দুটো অদৃশ্য থেকে আহ্বান করে। বাতাসের শব্দকে মনে হয় চারুর কষ্টের নিশ্বাস।

দুদিন পরে রজনী সন্ধ্যের মুখে চারুর ঘরে ঢুকে দেখে রান্নাঘরে আলো নেই। ঘরের ভেতরে যেন একটা কাতরানির শব্দ।

জানলার ফাঁক দিয়ে দাওয়ার ওপরে আলোর সরু সরু ফালি একটা লম্বা ডোরা-কাটা ছবি এঁকেছে। দাওয়ায় চেটাই, বালিশ, আনাজ-খোসার জঞ্জাল এলো-মেলো ছড়ানো। অল্প ফাঁক-করা দরজাটা ঠেলে রজনী ঘরের ভেতরে ঢুকে যায়।

কি হল তোমার? বিবি-বৌ।

ব্যগ্রভাবে এগিয়ে চারুর বিছানায় বসতে গিয়ে অবাক হয়ে যায় রজনী।

পাশে খোকা ঘুমোচ্ছে অকাতরে। চারু ছটফট করছে যন্ত্রণায়। খোঁপা-ভাঙা চুল বালিশ ডিঙিয়ে তক্তপোশের নীচে ঝুলে পড়েছে। মুখে কষ্টের কাতরানি। গায়ে বুকে সারা শরীরে আবরণ শুধু আলগা হয়ে লেগে আছে।

চারু এক হাতে গায়ের কাপড়টাকে সামলে নেয়। তার পর কপাল থেকে হাতটা সরিয়ে দেয় রজনীর।

কি হল বলবে নি? জ্বর-টর ত নয়। থালে কি পেট কামড়াচ্ছে। তেলে জলে মালিশ দিলে নি কেন?

চারু পাশ ফিরে শোয়।

কিছু নয় গো কিছু নয়। আমার যখন আপন-স্বজন কেউ নেই, আমি মরি কি বাঁচি সে কাউকে দেখতে হবে নি।

রজনীর মন বলে—বিবি-বৌ, তোমার ছলনা রাখ। সোজা কথাটা বল কি চাও তুমি? তুমি আমাকে আজীবন মন্তোর পড়ে বশ করে রাখতে চাও। আমার বিয়ের খবরটা শুনেই তোমার মনের ভাব-গতিকটা বেখাপ্পা হয়ে উঠেছে।

কিন্তু রজনী কিছু বলবার আগেই চারু আচমকা রজনীর হাতটা ধরে ফেলে বলে—আমি এখন তোমার পথের কাঁটা হয়েছি, নয়? তুমি বে' করতে চলেছ। রোজ সে গল্প না শোনালে তোমার আত্মা বুঝি তৃপ্তি পায় না?

রজনী অবাক হয়ে যায়। এ যেন তারই মনের চোরা-সন্দেহের জবাব।

ইসব তুমি কি অলক্ষণে কথা বলতেছ বিবি-বৌ। আমি কক্ষনো এ কথা

বলেছি, না মনে এনেছি? তুমি ত জান মিছে কথা বলতে আমার জিভ আড়ষ্ট হয়ে যায়। একদিনের জন্তেও যদি তোমাকে ঘেন্না করি কি মনে মনে হেনস্থা করি, ত আমি এক বাপের বেটা নই। সেদিন আমার ওপর মিছেমিছি রাগ দেখালে। মেজাজ গেল বিগড়ে। রাগ করে এলুম নি দু-দিন। আমার কি কষ্ট হয় নি?

রজনীর মনে এক। মুখে আর-এক। কিন্তু এত বিচলিত হয়ে, এত ইনিয়ে বিনিয়ে, দিব্যি-দিলাসা খেয়ে সে নিজের দুর্বলতা প্রকাশ করছে কেন।

তবু রজনীকে ভয় হয় চারুর। রজনীর জিভে অরুচি লেগেছে। চারুর পুষ্ট যৌবনকে নিংড়ে রজনী তার জীবন-যৌবনের অনেক স্বাদই চরিতার্থ করে নিয়েছে। এখন যদি ছিবড়ের মত আঁস্তাকুড়ে ঝেঁটিয়ে দেয়!

রজনী ছাড়া কে আছে আমার? আমি ওর কাছেই উজাড় করে দিয়েছি নিজেকে। রজনী নতুন বৌ, নতুন সংসার, নতুন জীবনে নতুন সুখ ফিরে পাবে, আর আমি বুড়ো শীতল পরামানিকের হাড়ে বাতের তেল মালিশ করতে করতে মরবার শেষ দিনের দিকে এগোব।

চারু তার অন্তরের এই ভয়ঙ্কর শূন্যতার উপলব্ধিকে অন্তরেই সংগোপন করে রাখে। মুখে আস্ফালন করে অন্য সুরে।

রজনী, আমাকে তুমি তেমন মেয়ে পাও নি যে কারুর পায়ে ধরে খোশামোদ করবো, ওগো আমাকে তুমি ভালবাসো গো, আমার হৃদয়ের নিধি হও গো। তুমি আমাকে বজ্জাত মেয়েমানুষ বলে ঘেন্না করতে পার, কিন্তু আমাদের মান-সম্ভ্রম আছে। তুমি আমাকে ভুলে যেতে চাও, যাও না। আমি কি পথ আটকে আছি তোমার? কিন্তু রজনী, তুমি তোমার নিজের রক্তের দানকে ভুলে যেও নি। তাহলে ভগবান তোমাকে ক্ষমা করবে না। বুড়োর চোখে পড়ে নি। পড়লে দেখতো ছ-মাসের ছেলের কানে কি রকম গোছা গোছা চুল।

রজনীর গায়ে আগুন জ্বলে। কিন্তু ঘাম হয়ে গড়ায় না। মুখের ফুঁ দিয়ে রজনী বুকে হাওয়া দেয়। বুকের ভেতরটা হাঁপিয়ে ওঠে। ছুটে পালিয়ে যেতে পারলেই যেন সে বাঁচে। যেন সে বসে আছে একটা মৃতদেহের পাশে। এ সেই চারু নয় যার গায়ে ভরা জোয়ারের ঢেউ ছিল। এ সর্বনাশী কোটাল। বানানো পেটকামড়ানির মত ঘোলা জলের ঘুর্ণি পাকিয়ে যে গ্রাস করে নিরীহ দুর্বল মানুষের মনের মাটিকে।

এতদিন ধরে যে প্রগাঢ় ভালবাসাকে গ্রামের অসংখ্য মানুষের ক্রোধ, হিংসা,

কটাক্ষ, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের অবিশ্রান্ত আক্রমণের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েও অনেক বড় করে দেখেছিল রজনী, তার উঁচু চুড়োটা আজ ভেঙে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। রজনী দুশ্চরিত্র। তার ভালবাসার পরিণাম চারুর অচরিতার্থ জীবনের পরিতৃপ্তি বা মুক্তি নয়। তার ভালবাসার জীবন্ত পরিণাম শীতল পরামানিকের ছ-মাসের শিশুর মুখের আদলে, কানে,র চুলে, ছুঁচলো চিবুকে রজনীর প্রতিমূর্তি আঁকা। অথচ সে শিশুটিও একটি রক্তমাংসের বিকৃত প্রেতমূর্তির মত, যাকে কোনদিন নিজের রক্ত-জাত সন্তান বলে ভাবতে গিয়ে মুহূর্তের সুখ পাবে না রজনী।

পরের দিন পাড়ার লোক শুনে অবাক হয়ে যায়—রজনী মত পালটেছে। নন্দ সাঁতের মেয়ে কুন্তিবালাকে সে বিয়ে করবে না।

এই ঘটনার মাস দেড়েক পরেই কলকাতা থেকে একদিন আকস্মিকভাবে খবর এল শীতল পরামানিকের বাসের তলায় চাপা পড়ে মৃত্যু হয়েছে।

রজনী যখন মনে-প্রাণে চাইছিল চারুকে ভুলে যেতে, ঠিক সেই সময় সদ্য বিধবা চারুর শাঁখা-ভাঙা হাত, সিঁদুর-মোছা কপাল, ফাঁকা ও নিঃসঙ্গ জীবনের হা-হুতাশ রজনীকে নতুন পাকে-চক্রে জড়াল।

গঙ্গা আদক এক-একদিন তার দোকানের ভেতরে একদল সাঙ্গোপাঙ্গের কাছে রজনীর গল্প করে। সকলেরই মুখে নেশার বদ্‌গন্ধ। ঘাম আর তাড়ির মেশানো ভারী গন্ধে ঘরটায় ঢুকলেই গা বমি-বমি করে। মুখের আড়ে গেঁজলা ভাঙতে ভাঙতে গঙ্গা গল্প বলে। গলার স্বর কখনো চড়ায় কখনো খাদে মাতালের মত টলমল করে হাঁটে।

উ রজো হয়েছে বাপকো বেটা। কথায় বলে নি, মা গুণে মেয়ে, বাপ গুণে বেটা। ওর বাপ আর মোর বাপ ছিল এক গেলাসের ইয়ের। গলায় গলায় ভাব-সাব। এত ভাব যে দু-জনে এক বাপের দু-মেয়েকে একদিনে বে' করে বসল। মোর প্রথম পক্ষের মা বেশিদিন বাঁচল নি। বাবা ফিরে-বছরে বে' করল আবার। আর তেমনি ওদের মরণও হল বটে বাবু। এই না হলে .ক এক-দিল, এক-প্রাণ। মোর বাপ মরল গলায় দড়ি দিয়ে। কি হয়েছিল জান? সেকালের মানুষের তেজ-দম্ভই আলাদা।

মোর ছোটকাকার বে'। বাড়িতে আত্মীয়-কুটুম্ব লোকজন গিজগিজ করতেছে। ভর দুকুর বেলা বাবা এসে মাকে চুপি চুপি গইলের দিকে ডেকে এনে কইলে—বড়-বৌ, তুই গোটা কতেক স্যাঁতলানো মাছ পেট-কাপড়ে করে লুকিয়ে এনে দে দিকি নি মোকে।

মা বুঝতে পেরেছে মিনসে নেশার চাট করবে। বাড়িতে শুভকাজ। আর উনি এখন তাড়ি গিলে মরবেন!

মা বলে—নড়ে যাও দিনি ইখেন থিকে। তোমার কি একটু লাজ-লজ্জা নেই গা! এই কাজ-বাড়িতে কোন দিকে তোমার 'ভূরুক্ষেপ' নেই। তুমি যাচ্ছ তাড়ি গিলে খালপাড়ের তালতলায় রোদে গড়ডানি দিতে?

তাড়ির নেশা ভারী নেশা। ওতে মন একটুতে পাথর। একটুতে কাতর।

বাবা বলে—কি, তুই মাগী এত বড় কথা বলবি। তাহলে ই প্রাণ আর রাখব নি আমি।

ইদিকে বেলা গড়াচ্ছে। মোদের পুকুর পাড় পেরিয়ে গেলে বাঁশবনের ঝাপসা-ঝুপসীর আড়ালে দলবল অপেক্ষা করতে করতে অধীর। কি হল আদকের পো-র। এই গেল ত সেই গেল। মাছে চাপা পড়ে মরল নাকি?

ঘরের লোকজন বলে—রাগ করে ত বেরি গেল ঘর থিকেন।

বাইরের লোক বলে—না গ, মোরা ত চোখ রেখেছি পথের দিকে।

তখন চারদিকে খোঁজ খোঁজ। শেষ পর্যন্ত খোঁজ পাওয়া গেল মোদের গইলের ভিতরে। গলায় গরুর দড়ি লাগিয়ে ঝুলতেছে।

বে' বন্ধো হয়ে গেল ছোটকাকার। মা উঠোনে কাটা পাঁঠার মত গড়ডানি খাচ্ছে বুক চাপড়ি চাপড়ি কেঁদে। মাও কাঁদে, মোরাও কাঁদি, আত্মীয়স্বজন যারা এসেছিল তারাও কাঁদে। ছোটকাকাও কাঁদে। উদিকে আবার কনের ঘরেও কান্না-চোকার।

আর রজোর বাপ সাঁত-খুড়ো যে মরল, সেইটেও এক অবাক মৃত্যু বটে।

তালগাছে উঠেছে গাছ চাঁছতে। নেশাখোর লোকের মরণ আর কি! গাছের উপর দিয়ে একটা না দুটো পাখী উড়ে যাচ্ছিল। সাঁত-খুড়ো তাই দেখে গাছের উপরেই চেল্লা করে, হাই শ্যালা, নেমে আয়, নেমে আয় উখেন থিকে। তোরা বস্থু সাঁতের কাছে সার্কেস দেখাচ্ছু। আকাশ দিয়ে উড়ে যাবি? ছাখ শালা, আমিও তবে উড়তে পারি কিনা!

গাছের তলায় পুকুর। পড়ে গেলেও হয়ত মরতো নি। কিন্তু একটা লম্বা বাঁশের খুলো পোঁতা ছিল পুকুরে। আর পড়বি ত পড় তারই উপরে। পেটটা ই-কোঁড় উ-কোঁড়। যখন জল থেকে তোলা হল ডাঙায়, গা-শরীর ফুলে একদম ঢোল। একেই বলে নিদেন। নইলে মানুষের কখনও উড়বার মতি হয় গা?

গঙ্গা আদক গল্প বলে। মুখে তাড়ির গন্ধ। শ্রোতারা নেশার ঘোরে ঝিমোতে ঝিমোতে শোনে।

গঙ্গা আদক আড়ষ্ট গলায় খেঁকায়—বলি, তোমরা শুনতেছ ত, নাকি?

হ্যাঁ গ, শুনতেছি। শুনবো নি কেন?

কিসের কথা কইলুম বলদিনি?

আরে ই শালা ভারী মুশকিলে ফেলে। তুই বুঝি একাই গল্প বলায় পারঙ্গদ। ওসব জানা কথা আবার শুনবে কি। তুই বল্ না তোকেই শুনিয়ে দিচ্ছি সাঁত-খুড়োর সেই ছাগল-চুরির গল্পটা। সেই যে ভুঁদে দারোগার চোখের সামনে দিয়ে গুড়ের কলসীর ভিতরে মাংস ভরে এক গাঁ থেকে আরেক গাঁয়ে পাচার করে দিল যেবার।

গঙ্গা আদক আবার শুরু করে তার নিজের কথা।

তোমরা দেখ এই অধমের কথাটা ফলে কিনা! উ রজোর বরাতেও ওর বাপের মত অপঘাত মৃত্যু আছে। অই যে মাগীটা ওর ঘাড়ে চেপেছে উ একটা ডাইনী। মাগীর বিষ গেছে, তবু কুলোপানা চক্র আছে।

কালো পাড়ুই ঠিক এইরকম কথাই বললে একদিন শ্রীপতিকে। শ্রীপতি বিশ্বাস করে নি।

শ্রীপতি সাদাসিধে মানুষ। যাকে উচিত বলে ভাবে তার জন্যে মরিয়া হয়ে মরতে রাজী। যাকে মন্দ মনে করে মার খেয়েও তাকে মানতে রাজী নয়। শক্ত এঁটেল মাটির মত বিশ্বাস।

রজনীর যেবার বিচার হয়, গ্রামের মাতব্বর হিসেবে কাছারিতে সেদিন উপস্থিত ছিল শ্রীপতি। সে নিজের কানে শুনেছে শীতল পরামানিকের উক্তি। সে দিন থেকে রজনীর উপর বরং ভালবাসাই বেড়েছে শ্রীপতির। রজনী যদি একটা বিধবা মেয়ের বিপদে-আপদে দেখা-শোনা করে তাতে দোষটা কোথায়?

কালো পাড়ুই অতঃপর সুর পাল্টায়।—না গ, বাড়ী কাকা, তুমি যেন ভেব নি এটা আমার নিজের কথা। আমি নিজে রজনীকে খুব চিনি। গ্রামের পাঁচজনের থেকে উ এক আলাদা ধরন-ধারনের ছেলে। ইদিকে যত আমুদে-আহ্লাদে, উদিকে আবার ততই গম্ভীর-গুম্ভীর।

শ্রীপতির মন রেখে চলা মানেই তার বাড়িতে মাথা-গলাবার অধিকার পাওয়া। আর কিছুদিন যাবৎ কালোর ঘন ঘন যাতায়াত বেড়েছে ঐ বাড়িতে। শ্রীপতির বড় মেয়ে তুলসী আসার পর থেকে।

তুলসীর বিয়ে হয়েছে প্রায় দশ বছর আগে। অনেক দূরে শ্বশুরবাড়ি। কলকাতা ছাড়িয়ে যেতে হয়। কালো কখনো কলকাতা দেখে নি। সে হাওড়ার ব্রীজের নাম শুনেছে। আগে শুনেছিল পুরনোটার। যেটা জলে ভাসতো। এখন শুনেছে নতুনটার। যেটা হাওয়ায় ঝুলছে, তলায় থাম নেই। কালোর ধারণা ঐ হাওড়ার ব্রীজ পেরুলেই যতদূর যাওয়া যাবে, সবটাই কলকাতা। বিলেতের লোকেরা যখন কলকাতায় থাকতো, তখন কলকাতাটাও নিশ্চয়ই বিলেতের মত প্রকাণ্ড।

তুলসীর শ্বশুরবাড়ি যেখানেই হোক, কালোর কল্পনায় বা ধারণায় সেটা কলকাতাতেই। তুলসীর বরকে কালো তাই অবলীলায় সম্বোধন করে—কলকাতার জামাই।

খুব ছোট বেলাতেই কালো তুলসীর জন্যে অনেক কিছু ভাবতো। দুরন্ত দামাল তুলসী কার ঘরে গিয়ে পড়বে, কে সহ্য করবে ওর দাপাদাপি, চুরি করে খাওয়ার লোভ, একটু বকুনিতেই আমুরী-ঝুমুরী কান্না, এই সব ভাবনা। আর এই সব ভাবনার ফাঁকে সমান্তরালভাবে অন্য একটা তৃপ্তিকর ভাবনার জগৎও গড়ে উঠেছিল তার মনে।

তুলসী রাঁধতে বসেছে। পিছনে পিঠের ওপর ভিজে চুল। পরনে ডুরে শাড়ি। কপালে সিঁদুর। পায়ে আলতা। কানে ঝুমকো। তুলসী যেন এক থোকা লাল রঙের বাস্কানা ফুল।

আর কালোর গা আলগা। ঘামের সঙ্গে মাটি লেগে কাদামাখা সর্বাঙ্গ।

শ্রীপতি না থাকলে আর শ্রীপতির স্ত্রী অর্থাৎ কালোর খুড়ি-মা যখন সংসারের কাজে ঘরে কি বাইরে চোখের আড়ালে নিজের কাজে ব্যস্ত হয়, কালো তাড়াতাড়ি শ্রীপতির হুঁকো থেকে কলকেটা তুলে নিয়ে রান্নাঘরের সামনে দাঁড়ায়।—ও তুলসী, একটু আগুন দিবি।

এ যেন তার চাওয়া নয়, প্রার্থনা নয়, মিনতি। গলা গলে পড়ে দরদে। কালো এখন আর কিছু চায় না। তুলসী তার সঙ্গে একটু কথা হেসে বলুক তাতেই খুশি সে। বড়লোকের বাড়ির বৌ হয়েছে তুলসী। ওর স্বামী নাকি চাকরি করে খুব নামকরা কারখানায়। বড়লোক হবেই। আর কালো যে এখনও সেই চাষার ছেলে চাষা। বয়সটা যা বেড়েছে। চেহারাটা যা ঢেঙা হয়েছে একটু। রান্নাঘরের সামনে গেলে, তুলসীর হৃষ্টপুষ্ট তাজা শরীরটার দিকে চোখ পড়লে তাকে একবার ছুঁয়ে দেখতে ইচ্ছে করে কালোর।

এ সেই দশ বছর আগেকার ধুলো মাটির, ছেঁড়া কাঁথার, রুখু চুলের কালোর মন-আলো-করা তুলসী নয়। কলকাতার আলো-বাতাস, সিনেমা-বাইস্কোপ, গাড়ি-ঘোড়া, আরও কত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে গড়ে-ওঠা তুলসী। একে একটু ছুঁয়ে দেখলে হয়।

তুলসী কথা বলে না। এক হাতা আগুন বাড়িয়ে দেয়।

কালোর হাত ছোঁয়া হয় না। ভুলে যায়। ভুলে যায় এই জন্যে যে সে দেখতে পেয়েছে রান্নাঘরে তুলসী ছাড়াও আর-একজন রয়েছে। সে সুখি।

সুখি তুলসীরই বোন। তাই অবিকল দশ বছর আগের তুলসীর মত দেখতে তাকে। যেন সবে উঁকি দিয়েছে চতুর্থী পঞ্চমীর চাঁদ। এখনও কত বাড়-বাড়ন্ত বাকী।

কালো আজকাল রোজ-রোজ কেন যে ছুটে আসে তা সে নিজেও জানে না। তুলসীকে দেখতে? সুখির সঙ্গে কথা কইবার ইচ্ছেয়? কালো নিজের মনকে প্রবোধ দেয়।

না, এসব আমার উচিত নয়। এমনিতেই গ্রামের লোকজন আমার চরিত্রকে সন্দেহ করে। আমি এত ঘন ঘন আসবো কেন এখানে?

কিন্তু কাজকর্মের পর সন্ধ্যের দিকে একটু ফুরসুত পেলেই কালো বেরিয়ে পড়ে শ্রীপতির ঘরের দিকে।

কালোর বৌ সোদো ওরফে সোদামিনী মুখ-ঝামটা দেয়।

হ্যাঁগা, রোজ সোন্‌ঝের বাতি জললেই কুন মড়াচিলে যাও তুমি?

কোথাকে যাব আবার? গরমের রাত। এই একটু পাড়ায় ঘুরে আসতে যাই। যাবো নি কি ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে ঘরে বসে থাকবো?

সোদোর স্বামীকে সন্দেহ করার বাত্তিক আছে। কালোর চরিত্র সম্বন্ধে গ্রামের লোকের চেয়ে সোদোর ধারণা অনেক বেশি কাল্পনিক এবং প্রকট। কালো তার বউকে ভয় করে। বউকে মানে বউয়ের মুখকে। মুখরা হিসেবে সোদোর মত এত অল্প বয়সে এ গ্রামে আর কেউ নাম করতে পারে নি। ঝগড়া-ঝাঁটির সময় সোদো তার স্বামীর ইহজীবনের ধারাবাহিক ঘটনাবলী সর্বসমক্ষে প্রকাশ করে দেয়। সে-সব ঘটনাবলীর মধ্যে থাকে, কবে কালো কাদের পুকুর পাড়ে কার বউয়ের হাত চেপে ধরেছিল, কার মেয়েকে ফুসলিয়েছিল কবে, ইত্যাদির সঙ্গে তার ছোটখাট হাত-সাফাইয়ের ইতিহাস। কালো কয়েকবার সোদোর হাতে ঝাঁটার মারও খেয়েছে।

কালো কিন্তু নিজের জন্যে, ঘর-সংসারের জন্যে চুরি করে না। সে চুরি করে সোদোর মনকে খুশি করতে। সব সময়েই সোদোর বিরক্ত, বিব্রত, অল্প বয়সে বুড়িয়ে-যাওয়া মুখখানায় দশ বছর আগেকার সলজ্জ কিশোরীর কাঁচা লাবণ্য ও মিঠে হাসিটুকু আর-একদিনের জন্যে খুঁজে পেতে। চুরি করা জিনিসের প্রতি সোদোরও ভারী আকর্ষণ। পেলে সে খুশি হয়। দশবছর আগের বয়স ফিরুক বা না ফিরুক।

কালো যা দিয়ে স্ত্রীর মন রক্ষা করে, সোদোর মন বিগড়োলে সেটাই কালোর মান রক্ষার বিপরীত হয়ে দাঁড়ায়।

কালো শুধু তুলসীকে ভালবাসে না, তুলসীর প্রসাধনাবলীকেও ভালবাসে। চাষী-ভূষীর ঘরে হিমানী পাউডারের শিশি-কৌটা অতি দুর্লভ। তাই অতি দর্শনীয় বস্তু। প্রতিদিনই কালো তার একটা চোখকে সজাগ সতর্ক করে রাখে। তুলসী একটু অসাবধান হলেই বা বাড়ির লোকজনের অন্যমনস্কতা দেখলেই কিছু-না-কিছু সরিয়ে ফেলে। তুলসী দোষ দেয় তার ছেলেটাকে। তার ছেলের অভ্যাসটা ভারী খারাপ। ঘরের জিনিস বাইরে ফেলে আসে।

কালোর মিথ্যে কথাকে যত সহজে সত্যি বলে মানা যায়, পাঁচ বছরের ছেলের সত্যি কথাকে তত সহজে বিশ্বাস করাটা বয়স্কমাত্রের পক্ষেই অস্বাভাবিক।

কালো অনেকদিন থেকে দেখছে তুলসী কপালে সিঁদুর না পরে কি রকম একটা টিপ পরে। আলো লাগলেই ঝলমল করে সেটা।

সোদো তুলসীর চেয়ে ঢের কালো। কালোর নিজস্ব ভাষায় 'ওমিবস্থে পুর্ণ্যিমের' তফাত। তবু ঐ টিপ্‌টারই এমন একটা নিজস্ব দ্যুতি আছে যা সোদোর লম্বাটে মুখখানাকেও সুন্দর করে তুলতে পারে।

কালো একদিন তুলসীর কপালের একটা টিপ হাত-সাফাই করে সংগ্রহ করার মতলবে সন্ধ্যে থেকে এসে গল্প জুড়েছিল।

শ্রীপতি ঘরে ফিরে কালোকে বসে থাকতে দেখে বলে—হ্যাঁরে কালো, তুই হেথা বসে গজল করতেছু। আর তোকে যে গঙ্গার দোকানে খুঁজো-খুঁজি করতেছে সবাই। রিহেরসাল বসে আছে।

তাইত গ। একদম খেয়াল ছিল.নি। সকলে এসে গেছে?

কালো উঠতে যায়। সুখি তার বাপের কাছে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করে—কালোকা, তোমরা এবারে কি যাত্রা করছ?

দ্রুপদীর বস্তোহরণ।

কালোর সঙ্গে শ্রীপতিও বাইরে বেরোয়। শ্রীপতি জিজ্ঞেস করে—হ্যাঁরে কালো, রজো নামবে নি?

রজো? না। তাকে ত অনেক করে বলা-কবা হল। সে বলে আমি তখন দেশে থাকব নি।

কোথা যাবে?

অত কি খোলসা করে বলে নাকি? শুধু বলে ইবারে আমি চাষ-বাসে নেই। গাজনের আগে থেকেই থাকব নি। তাকে ত অর্জুনের পাটটা দিয়েছিল। মানাতোও বটে। কিন্তু কি যে ওর মতিগতি।

একটা তিনমুখো রাস্তার বাঁকের কাছে এসে দুজনে দুদিকে বাঁকে। শ্রীপতি যায় সুরেনের কাছে। কালো যায় রিহার্সালে। দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণে তার দুর্যোধনের পার্ট।

গাজনের আগে প্রতি বছরই গঙ্গা আদকের দোকানটা জমে ওঠে যাত্রার রিহার্সালে। পারুক না পারুক সকলেই যোগ দেয়। 'চৈতি-মাস' তাড়ির মাস। ভারী রসালো মাস। তাই যদি ভুল উচ্চারণে, বেসুরো গানে, বেঢপ চেহারায় কোন করুণ মর্মস্পর্শী দৃশ্য বিপুল হাস্যোদ্রেক করে, শ্রোতারা তখন না-উঠে না-নড়ে আরও স্থির হয়ে বসে এই কারণে যে, বিনা পয়সায় এমন হাসিটাই বা হাসাচ্ছে কে? তার কি কোন মূল্য নেই? টাকা-পয়সা খরচ করে শহর থেকে নামকরা যাত্রার দলকে এনে গাওয়াবার মত ট্যাকভারী অবস্থা এখন কি আর গ্রামের আছে!

শ্রীপতি সুরেনের সদরে গিয়ে দাঁড়ায়। সুরেন পাট কাটছিল ঢেরা ঘুরিয়ে। সব সময়েই সুরেনের কাজ। বিরাম-বিশ্রাম নেই। রাজহাঁস জলে একদম ডুবে আছে। কিন্তু ডাঙায় উঠলে গায়ে জলের ছিটে-ফোঁটা নেই। সুরেনও তাই। সংসারে ডুবে আছে। বলতে কি একগলা জলে। কিন্তু সব সময়ে এত গম্ভীর স্থির আর আত্মসমাহিত যে মনে হয় বুঝি সংসার থেকে অনেক দূরে।

কি করতেছ সুরোদা?

কে, শ্রেপতি? আয়।

শ্রীপতি একটা খুঁটিতে ঠেস দিয়ে রেলিঙে বসে।

কি করতেছ?

দড়ি পাকাচ্ছি। গরুর দড়ি বানাতে হবে গোটা-দুই। জানু, একটা কথা ভাবতেছি মনে।

কি ?

ভাবতেছি বড় ছেলেটা ত বুড়ো হয়ে এসেছে। টেনে-কষে ওকে দিয়ে আর একটা চাষ নামানো যেতে পারে। তার পরেই যে উ শুবে, সেই ওর শেষ শুয়া। ত ভাবতেছি গরুটাকে পালটিয়ে লুবো।

হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা ত ভাল কথা। তবে শুধু গরুর বদলায় কি গরু পাবে ? হয়ত ঘর থেকে নগদা কিছু দিতে হবে।

তা বরং দুবো।

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে শ্রীপতি হঠাৎ প্রশ্ন করে—হ্যাঁগা সুরোদা, তবে যে শুনমু রজো কোথাকে যাচ্ছে। চাষ-বাসের সময় নাকি ঘরে থাকবে নি।

ঘুরন্ত ঢেরাটা হাতে চেপে ধরে সুরেন ঘাড় ঘুরিয়ে তাকায়।

এই কালোর মুখে শুনমু। যাত্রার জন্যে ওকে ছেলেরা কি পাট দিতে চেয়েছিল। উ নাকি নেয় নি। বলেছে, আমি তখন গ্রামে থাকবো নি। আমি ভাবমু তোমাদের ঘর-সংসারের কাজে বুঝিবা বাইরে যাচ্ছে। তুমি তার কাছে কথাটা পেড়েছিলে ?

কিসের কথা ? বে'র ?

হ্যাঁ গ।

আমাকে উসব কাজের ভার দিও নি তোমরা। উসব রমণীকে বলো। সেই সব ব্যাবোস্থা করবে। তাকে বলেছিলে ?

রমণীকে ত ? হ্যাঁ, বলেছিমু একদিন!

কি বলল সে ?

সে বলে—আমাকে শুনিয়ে কি হবে। বে' ত আর আমি করতেছি নি।

সুরেন বলে—কথাটা একদম ফ্যালনা নয়।

আমি ত রজোকে বলতে 'আপুত্তি' করি নি। তবে তোমরা যদি আগে থেকে একটু বলে-কয়ে রাখতে, তাহলে কাজটা ভাল হতো। ঠিক আছে, আমি নিজেই ওর সাথে দেখা করবোখন। কিন্তু উ যে কখন কোথাকে থাকে—

শ্রীপতি চলে যাবার মুখে সুরেন পিছু ডাকে।

অ শ্রেপতি, শুনে যা। একটা কাজ করতে পারু ?

কি বল।

মোদের মেজ বৌমাকে যদি বলে রাখতে পারু, তাহলে খানিকটে কাজ হবে।

বড়-বৌ, কি মা, কি আমাদের কথা না রাখলেও, মেজ-বৌকে রজো খানিকটে ভয়-ভক্তি করে, ভালবাসে, তার কথাটা রাখলে রাখবে।

শ্রীপতি সুরেনের পরামর্শমতই কাজ করে।

পরের দিন সন্ধ্যেয় রজনী জন খেটে ঘরে ফিরে হাত-মুখ ধুয়ে বসেছে। পদ্ম একটা কাঁসার প্রকাণ্ড জামবাটিতে মুড়ি দিয়ে গেল খেতে।

বড়-বৌ-এর ছোট্ট মেয়েটা সদ্য পেটের অসুখ থেকে উঠেছে। সে হামাগুড়ি দিয়ে রজনীর গা-ঘেঁষে বসে। রজনীকে যে সে খুব পছন্দ করে তা নয়। কিন্তু খাবার সময় সকলেই তার বন্ধু। মাঝে মাঝে ঝানু মেয়েদের মত চোখ টিপে-টিপে হাসে। থেকে থেকে খাবলা মারে জামের মুড়িতে। রজনী হাঁক দেয়—অ বড়-বৌদি, বুঁচিকে সরিয়ে নিয়ে যাও।

বড়-বৌ রান্নাঘর থেকে হাঁকে—ছেলেগুলো কোথাকে গেল। কানে শুনতে পায় নি।

তারা সব ঘুমিছে।

ঘুমিছে! সোন্ঝের বাতি জ্বলতে না জ্বলতেই ঘুম?

পদ্মর একটুখানি বাকি ছিল বাটনা বাটার। কাজ শেষ করে সে বুঁচিকে কোলে তুলে নিয়ে রজনীর পাশে এসে বসে শুধু আড়চোখে তাকায় আর মিটমিটিয়ে হাসে গা-ঝাঁকিয়ে।

হাসি কেন এত! হাসি আর ধরে নি বুঝি পেটে?

পদ্ম তবু হাসে।

যাঃ চ্যুলো। হাসি এত কিসের?

তোমার শ্বশুর এসেছিল কাল। একটু বুঝি-বাঝি বলতে বলে গেছে তোমাকে।

রজনী চুপ করে শোনে। কিন্তু বেশিক্ষণ পারে না।

হ্যেৎ, থামো দিকনি। বোকো নি অত।

এসব বুঝি বকা হল?

পদ্ম রজনীর নীচু মুখটাকে চিবুক ধরে টেনে তোলে।

তাহলে তুমি বুঝি বে' করবে নি?

কি ইয়ারকি হচ্ছে মেজকি। হ্যাঁ, উঠে যাব এখুনি কিন্তু।

পদ্ম সে কথায় কান দেয় না।

হ্যাঁগা, তোমার তাঁর মতামত নিয়েছ? তিনি কি 'পারমিট' দিয়েছেন? নাকি তাঁর মত পাও নি বলেই এমন চুপটি মেরে আছ?

রজনী মুড়ির বাটি ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়।
কি, এখুনি কি তাঁর মত আনতে যাচ্ছ নাকি?
রজনীকে আরও রাগিয়ে দেয় পদ্ম। কিন্তু সে যে সত্যিই চলে যাবে, তা বুঝতে পারে নি। পদ্ম খানিকক্ষণ নিজের প্রগল্‌ভতার ওপর বিরক্তি প্রকাশ করে মনের কষ্টকে সামলায়। তার পর আধ-ঘুমনো খুঁচির গায়ে হাত চাপড়াতে চাপড়াতে একটা ঘুমপাড়ানী গানের কলি গেয়ে ওঠে।
রজনী বাইরে বেরিয়ে ভাবে, মেজকি হয়ত ভাবছে তার উপরেই রাগ করেছি আমি। রাগ একটা করেছি বটে। কিন্তু কার ওপর?
নিজেকেই প্রশ্ন করে রজনী। রাগটা কার ওপর? জগৎ-সংসারের জটিল ঘটন-অঘটনের ওপর? সে-রকম কারণটাই বা কি ঘটল এখন? তাহলে কি নিজের মনের জট-পাকানো খাপছাড়া গতিবিধিটাই ডাঁশ-পিঁপড়ের মত কামড়াচ্ছে তাকে? তারই তেজালো বিষের প্রতিক্রিয়াটাই কি প্রাণে জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছে তার?

পাঁচ

রজনী রাস্তায় বেরিয়ে কোন্‌দিকে যাবে বুঝতে পারে না। চারুর কাছেই যেতে চায় সে। চারুকে অনেক কথা বলার প্রয়োজন। নিজের জীবনকে নিয়ে রজনী যে নতুন পরিকল্পনা করেছে বা করতে চাইছে, চারুর তাতে সম্মতি মিলুক বা না মিলুক, তাকে না জানিয়ে রাখা ভাল নয়।
মাথার ওপরে চৈত্রের আকাশ। এ আকাশের মর্জির ঠিক নেই। এই হরিণের গা, এই ময়ূরের পেখম। আবার চোখ ফেরাতে না ফেরাতেই হয়ে গেছে বাঘের থাবা, কালো মহিষের গুঁতিয়ে-আসা ভঙ্গী। শুধু কি মেঘ! মেঘে মেঘে গর্জন। যেন খেপা তবল্‌চি ঢোলুক পিটছে ঝাঁপতালে।
সাঁই সাঁই করে হাওয়া উঠল আচমকা। রজনী হাওয়া ঠেলে আর এগোতে পারে না। মল্লিকদের দরজা গোড়ায় এসে দাঁড়ায়।
কে ওখানে?
আমি।
কে বলদিদি?
আমি রজো।

ওঃ, আমাদের রজো! হায় ছাখ, অন্ধকারে একদম ঠায়র করতে পারি নি। এই ঝড়ে ঘর থেকে বেরিছু? ত দাঁড়িয়ে রইলু কেন, ভিতরে আয়।

ভূষণের মেয়ে পিঁড়ে পেতে দেয় রজনীকে।

ভূষণ বলে—দু-একদিনের মধ্যে বৃষ্টি না হওয়া মানে কি জান? রোগে-জ্বালায় গ্রামকে গ্রাম উজাড় হয়ে যাবে। এইত উত্তরপাড়ার পূব দিক্‌টায় শুরু হয়ে গেছে মায়ের খেলা। কেউ মরে নি বটে। কিন্তু শালতিয়েয় ত এ পর্যন্ত প্রায় দশ বারো জন মরেছে। রোজ ত মানত-মানসিক, ইন্দ্রদেবতার পূজো দিচ্ছি। তবু আকাশের চোখে কী এক ঠসা জল গড়াচ্ছে?

ইন্দ্র দেবতার পূজোয় পুকুর পাড়ের মাটি দিয়ে চারটে পুতুল বানাতে হয়। এক জোড়ে ভাসুর-ভাদ্রবৌ। আর-এক জোড়ে ভাগনে-বৌ আর মামাশ্বশুর। যার যাকে ছুঁতে নেই সেই তাকে ছুঁয়ে থাকে। যার একমাত্র মেয়ে, সেই মেয়ের কেউ মরে নি, তাকে দিয়ে ফুল ছোঁয়াতে হয় ঐ পুতুলের পায়ে। তার পর মানসিক করে তুলে রাখতে হয় প্রথম হাঁড়ির দই-সন্দেশ, নিদেন পক্ষে দোকানের বাতাসা। মন্ত্র-টন্ত্র নেই। শুধু মনে মনে খানিকক্ষণ বিড়বিড় করে জলের প্রার্থনা করা। জল হলে ওতেই হয়। না হলে মানুষ কি করবে। দেবতার মর্জি।

ভূষণ বলে, বাবাজী বসো একটু। গা-হাতটা ধুয়ে আসি।

ভূষণের মা একটা চেটাই পেতে শুয়ে আছে উঠোনের ওপারে একটা দরজা খোলা ঘরের ভিতরে। ভূষণের ছেলে তাকে 'লক্ষ্মীচরিত্র' পড়ে শোনাচ্ছে। রজনী আকাশের জটিল অবস্থার দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবে আর 'লক্ষ্মীচরিত্র' শোনে।

> আজ্ঞা দিল বিনন্দেরে রাজা রুষ্ট মনে।
> বিনন্দ না শুনি বাক্য চলে গৃহ পানে॥
> বাহান্ন পৌটি ধান্য কুড়িটি খামারে।
> লিখিল পাতায় সব নৃপ সরকারে॥
> গাড়ি উট গরু দিয়া বাহিতে লাগিল।
> নিমেষে বহিল ধান্য কিছু না রহিল॥
> বিনন্দ রাখাল তবে না দেখি উপায়।
> ক্ষেত খুঁজি মোট ধান্য কাঠা দুই পায়॥
> সেই সব আর কিছু নাড়া লয়ে হাতে।
> দুঃখ মনে হেঁট মাথে আসিল গৃহেতে॥

বিনন্দ রাখালের পালা রজনীর শোনা আছে। লক্ষ্মীদেবীর কৃপাদৃষ্টিতে সে পেয়েছিল রাজকন্যা আর রাজপুরী। ছিল চাষা। হল রাজা। এসব পড়তে শুনতেই সুখ। কিন্তু সত্যি কি ঘটেছে? চাষী-ভূষীর ঘরে কোন্ বাড়িতে না লক্ষ্মী পুজো হয়? কিন্তু কোন্ চাষীটা রাজা হল? রাজার বদলে সব ফকীর।

যা চোখের সামনে ঘটে না রজনীর তাতে বিশ্বাস নেই। চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে ঘাড় হেঁট করে মানবে।

ভূষণ গা-হাত ধুয়ে তামাক সেজে নিয়ে চেটাই পেতে বসল রজনীর পাশে।

জান বাবাজী, আমার দিনখ্যানটা ভারী খারাপ যাচ্ছে। মন-মেজাজটা ভাল নয়।

কেন, কি হয়েছে ভূষণকা।

এই দ্যাখ না। বাবুদের বাড়িতে চাল ছাইতে ছিনু পরশুদিন। তা মুড়ি বেলায় বলি কি হাট থেকে চার পয়সার সোডা মাটি কিনে আনি। জিনিসটা এনে বাবু দিউড়ির এক আড়কাঠার উপড়ে লুকিয়ে রেখে দিনু। ঘরে ফেরার মুখে ত আনবো। আনতে গিয়ে দেখি ফাঁকা।

হায় দ্যাখ। কি হল তাহলে?

কি হবে আবার? কে নিলো সেটা বুঝতে পারলুম পরে। প্রভাত ছিল আমার যোগাড়ে। উ শালা কখন তাকে-তোক্কে দেখেছে। বিকেলে গিয়ে ধরলুম। তুই আমার সোডার মোড়াটা নিয়েছু? বলতেই একবারে একশটা ঠাকুর-দেবতার দিব্যি-দিলাসা খেলে। ওর যে ঐ রকম হাতটান। এইত সেদিন তেলিদের ছাগলদড়ি চুরি করেছিল বলে কী মারটা খেলে। মেরে হাড়-মাস ছিঁচে দিলে বুড়ো মন্দটার। তবু কি রোগটা সারল?

রজনী ভূষণের হুঁকো থেকে কলকেটা তুলে নিয়ে দু-হাতের চেটোর ফাঁকে সেটে নিয়ে ফস্‌ফস্ করে টান দেয় পিছনে ঘুরে বসে।

ভূষণ তার কথা শেষ করে।

কথায় বলে নি, বুকের পাটা না মুড়ো ঝাঁটা। ওর সাহসটাও তেমনিতর।

ভূষণের কথাগুলো শুনতে ভারী ভাল লাগে রজনীর। টেনে-বুনে কথা। প্রত্যেক কথার শেষে বিচিত্র একটা টান। ঐ বিলম্বিত টানটাই যেন এক শব্দ থেকে আরেক শব্দের মাঝখানে যোগসূত্র।

বয়স ভূষণের প্রায় তিনকুড়ি। তবু মনটা এখনো যুবা-যুবা। দু-কুড়ি বয়সীদের

মত তাগদ নাই বটে, কিন্তু আমোদ-ফুর্তিতে পাল্লা দিতে পারে। গাজনের দিনে ভূষণ মল্লিক তরজা গাইবে। কার হিম্মত আছে তার পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। আর যারা গাইয়ে আছে চার মুল্লুকে, তারা সকলেই ভূষণের শিষ্য-সাঙাত। আসরে উঠেই তারা গুরু-বন্দনায় গাইবে,

আমার গুরু কল্পতরু বাখরী গাঁয়ে বাস।
ভূষণচন্দ্র নামটি তাহার আমি দাসানুদাস॥

রামায়ণ মহাভারত ভূষণের গলার আগায়। গীতার বচন, খনার বচন আরও কত কিছু। অথচ জ্ঞান-বিদ্যে সেকেলে পাঠশালার তালপাতা।

রজনী কলকেটা আবার ভূষণের হুঁকোয় বসিয়ে দিয়ে বলে—কই গ, ভূষণ কা', কই, আর কি বেপদ কইলে নি ত।

চার পয়সার সোডা চুরি গেছে বলেই ভূষণের দিনগুলো মন্দ কাটছে, এটা যে সত্যি নয় বুঝতে পেরেই রজনী প্রশ্ন করে আন্দাজে। অন্য কোন বড় একটা আঘাত আছে হয়ত।

ও হ্যাঁ, না, থাক গে সে-সব। এক কান থেকে পাঁচ কান হবে।

আগ তুমি বল না, আমার মুখ আলগা নয়।

ভূষণ তার দুঃখ-দুর্দশার কাহিনী বলে।

কথায় বলে, 'মূলধন উবে, দিন ডুবে ডুবে।' তাই হয়েছে। এক পয়সার 'ক্রাচিনে' দুটো লম্ফ জ্বলে। রোজ দিন দেড় টাকা হিসেবে তিন রোজের দাম তিন দেড়ে সাড়ে চার টাকা, এইটে কি কম হল তাহলে? যাদের আছে, তাদের আছে। আমাদের বাবু নুন আনতে পান্তো ফুরোয়। একবেলা খেলে আরেকবেলা উপোস। তা খাল-কাটার মাটি কাটনু আজ প্রায় দশদিন। সোন্‌ঝে হলে রোজ যাই, একবার করে তাগাদা দিই। গিরীশবাবু খাল কাটার ম্যানাজার। বলে, আসিস না কাল দুবোখন। আরে বাবু, দিবে নি কি আর দেশান্তরী হয়ে যাবে? কিন্তু পেট কথা শুনবে? ঘরের মেয়েমানুষ, তারা হিসেব-নিকেশের কি বোঝে? উপায়-পাতি কিসে কি হয় জানে কি? তারা রেগে-চটে তাল-বেতাল। ধামুস-ধুমুস ঢাই-ঢাই করে খিদে-পাবা ছেলে-গুলোর পিঠে কিলোবে, গাল-মন্দ দিবে পুরুষদের ওপর আক্রোশে। আমরাও পুরুষমানুষ। রাগ বলে চণ্ডাল। এত রাগ সামলাতে না পারলুম ত দিনুম জালের বাড়ি, কি হাতের লাঠি-ছড়ি দিয়ে শ্বাঁপ-শ্বাঁপ। মেরে ত ফেলনু। কিন্তু মারতেছি কাকে? না নিজের বৌ-ঝিকে। সে চাবুক নিজের গায়ে বাজবে নি?

শেষকালে গালে হাত দিয়ে ভাবি, কেন যে রাগের মত এমন চণ্ডালকে বুকে পুষে রাখে মানুষ ?

সেদিন গেনুম গিরীশবাবুর দলিজে। চোখের সামনে গুচ্ছেৎ টাকাটা-সিকেটা ছড়ানো। নোটের তাড়া। তবু মুখ তুলে তাকিয়ে একবার কইল নি যে, কত টাকা পাবি রে ভূষণ, নিয়ে যা সব শোধ করে। হিসেব মিটি নে।

সেদিন আর পারলুম নি। মেজাজে রাগটা লাফিয়ে উঠল। গরম হয়ে গেল মাথাটা। মুখ খিস্তি করে ফেললুম। গিরীশবাবুও আমাকে জুতো মারতে এল। বলে—শালা চাষা, তোমার ছোট মুখে বড় বড় কথা। জুতিয়ে ঠাণ্ডা করতে পারি জান ? টাকাটা পেনু। কিন্তু মাঝখান থেকে বাবুর পাঁচ বিঘে জমি ভাগচাষ করতুম সেটা গেল। জমি ছাড়িয়ে নিল ম্যানাজারবাবু। অন্য সময় হলে হাতে-পায়ে ধরা যেত। কিন্তু তখন রোক-শোধের গোঁ। স্যাকরার ঠুকুর-ঠাকুর, ত কামারের ঘা ! বাবু মারে পাঁচদিন। আমাদের বোবা মুখে বুলি ফোটে একবার দু-বার। কথায় বলে—'বাঘ-মহিষের রাজ্যে থাকি, মনের আগুন মনে রাখি।'

কাণ্ডটা ভারী ভুলচুক হয়ে গেল। হুট করতে মেজাজটা অতখানি না গরম করলেই হতো। হাজার হোক ওনারাই বিপদ-আপদের রক্ষেকর্তা। ঘর-সংসার করতে গেলে দেব-দেবতাদের মত ওঁদেরকেও তুষ্ট রাখতে হয়।

ভূষণ একটু থামে। হাতের নিভন্ত হুঁকোটাকে দেয়ালে ঠেকিয়ে রাখে। হাওয়ায় একটা কাপড় উড়ে গেছল উঠোনে। সেটা কুড়িয়ে এনে ঘরের ভেতরে ফিকে দেয়। তার পর আবার চেটাইয়ে বসে।

জান বাবাজী, ই সংসার এক ভারী বন্ধন। ইখেনে তুমি কেউ নও। তোমাকে ঘরেও মারবে। পরেও মারবে। যাকে তুষ্ট করবে সেও তোমাকে বাঁধবে। যাকে দুষ্টু বলবে সেও তোমাকে বাঁধবে।

ভূষণ আরও অনেক কথা বলে। মন্ত্রমুগ্ধের মত শোনে রজনী। যে কথাগুলোয় তার মন সায় দেয়, সেগুলো তার মনে গেঁথে বসে।

রজনী তার অন্তর থেকে নানা দিনের সঞ্চিত দুঃখের অনুভূতিগুলোকে টেনে টেনে বার করে। ভূষণের দুর্দশাকে নইলে আন্তরিকভাবে অনুভব করবে কি করে সে।

ভূষণের মা-র 'লক্ষ্মীচরিত্র' শোনা হয়েছে। ভূষণের দিকে আসতে আসতে বলে—আরে অ ভূষণ, তুই কার সঙ্গে অত গজল করু ?

রজনী এসেছে জান নি।

আহা তাই নাকি! উ যে নতুন মানুষ গো। পথ ভুলে এল নাকি?

ভূষণের মা উঠে এসে রজনীর মুখের সামনে মুখ এনে ভালভাবে নিরীক্ষণ করে।

আরে রজো, তোর বে'র কথা যে কানে এল সিটের হল কি? কিরে বাবু, কথার জবাব দে না। তুই আবার বেশি-বেশি লাজুক।

আগো মাসী, তুমিও যেমন আর আমিও তেমন। ও-সব উড়ো কথায় কান দাও কেন?

কেন, শ্রেপতি তোকে বলে নি কিছু?

না।

বলুক না বলুক, তুই একটা বে'-থা কর না। বয়স পেরি গেলে আর কিসের সুখ-সাধ? তোর মা'ও ঢেলা উল্টোবার আগে ছোট বৌটার মুখ দেখে যাক। তয় আর সুখিতে মানাবেও ভাল। বেশ দেখতে-শুনতে মেয়েটা।

বৃষ্টি পড়ছিল না। একে বলে ঝিসৃকিনি। গুড়ি গুড়ি ধুলোদানার মত বৃষ্টি। রজনী বলে—এবার উঠি ভূষণকা।

ভূষণের মা বাধা দেয়—আরে উঠু কেন? আঁধার-বাদলায় কোথা যাবি এখন?

না মাসী, আমি একবার উ-পাড়ায় যাবো। দাম আনতে হবে দু-রোজের।

ভূষণ বলে—চল, আমিও যাব একবার বাবুদের বাড়ি। তোর সঙ্গেই বেরোই।

কোন্ বাবুদের বাড়ি?

ঋষিবাবুর বাড়ি।

উখেনে আবার কি দরকার তোমার? কার কাছে?

ছোটবাবুর কাছে।

ওনার কাছে দরকার?

রজনীর কেমন গোলমাল লাগে ব্যাপারটা। ছোটবাবু অর্থাৎ বিজনবাবু—মানুষটা গ্রামের দশজনের চেয়ে একেবারে আলাদা। এককালে কংগ্রেস করেছে। জেল খেটেছে বহুবার। অবিবাহিত। দিনরাত পড়াশোনা নিয়ে থাকে। পুড়ে পুড়ে লোহা যেমন শক্ত হয়, পড়ে পড়ে লোকটাও তেমনি ভারিক্কী হয়েছে। চোখের দিকে তাকানো যায় না, সূর্যের মত তাপ যেন চোখে। ঋষিবাবুর মোটা ভোঁতা থসথসে গতর। দেখলে বোঝা যায়

ঘি-দুধের মানুষ। কলকাতার বড় মাইনের চাকুরে। ছোটবাবুর সঙ্গে আশ্চর্য রকম গরমিল। ছোটবাবুর ওপর লোকের একটা শ্রদ্ধাজনিত ভয় আছে। নানা লোকে নানা রকম গুজব মন থেকে তৈরি করে মনের মধ্যে পুষে রেখেছে। কি করে সেগুলো তৈরি হয়েছে তা কেউ জানে না। ছোটবাবুর সম্পর্কে সব চেয়ে বড় ভয়টা হল তাঁর সঙ্গে মেলামেশা করলে নাকি সরকারের খাতায় নাম উঠবে। আর সরকারের খাতায় নাম ওঠার মানেই হল জেল, হাজত, হাত-কড়া। সরকার বলতে গ্রামের লোকের মনে এক পলকে যে ছবিটা ভেসে ওঠে, সেটা কতকগুলো হোমরা-চোমরা খাঁকি পোষাক পরা, কোমরে বন্দুক ঝুলনো দারোগা ম্যাজিস্ট্রেট এস-ডি-ও আর লাঠিধারী মোচা গোঁফের লালপাগড়ী পুলিস। এইসব কারণেই গ্রামের শুভ্র-ভদ্র সকলের কাছেই ছোটবাবু খানিকটা একঘরে। ধীর, স্থির, পণ্ডিত মানুষের মত কথা বলে ছোটবাবু। রজনীরা বহুবার তাঁর বক্তৃতা শুনেছে আশপাশের মিটিঙে, যখন ভোটকে কেন্দ্র করে একটা বড় রকমের আলোড়ন, আর দলাদলি ঘোঁট পাকিয়ে ওঠে। ছোটবাবুর কথাকে পাল্টা যুক্তি দিয়ে তছনছ করে দেবার ক্ষমতা শহরের নামজাদা বক্তাদেরও শক্তিতে কুলোয় না। একদিন ছোটবাবুর বক্তৃতা শুনলে একমাস তার রেশ মনের মধ্যে আঁচড়ায় কামড়ায়। বেশিদিন নয়, মাত্র ছ-মাস আগের একটা ঘটনা রজনীর মনে পড়ল।

সামনে ভোটাভুটি। গ্রামের উত্তরপাড়া, দখিণপাড়ার মাথা-মাতব্বরেরা এক-জোটে বলাবলি শুরু করলে—এবারে আর কোন পক্ষকেই ভোট দেওয়া হবে না। যেই যায় লঙ্কায় সেই হয় রাবণ। গরীব-গুর্বোর ভাল করবে, সুখ-সম্পদের ব্যবস্থা করবে সে ইচ্ছা যখন ভগবানেরই নেই, তখন মানুষ ত কোন্ ছার। সব গ্যাঁট হয়ে চুপচাপ বসে থাক। কারো মন ভুলনো বাক্যে রা-টি কাড়া হবে নি।

কিন্তু একদিন গ্রামের আটচালায় ছোটবাবুর বক্তৃতা শুনে মানুষের মনের হাওয়া বাঁক নিল। মোড়ল-মাতব্বরেরা একজোটে বলাবলি শুরু করলে—এবার একটু মুখ পাল্টাতে হবে। একপক্ষকে ত এতদিন গদীতে বসতে দেওয়া হল। এবার এরাও একটু ঠাঁই নাড়া হোক, ওরাও একটু ঠাঁই নাড়া হোক।

ইতিমধ্যে গভীর রাতে কার বাড়িতে কে গিয়ে কি মন্ত্র দিল। দিনের হেরফেরে মনেরও হেরফের ঘটতে থাকে। মোড়ল-মাথাদের গলায় অন্য সুর বাজে। কে আমাদের জন্য কবে কি করবে তার জন্যে এখন থেকে দামের ভোট হাত-

ছাড়া করবো নাকি ? যা করার হাতে-নাতে হয় ত বুঝি। টালির আটচালায় টিন চাপাই। শিবের মন্দিরের ভিত-গাঁথুনিটা সিমেন্ট করা হয়ে যাক। ময়না-অষ্টপ্রহরের কাণ্ডে কিছু জমুক। সাঁকোটা সারাই। তোমরা হাত উঁচু করো, আমরা তাহলে নীচু করি মাথা'টা।

ছোটবাবুর পক্ষ হেরে গেল। কিন্তু ছোটবাবুর কথাগুলো ফলল। যারা টাকার মোটা অঙ্কের লোভ দেখিয়েছিল, ভোটের পর সেই সব নেতারা নিখোঁজ। আটচালায় টিন চাপে নি। শিব মন্দিরের গাঁথনি সিমেন্ট করা হয় নি। ছত্রিশ বিঘের খোপে যাওয়ার ভাঙা নড়বড়ে সাঁকোটা মানুষের স্পর্শ পেলেই খিটখিটে মেজাজের মানুষের মত আজও খ্যাঁচ খ্যাঁচ করে।

ছোটবাবুর আরও অনেক কথাই ফলেছে। দুর্ভিক্ষের কথা, বন্যার কথা, চাষীদের জমি থেকে উচ্ছেদ হওয়ার কথা।

রজনী ছোটবাবুকে দূর থেকে শ্রদ্ধা করে আরও অনেকের মত।

হ্যাঁ গা ভূষণকা, তাহলে যাবার অর্থ টা কি ?

এখন চুপচাপ মেরে যাস ! কানাঘুষো হয় নি যেন।

না গো, কাউকে বলা-কওয়া করবো নি।

ছোটবাবু বলেন আইনের কথা।

কিসের আইন ?

বলেন, আইনের রাস্তা নিলে কারুর সাধ্যি নেই চাষীর স্বত্বে বাধা দেয়।

সরকার কি শুনবে ?

ছোটবাবু বলেন, আইনটাই ত সরকারী।

রজনী বোকা হয়ে যায়। বোকা বলেই সে সরকারী খাল-কাটানোর ম্যানেজারের সঙ্গে সরকারকে এক পংক্তিতে ফেলে একটা হাস্যকর হিসেব কষে। চাষীকে উচ্ছেদ করছে সরকারের লোক। আর উচ্ছেদটা বাতিল করার জন্যে আইন গড়েছে সরকার !

সত্যি ভূষণকা ?

ছোটবাবু কি মিথ্যে বললেন ? বললেন ত, যে আইনের লড়ায়ে আমাদের জয় সব জায়গায় নাকি হচ্ছে।

রজনী আর ভূষণ একটা বাঁকে এসে থামে। দুদিকের দুটো পথে দুজনকে আলাদা হয়ে যেতে হয়। যাবার আগে ভূষণ আরেকবার সাবধান করে দেয় রজনীকে। এখন যেন কারুর কাছে ভাঙিস নি কিছু।

না গ না। আমাকে বিশ্বাস কর না।

মাঝে মাঝে মেঘ দাঁতে দাঁত ঘষছে আকাশে। ঝাপটা বাতাসের ভয়ে গঙ্গা আদকের দোকানের ঝাঁপ বন্ধ। টিনের ঝাঁপের ছোট ছোট ফুটোয় আলোর রেখা ফুটেছে। ভেতরে চলেছে রিহার্সাল। মদন পাড়ুয়ের গলার আওয়াজ পেল রজনী। গলাটা ওর খাঁটি মেয়েলী। চোখ বুজিয়ে শুনলে মতিভ্রম হবেই। কিন্তু চেহারাটা কাটখোট্টা। মদনের গলা থেকে দ্রৌপদীর পার্ট কানে এল—

কে রক্ষিবে রমণীর মান
ছামী যদি হেন বিকার বিহীন?

যাবার সময় রজনী বাইরে থেকে জোরাল গলায় একটু ঠাট্টা করে—স্বামী বলরে মদ্না, স্বামী বল। ছামী নয়। বৌ-কে গিয়ে রাত্রে স্বামী বলে ডাকবি। রসিকতার অর্থ বুঝে দোকানের ভেতরে হাসির রোল ওঠে। কিন্তু দরজাটা ঠেলে রসিকটিকে দেখার জন্যে মুখ বাড়াবার আগেই রজনী অন্ধকারে এক হয়ে যায়।

ছয়

টোপা টোপা বৃষ্টিতে গা ভিজে গেছে। কাঁধের গামছা দিয়ে বার বার গা মুছতে মুছতে গামছাটাও স্যাঁতসেঁতে। চোখের কোণে, দাঁতে, জিভে ধুলো কিরকির করছে।

হাওয়ার তীব্র সাঁই সাঁই শব্দে রজনীর ডাকগুলো বোধ হয় শুনতে পায় নি চারু। দরজায় ধাক্কা শুনে দরজা খুলে রজনীকে দেখে সে অবাক হয়ে যায়। রজনীও কম অবাক হয় না চারুকে দেখে। একটা ময়লা শাড়ী পরে উঠোনে দাঁড়িয়ে প্রায় খালি গায়ে ভিজেছে সে। চারু বলে—কত তপস্যার পরে একদানা আধদানা বৃষ্টি এল, না ভিজে আর চলে গা। গা-হাত যেন জ্বলে-পুড়ে গেল ঘামাচির জ্বালায়।

রজনী একটা চৌকি টেনে দাওয়ায় বসে। চারু ভিজে কাপড় পালটে আসে। এমন ঝড়-বাদলে ঘর থেকে বেরিয়েছ! কি মানুষ বলতো তুমি? এত কিসের গরজ শুনি! বিজলী চমকাচ্ছে। বাজ গজরাচ্ছে। তবু তোমাকে দুর্যোগ মাথায় করে আসতে হবে কেন?

রজনী মৃদু হেসে বলে—তোমার মত ভয়-কাতুরে পেরাণ ত নয়। আমার ভাল লাগল তাই এলাম।

রজনী বলে—আমার মন-মেজাজটা ভাল নয়। কি হল বলতো আমার ? আমি কি গনৎকার, যে গুণে বলব তোমার মনে কার জন্তে কিসের কষ্ট। হয়তু সুখদার জন্তে মন কাঁদে ?

রজনী চারুর দিকে কটমটিয়ে তাকায়।

খবর্দার কিন্তু, তুমি উসব ঠাট্টা করবে নি। ভাল লাগে নি আমার, হ্যাঁ।

আমার ঠাট্টা ভাল না লাগতে পারে, সুখদার নামটা শুনতেও কি খারাপ লাগে নাকি তোমার ?

রজনীর গাম্ভীর্য দেখে চারু রসিকতা থামায়। একটু পরে সেও গম্ভীর হয়ে গিয়ে বলে—জান, সত্যি বলছি এবার তুমি বে'টা করে ফেল।

রজনী চারুর কাপড়ের পাড় ধরে মৃদু একটু টান দিয়ে বলে—তুমি বুঝি তাহলে খুব খুশি হও ?

কেন, খুশি না হবার কি আছে ?

তাহলে তোমাকে দেখবে কে ? তোমার জীবনটা একলা হয়ে যাবে নি ?

চারু রজনীর চিবুক ধরে আদর জানায় তার চিরাচরিত পদ্ধতিতে।

ওগো আমার দরদী গো। বলি তুমি কি বে' করাব পর একদম দেশান্তরী হয়ে যাবে ? নাকি বউয়ের আঁচলের খুঁটে বাঁধা হয়ে থাকবে রাতদিন ? একদিন দুদিনও কি মনে পড়বে নি অভাগিনীর কথা ?

বৃষ্টি থেমে এসেছে। ভিজে মাটির ভেতর থেকে বাতাসে ভাসছে একধরনের সোঁদা ও শীতল গন্ধ। দরজার বাইরে খালধারের দিকে ক্রমশ তীব্র হচ্ছে ব্যাঙের ডাক। উঁচু তালগাছের মাথায় ডানা ঝাপটে থেকে থেকে খড়খড় মড়মড় শব্দ তুলছে শালিক পাখীরা, যাদের বহু যত্নের নীড় হওয়ায় ভেঙে বৃষ্টিতে ভিজেছে। চারুর লাউ ভারার কোণে, যেখানটায় অল্প একটু ঝোপঝাড়, একটানা ঝিঁঝির ডাককে মনে হচ্ছিল কোন কোন মানুষের সারাজীবনের একটানা স্বস্তিহীন বিষাদের মত।

'অভাগিনী' কথাটা হাসি-মস্করার ছলেই বলেছিল চারু। কিন্তু ঝিঁঝির ডাক, ব্যাঙের ডাক, আকাশের অন্ধকার আর পৃথিবীর স্বাদহীন সোঁদা ও শীতল গন্ধের মিশ্রিত প্রভাবে রজনীর প্রাণে ঐ হাসি ঠাট্টার তুচ্ছ শব্দটি যেন কোন্ গভীর অর্থের ব্যঞ্জনায় ধ্বনিত হল।

চারু সত্যিই অভাগিনী! চারুর কথা ভাবতে গিয়ে ক্রমে শীতল পরামানিকের ওপর, মানুষের ভালবাসার ক্ষণস্থায়িত্বের ওপর, দীর্ঘ পাঁচ বছর চারুর সঙ্গে

নিজের অন্তরঙ্গতার ওপর চাপা ক্ষোভ গুমরে থাকল রজনীর মনে।

আর আমার ভাল লাগছে নি কিছু।

রজনী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

হাসির ছলে বলা কথার জবাবে রজনীর এমন বৈরাগ্য-ঘেঁষা জবাব দেখে চারু অবাক হয়।

সে কি গ, তোমার কি বনবাসে যাবার বাসনা হয়েছে নাকি? ছেলে-বয়সে এমন বুড়োটে জ্বালা-যন্ত্রণা কেন? সত্যি জান—দিনকে দিন তোমার মতি-গতি যেন কেমন খাপছাড়া হয়ে যাচ্ছে। কম-বয়সে বেশী-বয়সের চিন্তা তোমার মাথায় কেন ঢুকেছে বলতো এত? জীবনকে হেসে-খেলে ভোগ করার বয়সে এমন শুকনো মন-মরা হয়ে থাকো কেন?

চারুর মন্তব্যের বাড়াবাড়িতে রজনী বিরক্ত হয়। সে ভাবছে চারুর জীবনের সুখ-দুঃখের কথা। আর চারু করছে তাকেই ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ।

খানিকবাদে রজনী আচমকা প্রশ্ন করে—তোমার আত্মীয়-স্বজন কেউ নেই বিবি-বৌ?

চারু চমকে ওঠে প্রশ্নের ধরনে। ভাবতে চেষ্টা করে রজনীর ভাবনা-চিন্তার গতিকটা।

এত বছর বাদে রজনীর মুখে এমন প্রশ্ন কেন? মুখে স্বাভাবিক হাসির ছবিটা বজায় রেখেই চারু বলে,—এত বছর বাদে এ-সব খোঁজ-খবর কেন?

চারুর হাসিকে অগ্রাহ্য করেই রজনী আবার প্রশ্ন করে—বল না, আত্মীয়-স্বজন কেঁউ নেই তোমার?

চারু বলে—কেন, এই ত তুমি আছ।

ব'লে রজনীর হাত দুটোকে টেনে ধরবার চেষ্টা করে। রজনী চারুর আদরকে আমল দেয় না।

আমি কি ঠাট্টা করতেছি তোমার সঙ্গে? বলবে ত। কথাটার একটা জবাব দিতে পার নি।

চারু রজনীর মুখের কাটখোট্টা ভঙ্গী দেখে ঘাবড়ে যায়। ঘাবড়ে গিয়ে চারুর মেজাজটাও হয়ে ওঠে রগ্‌চটা।

আত্মীয়-স্বজন কেন থাকবে নি, আছে। সকলেই আছে। চল না আমাকে পৌঁছে দেবে সেখানে। আমি জানি গো জানি, সব জানি, তুমি কি চাইছ সব আমি জানি। বেশ তো, আমাকে পৌঁছে দেবে চল না যমালয়ে।

বলতে বলতে চারুর গলায় কান্না নামে। কান্নার আভাস পেয়ে সচকিত হয় রজনী। বুঝতে পারে চারুর কোন গোপন ক্ষতকে বুঝি খুঁচিয়ে দিয়েছে সে। পাঁচ বছর আগে চারু এসেছিল এই গ্রামে। মানুষের শরীরের রক্তমাংসের ক্ষুধাকে সাময়িক তৃপ্তি দেবার তাগিদে শহর-সমাজের এক অন্ধকারাচ্ছন্ন কোণে রক্তমাংসের মূলধন নিয়ে যে স্থায়ী ব্যবসাকেন্দ্র গড়ে উঠেছে, এসেছিল সেখান থেকে। তার জীবন বা জন্মের ইতিহাসও হয়ত আদি-অন্তহীন কোন এক অন্ধকারাচ্ছন্ন রহস্য দিয়ে আড়াল করা। চারুকে সে ইতিহাস স্মরণ করিয়ে দেওয়াটা তার সেরে যাওয়া ক্ষতে নতুন করে ব্যথা বাড়ানো বই কি!

রজনী চারুর হাত দুটো ধরে ফেলে।

বিবি-বৌ, আমার মতিভ্রম হয়েছে। নইলে এতদিন ধরে দেখছি কেউ কোনদিন তোমার খোঁজ-খবর নিতে আসে নি, অথচ তোমাকে কি বলতে কি জিজ্ঞেসা করে ফেলেছি। আমার উপর রাগ কোরো নি বিবি-বৌ। আমার মাথাটায় এমনি গণ্ডগোল হয়েছে গো আজকাল।

চারুর শরীরে তখনও কান্নার স্পন্দন লেগে ছিল। রজনী আরও নিবিড় হয়ে, আরও আবেগ-ভরা কণ্ঠে চারুকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করে। বলতে বলতে তোতলায় সে।

জান বিবি-বৌ, তোমার প্রাণে ব্যথা-কষ্ট দেবার জন্যে আমি উ কথা তুলি নি। আমি বলেছিনু এ ইজন্যে যে তোমার এখানে যে-ভাবে দিন কাটছে সেটা আমার প্রাণে বড় কষ্ট দেয়। তাই ভাবতেছিনু তোমার যদি আত্মীয়-স্বজন কেউ থাকত, গিয়ে সেখানে কাটিয়ে আসতে মাঝে-সাঝে। তোমার সুখ-দুঃখে ইখেনে মাথা ঘামাবে কে বল? বরং সকলেই তোমার শত্রু।

চারু বলে—কেন আমার কি এমন দুঃখ-কষ্ট দেখলে তুমি? আমি ত বেশ আছি।

রজনী কিছুক্ষণ বিমূঢ় হয়ে থাকে। মাথাটা তার ভোঁতা ও ভারী হয়ে উঠেছে রাশিকৃত কথার দাপাদাপিতে। অথচ সেগুলো ঠিকমত প্রকাশ করতে পারছে না সে।

রজনী আগেই লক্ষ্য করেছিল চারুর নিরাভরণ হাত দুটো। ঐ হাতের কব্জি দুটো একদিন সোনার গয়নায় ঝিলমিল করতো। নিজে রজনী ঐ গয়নার অর্ধেকেরও বেশী বিক্রি করেছে মহাজনের ঘরে। কিছু গেছে ছেলের অসুখে।

রজনী বলে—গয়না বিক্রি করে তুমি পেট চালাবে আর ভাগারীরা তোমার বিষয়-সম্পত্তি মেরে খাবে এইভাবে থাকাকে তুমি সুখের থাকা বল? আর দিনরাত ঐ খিটির-মিটির ঝগড়ার মধ্যে দিন কাটানো। তোমার ছেলেকে ওরা বৌ-ভাতার মিলে দিনরাত অভিসম্পাত দিবে, এতে ছেলের অমঙ্গল হবে নি। মনেই যদি না শান্তি রইল, টাকাই বল, বিষয়-সম্পত্তি বল, সে সব থাকলেও কি সুখের থাকা হল? আমারও মনে শান্তি নেই, জান বিবি-বৌ। আমার সংসারেও এত সব আছে, তবু যেন কুমু প্রাণীটির সঙ্গে কুমু প্রাণীটির যোগাযোগ নেই। যে-যার নিজের ধান্দায় বেঁচে আছে। আমি যদি তোমার মত একলা হতুম, যেতুম পালিয়ে কোনখানে। তুমিও গ্রাম ছেড়ে কোথাও চলে যাও বিবি-বৌ। এখনও গতর আছে। গতর খাটিয়ে খেলে দুটো মানুষের দু-বেলার খোরাকি জুটবে নি?

রজনী জলের বেগে কথাগুলো বলে যায়। আজ তার মনের ধরনটা একেবারে অন্য রকম। নইলে এতকথা, এমন গভীর ভাবনা-চিন্তার কথা, এমনকি নিজের মনের গোপন কষ্ট-বেদনার কথা কখনই সে এত স্পষ্ট করে প্রকাশ করে নি বা করতে পারে না।

চারুর যদি এটা প্রথম যৌবন হতো, যদি পাঁচ বছর আগের মত রজনীর প্রতি ভালবাসায় হাবুডুবু খাওয়ার পরিস্থিতিতে আজও আটকে থাকত সে, এবং যদি ইতিমধ্যে জীবনের বহু নগ্ন ও কদর্যকায় বাস্তবতা তার জীবনযাত্রায় প্রকাশ না পেত চারু হয়ত এখন রজনীর জবাবে অতি নাটকীয়ভাবে বলতে পারত—রজনী, এই পৃথিবীতে তোমার ভাগ্যে যদি কোন গাছের ছায়া জোটে, আমিও থাকবো সেইখানে, তোমার ছায়ায়।

কিন্তু পাঁচ বছর আগেকার সে চারু আর নেই। আজকের এই চারু যেন তার ছায়ামূর্তি। গ্রামের লোনা-লাগা দেওয়ালের মত অকাল-বার্ধক্যের লোনা ফুটে উঠেছে চারুর একদা-সুগঠিত শরীরে। এখন সে একটি শিশুর জননী। হোক সে শিশু শৈশব থেকেই রুগ্ন, কুৎসিত, বাক্‌শক্তিহীন, বিকৃত মাংসপিণ্ডের তালগোল পাকানো সমষ্টি মাত্র।

চারু উঠে দাঁড়ায়। গায়ে ভাল করে কাপড় জড়ায় না। ঘামাচিতে তার সর্বাঙ্গে কালশিটে ফুটেছে। ঠাণ্ডা হাওয়ায় ছাল-চামড়ার জ্বালা যদি জুড়োয়!

উঠে দাঁড়িয়ে বলে—বোসো, আমি আসছি।

চারু ফিরে আসে বড় কাঁসার বাটিতে মুড়ি আর কড়াই সেদ্ধ নিয়ে। খাবার দেখে

রজনীর মনে পড়ে যায় পদ্মর কথা। খেয়াল হয় পদ্মর ওপর তুচ্ছ কারণে রাগ করার ফলেই আজকে বেসামাল হয়ে উঠেছে তার মনের গতিকটা।

রজনীর পেটে খিদে ছিল। মুড়ির বাটিতে হাত দিয়ে বুঝতে পারে কড়াই সিদ্ধটা তার এখানে আসার কিছু আগে বানানো। চারু তার ময়নাকে কিছু খাবার দিয়ে আবার যথাস্থানে এসে বসে। রজনীর কথার অর্থের ভুল বুঝে কিছুক্ষণ আগে তার গলায় যে কান্নার স্বর ফুটেছিল, এখনও তার কিছু আভাস চোখে-মুখে লেগে রয়েছে। তবে এখন আর রজনীর ওপর তার ক্ষোভ নেই। রজনীর মত তারও মনটা বিস্বাদে তেতো হয়ে উঠছে। এমন একঘেয়ে নতুনত্বহীন বদ্ধ জলের শামুক-গুগলির মত দিন-কাটানোর প্রতি কোনদিনই মনের সায় ছিল না তার। চারু ভাবে রজনীকে মিছিমিছি আঘাত দেওয়ার ভুলটা সংশোধন করে নেওয়া যায় কি করে। চারু বলে—তুমি ত এত কথাই বললে। তাহলে আমিও দুটো কথা বলি।

রজনী সাগ্রহে বলে—বল না।

উ ভাসুর-ফাসুর পায়ে-পা তুলে কি ঝগড়া করে না করে ওদের কথা বাদ দাও। আমি মেয়েমানুষ, আমি কি যাব কোর্ট-আদালতে মামলা জুড়তে? ওদের যদি পরের সম্পত্তি, পরের গাছের ফল খেয়ে পরকালের পথ সুগম হয়ত হোক না। আমি আমার বেশ আছি। দু-বেলা দু-মুঠো যেমন জুটছে তেমন জুটলেই হল।

দু-বেলা দু-মুঠো কি জুটছে? ভাত? আজ ভাত রেঁধেছ?

ওমা, কেন রাঁধব নি। তুমি আসার একটু আগেই হেঁসেল থেকে বেরিছি।

কই দাও দেখি এক বাটি ভাত আমাকে। তুমি ভাত রেঁধেছ কড়াই সেদ্ধ দিয়ে খাবে বলে?

জান, আজকে সকাল থেকে শরীরটা খারাপ। সেইজন্যেই ভাত বসাই নি। অন্য দিন হয়।

দুজনেই দুজনের চোখের দিকে নীরবে তাকায়। তাকিয়ে হাসবার চেষ্টা করে। খাঁটি প্রাণের হাসি দিয়ে খাদ-মেশানো জীবনকে বিদ্রূপ করার হাসি।

আরও কিছুক্ষণ আজে-বাজে দু-দশটা কথা বলে রজনী চলে আসে। কিন্তু যে কথা রজনী বলবার জন্যে গিয়েছিল, তা সে শুরু করতে পারলে না।

রজনী চলে আসার সময় চারু তাকে কাদায় নেমে খালের গোড়া পর্যন্ত আলো দেখিয়ে গেল। মেঘে মেঘে ঠাসা আকাশের তলা দিয়ে, দূর থেকে ঝাপটা-মারা ভিজে বাতাসের গায়ে গা লাগিয়ে অন্ধকারে পা টিপে টিপে ঘরমুখো

হাঁটে রজনী। হাঁটার পথে আকস্মিকভাবে তার মনে এসে যায় খুব অল্পদিন আগের একটা ঘটনা।

যাদব মান্নার বৌ-এর সঙ্গে শশী রাউতের কেলেঙ্কারীর ঘটনা সেটা। শশী যাদবের বৌ সুরোকে গঙ্গাজল বলে ডাকত। অনেক দিনের সম্পর্ক। শশীর জমি আছে গ্রামের পেছনে চল্লিশ বিঘের খোপ পেরিয়ে শিবপুরের মাঠে। জমির সঙ্গে পুকুর। শশী একদিন তার গঙ্গাজলকে মাছের লোভ দেখিয়ে নিয়ে গেল সেই দূরের মাঠে। বললে—জল শুকনো। জাল আড়লেই মাছ। মাছ বেশ কিছু পেয়েছিল সুরো। মাছগুলো রেঁধে খেয়েওছিল। এমনকি দুজনে পাশাপাশি হেঁটে বাড়ীও এসেছিল। কিন্তু তার পর চীৎকার করে পাড়ার লোকের কাছে সুরো শশীর কেলেঙ্কারীর সব কথা ফাঁস করে দিলে। প্রবল একটা মারামারি খুনোখুনি হয়ে যেতে পারত সেদিন। হয় নি। রাগে কয়েকটা কব্জি শক্ত হতে গিয়েও নেতিয়ে পড়ল এই ভেবে যে শশী পান বিক্রির মোটা পয়সায় একবছরেই জমি কিনেছে চার বিঘে।

রজনী ভাবে শশী ও গঙ্গাজলের মত সরল হিসেবে কেন সুখ পায় না সে।

ঠাণ্ডা বাতাসের সঙ্গে অনেক দূরের মাঠ থেকে একটা গানের গলা ভেসে আসছিল ভাঙা-ভাঙা কান্নার মত সুরে। বাজারের বিড়ি-দোকানদার পরমা। গান-পাগলা মানুষ। যখনই রাস্তা দিয়ে হাঁটে গলা ছেড়ে গান হাঁকায়।

রজনীর চোখের সামনের গাঢ় অন্ধকার একটু পাতলা হয় গ্রামের ঈষৎ আলো-লাগা চওড়া পথে এসে। বৃষ্টি তখন বন্ধ। কেবল থেকে থেকে সমস্ত বিশ্বচরাচরকে কাঁপিয়ে তুলছিল একরকম আতঙ্ক-মেশানো বিদ্যুতের আলোর তীব্র নীল ঝলক।

সাত

ঝড়-বাদলের রাতে শুলেই ঘুম। আর ঘুমোলেই মরার মত অসাড়। ঠেলা মেরে না জাগালে রজনীর ঘুম কখন ভাঙতো কে জানে! সুরেনের ব্যস্ত-সমস্ত ডাকাডাকিতে ঘুম ভাঙে রজনীর।

হেই রজো, আরে তুই এখনো শুয়ে আছু? উঠবি নি। পৃথিবীর উপর দিয়ে প্রলয় বয়ে গেল যে ইদিকে। জগৎ-সংসারের কি দশা হয়েছে ত্যাখ। ভেঙে চুরে সব যেন ছনছিত্তির।

রজনী হাতের চেটোর উল্টো পিঠে চোখ দুটো ঘষতে ঘষতে বাইরে বেরিয়ে আসে। চোখের পিচুটি গামছার কোণা দিয়ে মুছে ভাল করে চারপাশে তাকাবার চেষ্টা করে।

আকাশ মেঘে আবছা। উঠোন-ভর্তি কাদায় চালের খড়-কুটো বাঁশ-বাখারি গেঁথে বসেছে। ঝোড়ো ঝাপটার গোঁৎকানি খেয়ে বড় চালাটা আর রান্নাঘরের ছাউনিটাকে পালক-ছেঁড়া মরা কাকের মত দেখাচ্ছে। দাওয়ার উপরেও জল। চালের ফুটো দিয়ে কড়িকাঠ আড়কাটা বেয়ে নীচে নেমেছে। দরজা পেরিয়ে পুকুর ঘাটের দিকে তাকাতে চোখে পড়ল লাউ-ভারাটা পড়ে গেছে। পেঁপে গাছগুলো শুধু ভাঙে নি, ছিটকে গিয়ে পড়েছে বেগুন-বাড়িতে। কি যেন একটা নরম হড়হড়ে জিনিসে পা পড়তে রজনী নীচু হয়ে তাকাল। ইস্—শালিকের ছানা।

সুরেন গোয়ালঘর পরিষ্কার করতে করতে ছুটে এসেছিল রজনীকে ডাকতে। আবার সে ফিরে গেছে নিজের কাজে। রজনী পদ্মকে জিজ্ঞেস করে—মেজদা কোথাকে গেল?

তিনি গেছেন গরু খুঁজতে। কাল সোন্ধে থেকে কালো হেলেটা ঘরে ফিরে নি। ভাসুরের মেজাজ গুম খেয়ে আছে।

রজনীর সাড়া পেয়ে সুভদ্রা ঘরের ভেতর থেকে হাঁক পাড়ে—অ রজনী, ই ঘর-সংসারের কি হবে রে বাবা। সাজানো গুছোনো সংসার যে ছন্নছাড়া করে দিলে। জান্নু রজো, আমি আজ একটু উঠি।

সুভদ্রা কদিন ধরে বাতের যন্ত্রণায় বিছানা নিয়েছে। ডাক্তারের কথামত তার ওঠা-বসা বারণ। রজনী ধমকানি দেয়—আচ্ছা, তুমি যেমন শুয়ে আছ তেমনি থাকতো। এতগুলো লোকে আমরা সব গুছিয়ে নিতে পারব।

তুই বড়-বৌকে ডেকে দে না আমার কাছে। একবার কেউ ঠাকুরঘরটায় গিয়ে দেখেছিল কি, কি দশা হয়েছে?

বড়-বৌ বীণাপাণি কথাটা শুনতে পেয়ে বলে—আগো মা, এই যে যাচ্ছি এখুনি। সিকে ছিঁড়ে গিয়ে রান্নাশালের হাঁড়ি সরাগুলো ভেঙে টুকরো টুকরো। বাটনা-পালিগুলো কাদা থেকে তুলে ঠিক করে গুছিয়ে বাসী কাপড়টা ছেড়ে তবে ত ঠাকুরঘরে ঢুকব।

রজনী গোয়ালঘরে গিয়ে সুরেনকে জিজ্ঞেস করে—কালো হেলেটা ঘরে ফিরে নি কাল থিকে?

সুরেন মাথা নেড়ে 'না' জানিয়ে মুড়ো ঝাঁটায় খসখস করে গোয়াল ঝাঁট দেয়।
রজনী বলে—আমি যাই। লাউ-ভারাটা তুলে ফেলি।
কোদাল, কাটারি আর এক নুথি কাতাদড়ি নিয়ে লাউভারা তোলার কাজে হাত লাগাবে লাগাবে করছে, এমন সময় খাল-কাটার ম্যানেজার গিরীশবাবুর ছোট ছেলে রজনীকে ডাকতে এল।
রজনীদা, তোমাকে বাবা ডাকছে। আমাদের 'জন' দিতে হবে আজ। আমাদের দুটো বরজই মাটিতে শুয়ে পড়েছে। তুমি তাহলে শিগগির এসো।
ম্যানেজার গিরীশবাবুর ছেলে পিছন ফিরে একটু এগোতেই রজনী বলে—দাঁড়াও গ দুগ্‌গোবাবু।
ভূষণ মল্লিকের ঘটনাটা দপ্‌ করে মনে জ্বলে উঠেছে রজনীর।
জানো দুগ্‌গোবাবু, আর কাউকে দেখ। আমাদের ঘর-সংসার একদম ছন-ছিত্তির। এসব গুছোতে-বাগাতে হবে।
সুরেন গোয়াল থেকে শুনতে পায় কথাটা। ঝাঁটা হাতে বেরিয়ে এসে বলে—কেন, তুই যা না। আমরা দুজন আছি। সব গুছি সুবোখন।
সুরেন ভাবে—একদিন কাজ করলে দেড়টা টাকা। এই নি-রোজগারের দিনে সেটা হাতছাড়া করা উচিত কখনো?
রজনী বলে—না গ না, আমি যাবো নি।
সুরেন এক কথা দু-বার বলে না। সে যে রাগ করল কি করল না তা বুঝতে না দিয়ে ভেতরে চলে যায়। রজনী লাউভারা তোলার কাজে লাগে।
হঠাৎ রজনী চমকে ওঠে রমণীর পাড়া মাথায়-করা চীৎকারে। সুরেন বেরিয়ে এল গোয়াল থেকে। ঘাটে স্নান করতে করতে আলগা গা-বুকে কোনমতে গামছা-কাপড় জড়িয়ে পদ্ম উঠে দাঁড়াল সিঁড়ির দু-থাক উপরে।
রমণী একা এসেছে, সঙ্গে গরু নেই।
শালাকে আজ জুতিয়ে লবেজান করে ফেলবো। বাড়িতে গিয়ে যে দেখা পেলুম নি।
রজনীও হাতের কাটারি মাটিতে ফেলে ছুটে আসে।
কি হল, হ্যাঁগা মেজদা?
সুরেন বলে—অত লাফাউ-ঝাপাউ কেন? কি ঘটেছে খোলসা করে কইবি ত।
ঘরের ভেতর থেকে সুভদ্রার চিন্‌চিনে স্বরটাও ছুটে আসে।
আরে কি হল রম্মা? কেন চেল্লাউ?

বাড়ির ছেলেগুলো ভোরবেলাই ছুটে গেছল পরের বাগানে কচি কাঁচা আম কুড়োতে। তারা ভয় পেয়ে শব্দ না করে ঘরে ঢুকে যায়।

রমণী গলা চড়িয়ে জবাব দেয়—কি ঘটবে আবার। যা চিরকাল ঘটে। কেউ কি তার স্বভাব-ধর্ম ছাড়বে।

কাকে নিয়ে প্রসঙ্গ তার হদিস না পেয়ে সকলের মুখে বিরক্তি গভীর রেখা আঁকে। ঘাটে দাঁড়িয়ে পদ্ম আপন মনে বলে—উ মানুষের অই ত মরণ! সাদা-সিধে কথায় আছে কি? শুধু পেঁচাল-পাড়া।

সুরেন বলে—তুই ত গেলু গরু খুঁজতে। এসে ত আগে খবর দিবি তার। তা নয় আসবার পথে বাধিয়ে এলি কার সঙ্গে কি গণ্ডগোল।

হ্যাঁ গ হ্যাঁ। অই গরুর কথাটাই হচ্ছে। তিনি খোঁড়ে আছেন।

খোঁড়ে? ঘাটে পদ্ম, গোয়াল ঘরের নীচে পেঁপেতলার ছাইগাদার পাশে সুরেন আর ঘাট থেকে ঘরে যাবার পথে দরজার কাছে গোবর নেদী দেওয়া দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়ানো রজনী, তিনজনেই একসাথে চমকে ওঠে।

খোঁড়ে? ঘ্যাঃ, খোঁড়ে দিবে কি? তুই ঠিক জানু? না খামখা মাথা গরম করতেছু?

রমণীর চ্যাটালো চোয়াল দুটো ফুলে ওঠে এবার—তাহলে আমাকে পাঠিছিলে কেন? যাও, নিজে দেখে-শুনে চোখের সন্দেহ ভঞ্জন করে এস।

রজনী জিজ্ঞেস করে—কে দিল তার নামটা জেনেছ ত?

কে দিবে আবার? যার যা কাজ। ঐ শালা প্রেভাত দিয়ে এসেছে। কাল সোন্‌ধে বেলায় মেঘলা আকাশ বাদলা বাতাসের সুযোগে খোঁড়ে গেছল গরু দিতে। শুধু আমাদেরটাই নয়। তেলিদের একটাকেও নিয়ে গেছে। কে খবরটা দিল জান? শালুকপাড়ার কেনায়েতের ভাই এনায়েৎ যে গরু ব্যবসা করে, সেই। সে তখন উদ্দিক থেকে আসছিল। গরু দেখেই চিনেছে।

রমণী ঘরের ভেতর চলে যেতেই সুরেন বলে—রজনী, তুই থালে যা বাবু, গরুটাকে ছাড়িয়ে নিয়ে আয় খোঁড় থিকে।

পদ্ম বলে—ঠাকুরপো, যাবে ত কিছু পেটে দিয়ে যাও।

রজনী বলে—অত সময় নেই খাবার। কোঁচড়ে দাও, খেতে খেতেই যাব। পিঁয়াজ থাকলে দিও ত মুড়ির সঙ্গে।

গোটা সংসারের ভেতর পদ্মর সঙ্গেই রজনীর প্রাণের যোগটা বেশি। পদ্মর শরীরটা সুগঠিত, রূপে যদিও একদম সাদাসিধে। সারা মুখটায় অন্যের জন্যে

মমতা আর নিজের জন্যে বিষাদের ভাবটা ফুটে থাকে সব সময়। বয়সের তুলনায় মনটা ছেলেমানুষী খামখেয়ালীপনায় ভর্তি। সংসারে সকলের কাছ থেকে তাই উঠতে-বসতে খোঁটা খেতে হয় তাকে। বড়-বৌ বীণাপাণি মস্ত গৃহিণী। যেন ঐ কাজের জন্যেই জন্ম হয়েছিল তার। কিন্তু পদ্ম মরবার আগের দিনেও গিন্নী হতে পারবে কি? তা না হোক, কিন্তু হে ভগবান, পদ্ম কি মরবার আগে একবারের জন্যেও সন্তানের মা হবে না?

বাজনানের বাঁক থেকে আড়াআড়ি শুকনো মাঠের ওপরে পায়ে পায়ে সিঁথিকাটা পথের ক্রোশটাক হেঁটে রজনী এসে গেল বড় সড়কের ধারে। বাঁধে উঠে যেতে হবে আরও আধক্রোশ। কিন্তু বাঁধে উঠে একটু এগোতেই রজনীর চোখে বিস্ময়কর ঠেকল একটা কিছু।

বিরাট বিস্তৃত দিগন্তের শেষ সীমায় আকাশ ঢলে পড়েছে মাটিতে। রোদে খনখন করছে নীলচে আভার আকাশ। তার নীচে মূর্ছার মত পড়ে আছে চৈত্র-বৈশাখের জীর্ণ অস্থিসার মাঠ। সেই মাঠের বুক ফুঁড়ে অদৃশ্য অপদেবতার শক্ত সিধে হাতের মত আকাশের দিকে উঠে গেছে, ওগুলো কি? হাতের ডগায় আছে সরু সরু আঙুল। আর সেই আঙুলে জড়ানো সরু পৈতের মত লম্বা সাদা সুতো। রজনী তাকিয়ে রইল অভিভূত হয়ে।

অন্যমনস্ক হয়ে দূরের দিকে চোখ রেখে চলতে গিয়ে সে একটা বড় সাজানো ইটের সারিতে ধাক্কা খায়। ইটগুলো সাজিয়ে রাখা হয়েছে রাস্তা মেরামতের জন্যে। রজনী খেয়াল করে নি।

আর একবার অন্যমনস্ক হতে গিয়ে রজনী একটা সাইকেল রিক্শার সঙ্গে ধাক্কা খাচ্ছিল। রিক্শওলা তাকে ভেংচি কেটে মুখখিস্তি করে জোরে হর্ন বাজিয়ে চলে গেল। রজনীরই গাঁয়ের লোক। দখিণ পাড়ার সুধীর পাড়ুই। চাষ-বাসের কাজ ছেড়ে কিছুদিন হল রিক্শওলা হয়েছে।

রজনী বুঝতে পারে এগুলো ইলেকট্রিকের তার। কলকাতা যাবার পথে রেল লাইনের ধারে এমনি দেখেছে সে। কিন্তু কলকাতা শহর থেকে ত্রিশ মাইল দূরের গ্রামের ধানের ক্ষেতে সেগুলো উঠে এল কেমন করে? একি তার চোখের বিভ্রম?

পথে একজন ভদ্রগোছের লোককে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করে—হ্যাগা বাবু, ই ইলেকট্রিকের তার কোথাকে যাবে?

মিলে।

মিলে যাবে। আজ্ঞে কোন্ মিলে ?
খাজুরবেড়ের মিলে ?
ই তারে কি হবে সেখানে ?
ভদ্রলোক রজনীর বোকামীতে এক ঝলক ঈষৎ বিরক্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে নেন। কি হবে আবার। মেশিন চলবে।
মেশিন চলবে ? খাজুরবেড়ে বাখুরী থেকে প্রায় দশ মাইল পথ। সেখানে আছে বিদ্যাধরী কটন মিল। সে মিল কাছ থেকে না দেখলেও রজনীর ধারণা আছে সেখানকার দৈত্য-দানবের মত মেশিনগুলো সম্পর্কে। এই সরু তারের ছোঁয়া লাগলেই বনবন করে ঘুরবে সেই সব মেশিনগুলো ?
ইলেকট্রিকের ব্যাপারে সব হয়। কলকাতার ট্রাম গাড়ির টিকিটাও ঐ রকম ইলেকট্রিকের তার ছুঁয়ে চলে। গাড়িতে ভিড়ে ভিড় কাণ্ড। তবু টলে না পড়ে না।
যদিও রজনীদের গ্রাম থেকে অনেকদূর দিয়ে বেঁকে কোণাকুণি চলে গেছে এই ইলেকট্রিক লাইন, তবু স্বস্তিতে বেশ ভারী করে দম নিতে ইচ্ছে করে রজনীর। তাদের অখ্যাত অজ্ঞাত পাড়াগাঁর ধান ক্ষেতের ওপর দিয়ে ইলেকট্রিকের তার গেছে, এটা কি কম বড়াই করার ব্যাপার।
কিন্তু একি ! কোথায় যেতে কোথায় এসে গেছে রজনী ? আরে এ যে চাল্‌তে পাড়ার খাল। মতিভ্রম দেখ। গফুর সেখের খোঁড় যে পেছনে রয়ে গেল।
গরু নিয়ে ঘরে ফেরবার পথে রজনী আর ইলেকট্রি:কর তারের দিকে তাকায় না। শুধু মনে মনে ভাবে অনেক কথা।
দেশ-গ্রামটা তার চোখের সামনে দিয়ে পাল্টে যাচ্ছে। এই বড় সড়কটা আগে ছিল কাঁচা মাটির। বর্ষা-বাদলের দিনে একহাঁটু কাদার দই। খরা-সুখোর দিনে ধুলোর ধোঁয়া। এখন হয়েছে ইট-বিছানো পাকা সড়ক। সাইকেল রিক্শার চলন শুরু হয়েছে। এখন দু-দশটা। এর পর আরও বাড়বে। বেকার বসে থাকা মানুষগুলো বেঁচে থাকার নতুন রাস্তা পেয়ে যাচ্ছে। আগে বাখুরীর বাজারটা ছিল শ্মশানের মত। এখন কত দোকান-দানিতে জমজমাট হয়ে উঠেছে। বাজারের মাটি গমগম করছে মেশিন-কলের শব্দে মানুষজনের চলাফেরায়। এর পর বাস চলবে, আলো জ্বলবে, পাকা রাস্তা কালো পিচে ঝকমকে হবে। একদিনের পথ চলে যাওয়া যাবে এক ঘণ্টায়। ঘরকুনো গাঁয়ের মানুষগুলো শহরমুখো হবে। ক্ষেতবাগিচার আনাজ এখন

হাটের পথে না গিয়ে স্টেশনমুখো চালান যায়। ধান ভানানো মেশিন-কল চালু হতে যে সব কটা-ভানারীরা বেকার হয়ে গেছে তারা এখন দল বেঁধে আনাজ ব্যবসা আর চালের চোরাকারবারীতে লেগেছে মনের ও দেহের ধর্ম বিসর্জন দিয়ে।

এত হচ্ছে, এত পাল্টে যাচ্ছে, তবু মানুষের মনের জ্বালা, চোখের কান্নাটি মুছবার নয়। রজনী কি পারে চারুর দেহটিকে আবার কীর্তনে গাওয়া রাধিকার মত ঢলঢল কাঁচা অঙ্গের লাবনীতে ভরিয়ে দিতে? চারুর পেট থেকে জন্মানো যে শিশুটির রক্তের নাড়িতে তারও রক্তের অংশ আছে, সেই বীভৎস, বিকৃত, বিকলাঙ্গ শিশুটিকে নিজের পিতৃস্নেহ দিয়ে ভালবাসতে? পদ্মর গা-ভরা যৌবন খানিকটা খসে-খসে ক্ষয়ে গিয়েও তার নারী জন্ম সার্থক হতে পারবে কি কোনদিন একটা শিশুর জননী হয়ে? ভূষণ কাকার কবিগান লেখার ক্ষমতা দিনকে দিন ভোতা হয়ে যাচ্ছে কেন? মানুষের মনের উৎসাহ উদ্যম শুকিয়ে-সিটিয়ে যাওয়ার কারণ কি? ছোটবাবুর কথাকে মিথ্যে করে দিয়ে পৃথিবী থেকে দুঃখ-দ্বন্দ্ব, মনের বৈরাগ্য, মানুষের অনাহার অন্নকষ্টের জীবন, দুর্ভিক্ষ মড়কের শোক-তাপ কোনদিন কি অদৃশ্য হবে না?

রজনী এমনি আরও যা সব ভাবে তা তার ভাববার বিষয় নয়। সামান্য চাষীর ঘরের ছেলের বিদ্যাবুদ্ধিহীন অনুর্বর মগজ পৃথিবীর মানুষের যন্ত্রণা ও যন্ত্রণা থেকে মুক্তি লাভের উপায় ইত্যাদি দার্শনিক চিন্তার পক্ষে উপযুক্ত জায়গা নয়। রজনীর চিন্তাগুলোও তাই স্বভাবতই হয়ে ওঠে সামাজিক অর্থ নৈতিক রাজনৈতিক ও নৈতিক সমস্যার এক কিম্ভুত-কিমাকার জগাখিচুড়ি। কিন্তু গ্রামের সাদামাঠা মগজেও মাঝে মাঝে বুদ্ধ-খৃষ্ট-চৈতন্যের সমকক্ষ মানুষদের মত দার্শনিক চিন্তা-ভাবনার দর্শন মেলে। সে চিন্তা যুক্তি-তর্কের বিজ্ঞান-সম্মত ব্যাখ্যায় যতই অচল ও অসম্পূর্ণ হোক, সততা ও আন্তরিকতায় সমৃদ্ধ। তবে একটি পরিপূর্ণ বিশ্বব্যাপী সংকটের প্রতিচ্ছবি কি গ্রামবাসীর সাদা চোখে ও গ্রামের সাদামাঠা জীবনযাত্রার ভগ্নাংশ ও ভাঙনের মধ্যে কি ধরা পড়া সম্ভব?

সে যাই হোক রজনীর প্রশস্ত বক্ষপটের ভেতরে ঢাকা পড়া ছোট্ট হৃদয়টুকু নানা সময়ে নানারকমের অজানা ব্যথায় টনটন করে থাকে।

রজনী আজও তেমনি অনেক গুরুতর ভাবনা মনের মধ্যে নিয়ে ঘরমুখো হাঁটে। মাঝে মাঝে গরুটার বেচাল চলাকে সামলে নেবার জন্যে টাগরায় জিভ লাগিয়ে শব্দ তোলে—ট্যোক্ ট্যোক্।

বিকেলের দিকে রমণী আর প্রভাতের সঙ্গে বেশ জোর একটা হাতাহাতি মারামারি হয়ে গেল প্রভাতেরই ঘরের কাছে। প্রভাতের বৌ গলা ফাটিয়ে চীৎকার করে কেঁদে উঠতে পাড়ার লোকজন জমা হয়ে যায়। দু-তিন জনে মিলে রমণীকে টেনে-হিঁচড়ে ছাড়িয়ে না নিলে শেষ পর্যন্ত খুন-জখম হয়ে যেত হয়ত। প্রভাতের শরীরটাও মোটাসোটা। কিন্তু ভেতরটা লাউয়ের মত ঢসকা। কুমড়োর মত আঁটসাঁট নয়। অল্পসল্প রক্তপাত হল দুজনেরই। প্রভাতের একদিকের গালে রমণীর পাঁচটা আঙুলের দাগ ফুটে উঠেছে। রমণীর কপালের একদিকের কোণ কেটে গেছে খোলামকুচিতে।

প্রভাতের বৌ বিকেল পেরিয়ে সন্ধ্যে পর্যন্ত রমণীর চোদ্দপুরুষ তুলে গালাগালি করলে। গালাগালির মাঝখানে অভ্যাসবশত একবার সে বলে ফেলেছিল, জোড়া বেটার মাথা খা তুই, তোর গতরে পোকা পড়ুক, ইত্যাদি। তার পর যখন তার মনে পড়ল যে রমণীর জোড়া কেন একটাও বেটা নেই, তখন বলতে শুরু করলে—ওরে ও আঁটকুড়ো মিনসে, জন্ম জন্ম তোর যেন এই দশা হয়, এই দশা হয়।

সন্ধ্যেবেলা ঘরে ফিরে প্রভাত তার বৌ-এর একঘেয়ে চীৎকারে বিরক্ত হয়ে চুলের মুঠি ধরে দু-বার ঝাঁকুনি দিতে তবে প্রভাতের ঘরের আবহাওয়াটা জুড়োল একটু। গায়ের জ্বালা জুড়োল তারও অনেক পরে। রান্নাবান্না চুকিয়ে প্রভাতের বৌ গরম তেল দিয়ে গায়ে হাতে মালিশ করে দেওয়ার পর।

সুরেন কিছুই বলল না রমণীকে। এর আগে বহুবার বারণ করা সত্ত্বেও রমণী এই রকম ছুটকো-ছাটকা মারামারি প্রায়ই লাগিয়ে রাখে। সুভদ্রা বিছানায় শুয়ে একটু-আধটু কাঁদল কেবল। রমণীকে উদ্দেশ্য করে বললে—বাবা, আর কটা দিন একটু রক্ষে দে, মোর তো চোখ বুজোবার সময় হয়ে এল, তার পর লাঠালাঠি ফাটাফাটি যা খুশি করিস।

রমণী আর পদ্ম দুজনে একই রকম বিরক্তিতে গম্ভীর হয়ে রইল সারারাত। পদ্ম আর রমণী আলাদা আলাদা ভাবেই শোয়। রমণী ঘরের ভেতরে। পদ্ম কোনদিন উঠোনে, কোনদিন দাওয়ায়। গরম তার একদম সহ্য হয় না। ঘামাচিতে কুমিরের পিঠের মত হয়ে আছে সর্বাঙ্গ।

পদ্ম একা একা অনেকক্ষণ শুয়ে কাটাল। তার পর মনের মধ্যে ভারী একটা কষ্ট জাগল রমণীর জন্যে। তার উচিত ছিল শোবার আগে রমণীর গা হাত পা একটু টিপে দেওয়া। সদাসর্বদাই মারমুখো হয়ে থাকা স্বভাবটার জন্যে

মানুষটাকে কেউ পছন্দ করে না। কিন্তু পদ্ম ত তার বিয়ে করা বৌ। আর স্বপজনের মত তার কি উচিত শুধু রাগ অভিমান করা, মানুষটার শরীরে ব্যথা-যন্ত্রণা পাওয়ার দিনেও।

পদ্ম উঠে বসল। কিন্তু চোখ দিয়ে কয়েক ফোঁটা কান্না গড়ানোর জন্যে উঠে দাঁড়াতে পারল না সে। প্রভাতের বৌ-এর গালাগালিটা মনে পড়ল তার। রমণীকে দেওয়া শাপ-শাপান্ত তার জীবনেও ত লাগে। রমণীর আজীবন আঁটকুড়ো হয়ে থাকা মানেই তারও আজীবন মা না-হতে পারা। পদ্মর দায় পড়েছে তেমন স্বামীর সেবা করতে, দুনিয়ার লোকের শাপ-শাপান্ত কুড়িয়ে যে তার জীবনটা নিষ্ফলা করে রেখেছে।

মানুষকে মারতে পার, খুন-জখম করতে পার। কই দাও দেখি আমার পেটে একটা মানুষের জন্ম, তাহলে বুঝি তোমার মুরদটা।

পদ্ম ঘুমোবার আগে পর্যন্ত কাঁদল আর সারা জীবনের অভিযোগ দিয়ে স্বামীকে ঘৃণা করল।

আট

কয়েকদিন পরে বাখুরীর ওপর দিয়ে একটা মজার চাঞ্চল্য বয়ে গেল। ভর-দুপুর। সূর্যের যে আলো সকালে আশীর্বাদের মত উদয় হয় তখন সেই আলোই রুদ্রের প্রচণ্ড অভিশাপের মত গাছপালা, পশু-পাখী, দীঘি-পুকুর মানুষ-জনকে নিঃশেষে পুড়িয়ে মারার উপক্রম করছে। সেই দুপুরে গজা আদকের দোকানের ভেতর তাড়ির আসর জমেছিল। বাইরে থেকে ছেঁচা বাঁশের দরজা ও টিনের ঝাঁপগুলো বন্ধ-করা। দোকানের পিছন দিকের জানালাও বন্ধ। অন্য সময় এই জানালা দিয়ে যে হাওয়া আসে তার চলার পথে ঘোষেদের প্রকাণ্ড কলমিলতা জমানো পুকুরটা পড়ে বলেই হাওয়ার গায়ে খানিকটা শীতলতার আমেজ লাগে। এ-বছরের অতিরিক্ত গরমে সে আশা নিছক দিবাস্বপ্নের মত।

বাখুরী গাঁয়ের পূব দিকের শেষপ্রান্তে এবং পাশের গ্রাম শিবপুরের প্রান্তরেখার শুরুর ওপর দিয়ে যে বিরাট বড় রাস্তাটা চলে গেছে উত্তরে সাত মাইল দূরের স্টেশনের দিকে আর দক্ষিণে ত্রিশ মাইল দূরে গিয়ে পৌঁচেছে গঙ্গার পায়ে, সেই বড় রাস্তার যে কোন দিক দিয়ে এসে বাখুরীর বাজারে নামলে গ্রামের ভেতরে

আসার অনেক শাখা-প্রশাখার মত ছোট-বড় সোজা-বাঁকা পথ আছে। কিন্তু বাজার থেকে সিধে যদি কেউ গঙ্গা আদকের দোকানে পৌঁছতে চায়, তাকে সটান খালের বাঁধ ধরে এগিয়ে যেতে হবে।

সেদিন সেই দুপুরে খালের বাঁধ ধরে এক সন্ন্যাসী এসে হাজির হল গঙ্গা আদকের দোকানে।

সন্ন্যাসীর মতই দেখতে। মাথায় জট-পাকানো জটা। দীর্ঘ আয়ত রক্তাভ চোখের দৃষ্টি। গালে মুখে আগোছোলা গোঁফদাড়ি। আঙুলে বড় বড় নখ। শরীরের চামড়ায় খড়ি-ফোটা খসখসে ভাব। কিন্তু সাজ-পোষাকটা অন্য ধরনের। যুদ্ধের সময় মিলিটারীরা যে জামা পরত সেই খাঁকী রঙের জামা। গেরুয়া রঙের আলখাল্লার বদলে সাদা তালি দেওয়া কাপড়। কাঁধের ঝুলিটা ঠিক সন্ন্যাসীদের মত নয়। আজকালকার কাঁধে-ঝুলনো ব্যাগের মত। একটু মেলামেশার পর গঙ্গা আদক বুঝল খাঁকী পরা এই সন্ন্যাসীটি সত্যিই বড় অভিনব। গাঁজা-আফিমের মৌতাত নেই। তার বদলে চকচকে কৌটো থেকে সিগারেট ধরালে। চারমিনার। মুখের চেয়ে চোখের ইশারায় কথা বলে বেশী। কথা যেটুকু বলে তার মধ্যে অনেক ইংরেজী শব্দ এসে যায়। যেমন কাউকে থামতে বললে বলে—হল্ট। সরে যেতে বললে বলে—গো, গেট আউট। রুষ্টতা প্রকাশ করে—ব্লাডি, ড্যাম, ইত্যাদি শব্দ দিয়ে। গঙ্গা আদকেরা একটু যেন দূরত্ব রেখেই মেলামেশা করে সন্ন্যাসীর সঙ্গে।

দেখতে দেখতে সেই রোদে-পোড়া নিঃঝুম দুপুরের মধ্যেই খবর ছড়াল গঙ্গা আদকের দোকানে এক খাঁকী-সন্ন্যাসীর আবির্ভাব হয়েছে।

বিকেলের শুরু হতে না হতেই দোকানের সামনে আবালবৃদ্ধবনিতার এক বিরাট সমাবেশ ঘটে গেল। কেউ কোলে কচি শিশুকে এনেছে মাথায় খাঁকী সন্ন্যাসীর পায়ের ধুলো ছুঁইয়ে দিতে। কেউ এসেছে নিতান্ত দৈবানুগ্রহে বাখুরী গাঁয়ের এই বিস্তৃত ভূমিতলের যে ক্ষুদ্র স্থানটুকু তাঁর চরণ স্পর্শে ধন্য হয়েছে, সেই ধুলোর ওপরেই রোগগ্রস্ত রুগ্ন শিশুদের গড়িয়ে নিতে। মেয়েরা নানা জনে এসেছে নানা অভিপ্রায়ে। কেউ জানতে চায় তার বরাতে আর কটি ছেলেমেয়ে। কেউ জানতে চায় কি ওষুধে তার সন্তান রক্ষা বা গর্ভপাত নিবারণ করা সম্ভব। কেউ চায় এমন একটা মাদুলি যাতে অম্বল ও অজীর্ণের চিরস্থায়ী রোগটা নিরাময় হবে। কারু মাথার ব্যামো। এমন কোন দৈব-তেল আছে কিনা যাতে জীবনের আর পাঁচটা জ্বালা সইবার ক্ষমতার জন্যে মাথার জ্বালাটা কমিয়ে

ফেলা যায়। আবার অনেকের ইচ্ছে অন্যরকম। সন্ন্যাসীদের কত রকমের শিকড় বাকড় থাকে। একটু-আধটু চেয়ে-মেগে নিতে পারলে সাপ-খোপের ভয় ভূত-প্রেতের ভাবনায় বুকে বল মনে সাহস নিয়ে নিশ্চিন্ত থাকা যাবে।

দখিণ পাড়ার গজেন পরামানিকের বড় ছেলেটা ভারী ফচকে আর ডান-পিটে। সে ওসব 'সন্নেসী-ফন্নেসী'দের বুজরুকিতে বিশ্বাস করে না। সে বলে—দেখবে, ত দেখাচ্ছি। ও ব্যাটার এখানে শালগ্রাম শিলার মত জেঁকে জম্পেস হয়ে বসার ওষুধ দিচ্ছি। সব ক্যারদানি ধরা পড়ে যাবে, ছ্যাখ না, দেখাচ্ছি।

গজেন পরামানিকের স্ত্রী কপালে হাত ছুঁইয়ে বলে—ও কচি, তোর পায়ে পড়ি রে বাপ, শাপ-শাপান্তে মরবি।

কচি ঘর থেকে কোমরে গামছা বেঁধে বেরোয়।

গঙ্গা আদকের দোকানের সামনে এসেই মাথায় বুদ্ধিটা দেখা দেয়। ভোলা পরামানিকের বৌ কচির নিকট সম্পর্কের বৌদি। নিজের বৌ-এর চেয়ে কি কারণে যেন বৌদির প্রতি তার মনের সম্পর্ক একটু কেমন-কেমন। মেয়েদের ভিড়ের মধ্যে বৌদি সরস্বতীকে দেখতে পেয়ে সে তার হাত ধরে টেনে নিয়ে আসে হিড়হিড় করে। দোকানের ভেতরে ঢুকে গিয়ে দুজনে সন্ন্যাসীর পায়ের ধুলো নেয়। কচি বলে—বাবাঠাকুর, ইনি আমার ইস্ত্রী। এঁর ছেলেপিলে হয় নি কেন বলতে পারেন?

খাঁকী-সন্ন্যাসীর বোজা চোখ দুটো খুলে গিয়ে লাল ড্যাবডেবে দৃষ্টি বেরিয়ে পড়ে। যেন রোষকষায়িত লোচন।

তার পর ভয়ংকর গম্ভীর একটা শব্দের সঙ্গে হাতের ইশারায় কচিকে সরে যেতে বলে সরস্বতীর কাছ থেকে। চারপাশের লোক এমনকি কচিও একটু ভড়কে যায়। কিছুক্ষণ চোখ বুজিয়ে থেকে খাঁকী-সন্ন্যাসী হাতের পাঁচটি আঙুলের তিনটি বুজিয়ে দুটি সিধে করে ধরে বলে—আই কামিং ফ্রম সেকেণ্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার। ফ্রম ব্যাটেলফিল্ড।

চারপাশে চাপা গুঞ্জনের শব্দ মুখর হয়ে ওঠে এই অত্যাশ্চর্য মন্ত্রবলের কেরামতি দেখে। সত্যিই ত ভোলা পরামানিকের দুটি ছেলে। একটা পেট থেকে খালাস হয়েই মরেছিল বটে, তবে সেটাকে ধর্তব্যের মধ্যে আনা কেন?

কয়েকদিন আগের আকস্মিক ঝড়ে ঘোষেদের উঁচু দোতলা বাড়ীর খড়ের

চাল উড়ে-ছিঁড়ে লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছল। সামনের প্রলয়মুখী বৈশাখের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যে পুরনো পচা ছাউনি ভেঙে নতুন খড়ের মেরামতি করছিল তাই ঘরামিরা। কাজের মধ্যে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ঢিলেমি দিয়ে তারা গঙ্গার দোকানের সামনে জড়ো হওয়া ভিড়টার দিকে তাকিয়ে গলা উঁচিয়ে নিজেদের মধ্যে রসের কথা কইছিল। ওদিকে ঘোষেদের বাগানের তালগাছ চাঁচতে উঠেছিল নব মাইতি। সে গাছ থেকেই হেঁড়ে গলায় গান ধরে কি যেন একটা। ওদের রকম-সকম দেখে বোঝা যায় না মন-প্রাণের এই হঠাৎ জাগা উল্লাসটা কি? গ্রামে অলৌকিক ক্ষমতাশালী এক সন্ন্যাসীর আবির্ভাবের জন্যে না একসঙ্গে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসা এতগুলি মেয়েমানুষের জটলা দেখে।

দখিণ পাড়া ডিঙিয়ে উত্তর পাড়ায় প্রায় হাওয়ার বেগে ছড়িয়ে পড়ে ঘটনাটা। তবে দখিণ পাড়ার মত তারা অত তাড়াতাড়ি পৌঁছতে পারে না।

সুভদ্রা তার চিঁচিঁ করা গলায় ডাক ছাড়ে—ও বড়-বৌ, বলি বড়-বৌ লো, মোদের সুরো-টুরো কেউ কি ঘরে ফিরল নি?

বড়-বৌ বলে—কেন গা, কিসের জন্যে।

ওমা, আমি এগবার যাবু নি গা সন্নেসীবাবার পায়ের ধুলোটা নিতে। মোকে দেখা দিতেই যে এসেছেন গো। আমি ত বলি, উ ডাকৃতার-বদ্যির ওষুধে রোগ সারবে নি আমার। সন্নেসী-ভগবানের চন্নামিত্তি খেলে আমি এখুনি সেরে উঠবো।

বড়-বৌ বিরক্ত হয়ে মুখ-ঝামটা দেয়।

না গো না, পুরুষমানুষরা কেউ ঘরে ফিরে নি এখনো। আমারই হয়েছে জ্বালা-পোড়ার একশেষ।

বড়-বৌ-এর শেষ শ্লেষোক্তিটি কিন্তু সুভদ্রার উদ্দেশ্যে নয়। পদ্মর প্রতি। পদ্ম সন্ন্যাসীর খবর শোনা থেকে ছটফট করছে একটা সঙ্গী পেলে পথে বেরোয়। অবশেষে সঙ্গীও যোগাড় হয়েছে। হুটপাট করে পুকুরের না-জুড়ানো গরম জলেই কোনমতে গা-টা ধুয়ে সে এখন শাড়ী পরছে।

বড়-বৌ-এর সবচেয়ে ছোট হ্যাংলা মেয়েটা পায়ে পায়ে ঘুরে নাকে কেঁদে বেড়াচ্ছিল। তার পিঠে ঢাই করে একটা চড় বসিয়ে দিয়ে বড়-বৌ যেন পদ্মকেই পরোক্ষে শাসন করে যাতে তার যাওয়াটা বন্ধ হয়। পদ্ম হ্যাংলা মেয়েটার চেঁচানি থামানোর জানা-কৌশল হিসেবে একটা বাটিতে আধ-মুঠো মুড়ি দিয়ে তার সামনে রাখে। কান্না থামে।

পদ্ম কপালে সিঁদুরের টিপ পরতে পরতে বলে—হ্যাঁগা বড়দি, তুমি এত রাগ করতেছ কেন? আমি যাব আর আসব। আমার কাজ তোমাকে করতে হবে নি। আমি ফিরে এসে বাটনা বাটবো।

বড়-বৌ বলে—তিকাল-সোন্ধে হতে চলল, ঘরে-দুয়ারে বাথুলে-দলিজে এখনও ঝাঁট পড়ল নি শাঁখ বাজল নি, মাচার গোড়ায় তুলসী তলায় ঠাকুরঘরে প্রদীপ দেখানো বাকী পড়ে রইল, আর তুই চললু ধেইধেই করে নাচতে নাচতে ভিন্ পাড়াতে ঢঙ দেখাতে। হায় হায় লো, ভগবান তোদেরই যত সুখের পেরাণ দিয়েছিল।

বড়-বৌ দীর্ঘশ্বাস, খেদ, ক্ষোভ, আর বিরক্তি মিশিয়ে যা বলে, পদ্ম অল্প অভিমান আর কিছুটা হাসি মিশিয়ে তার উত্তর দিতে দিতে প্রায় উঠোন পেরিয়ে যায়। হ্যাঁগা, গাছপালা থেকে এখনও রোদ নামল নি, এখুনি বুঝি সন্ধ্যে দেবার সময়টা এসে গেল।

গঙ্গা আদকের দোকানে মেয়েদের জটলার মধ্যে বহুদিন পরে পদ্মর সঙ্গে দেখা হয় চারুর। শুধু চারুর সঙ্গে নয়, যাদের সঙ্গে মনের যোগ ও মুখের খাতির আছে তাদের অনেকের সঙ্গে। সমাজে পুরুষের সঙ্গে পুরুষের মেলামেশার জন্যে রয়েছে মাঠ, ঘাট, বাজার-হাট, দোকান-দানি, বিচার-আচারের দরবার, মজলিস, মিটিং এমনি কত কি। কিন্তু মেয়েরা বৎসরে তেমন সুযোগ কতবারই বা পায়। তাদের পৃথিবী ঘরের কোণে, পুকুর-ঘাটে, বাঁশ-বনে, উঠন্ত সকাল আর পড়ন্ত বিকেলের 'টিউবওয়েলে'। তাই মেলামেশায় কোন সুযোগ পেলে প্রাণের সঞ্চিত আনন্দ-বেদনা নিয়ে তারা অস্থির হয়ে ওঠে।

চারু তার ছেলেকে নিয়ে এসেছিল। চারুর সেই রুগ্ন, রোগগ্রস্ত, বাক্শক্তিহীন মাংসপিণ্ডের মত শিশুটিকে কোলে তুলে নেয় পদ্ম।

এখনো বুঝি কথা ফুটল নি, না দিদি?

পদ্ম শিশুটির গালে চুমু খায়। মেয়েদের মধ্যে কেউ কেউ হাসে ঠোঁটের পাতা উল্টে, চোখের ভুরু বাঁকিয়ে। কেউ কেউ অস্পষ্টস্বরে বলে—আহা, উ সেই উ-পাড়ার রমণীর বাঁজা বৌটা নয়!

কিছুক্ষণ পরে পদ্মর কাছ থেকে শিশুটিকে নিয়ে চারু সন্ন্যাসীর সর্বরোগনাশা পায়ের ধুলো সংগ্রহ করার জন্যে পুরুষদের ভিড় ঠেলে দোকানের ভেতর ঢোকে। পদ্ম তার সঙ্গীদের সঙ্গে আনচান করে কি করে ভেতরে ঢুকবে, কি বলবে, কি চাইবে এইসব মহাভাবনার জালে জড়িয়ে।

একটি মেয়ে ফিরে এসে বলে—জান গা, অতগুনো মানুষ, অতগুনো চোখের সামনে যেন ভেলকিবাজি দেখালে। আমার হাতে একটু ধুলো দিয়ে বললে হাত মুঠো করতে। খুলতে বললে খুলে দেখি ওমা মায়ের প্রেসাদী ফুল। মেয়েরা চারদিক থেকে ভিড় করে আসে সেই ফুল দেখার জন্যে, কপালে স্পর্শ করতেও।

পদ্মর বরাতে ফুল-টুল বা শিকড়-বাকড় কিছুই জোটে না। সে একমুঠো ধুলোয় খাঁকী-সন্ন্যাসীর পায়ের ধুলো ছুঁইয়ে ঘরে নিয়ে আসে। শাশুড়ী সুভদ্রা ও বড়-বৌ বীণাপাণির ছোট্ট পেট-রোগা মেয়েটার কথা ভেবে বেশী করেই ধুলো নেয়। সন্ন্যাসীর পায়ে হাত ছোঁয়াবার সময় সে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করেছিল—ভগবান, মোর নারী জনমটা কি ব্যর্থ হয়ে যাবে! পেটে মোর একটি সন্তান দাও না প্রভু।

ঘরে ফিরে এলে রজনী পদ্মকে ঠাট্টা করে—ধুলো খেলে কি পেটে ছেলে আসবে মেজকী।

পদ্ম গুরুগম্ভীর স্বরে ধমক দেয়।

তুমি ফুট কেটনি তো, তুমি ভারী অবিশ্বাসী। উদিকে যে তোমার তিনির সাথে দেখা হল। তাকে গিয়ে বোঝাও না।

রজনী পদ্মকে আর ঘাঁটায় না।

এদিকে উত্তর পাড়ার ভদ্র পরিবারেও চাপা সোরগোল পড়েছে খাঁকী-সন্ন্যাসীকে দর্শনের আকাঙ্ক্ষায়। কিন্তু তাই বলে ত আর চাষাদের পাড়ায় তেড়েল-মাতালের দোকানে ভদ্রঘরের বৌ-ঝিকে পাঠানো যায় না। এসব জেনেও গোসাঁইদের আঙুর শাড়ী পরে তৈরী। আঙুর একা নয়। আঙুরের সঙ্গী হয়েছে চক্রবর্তীদের দুটি আর মিশ্রদের একটি মেয়ে।

আঙুরের বাবা বড় গোসাঁই এসব শুনে আঙুরকে এমন দাবড়ী হাঁকান যে ঘরের ভেতরে গিয়ে চোখের জলে সদ্য পাট ভাঙা শাড়ী আর ব্লাউজের খানিকটা ভিজিয়ে ফেলে সে।

ঘন অমাবস্যার রাত্রির সংকেত নিয়ে সন্ধ্যের পাতলা অন্ধকার নেমে আসার ফলে সন্ন্যাসী-পর্বের ওপর যবনিকা পড়ে সেদিনের মত। আজ যারা তাঁকে দর্শন করার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হল, তারা আগামী কালের কথা ভেবে সান্ত্বনা দিল মনকে।

কিন্তু পরের দিন সকালটা কোনমতে শুরু হয়েছে কি হয় নি গ্রামের এক প্রান্ত

থেকে অন্য প্রান্তে খবর ছড়িয়ে পড়ল—সন্ন্যাসী উধাও। যারা তাঁকে দর্শন করতে পারে নি, তারা এই সংবাদে মর্মাহত হল অত্যধিক।

বিকেলের দিকে আবার সংবাদ এল অন্যরকম। বাখুরী থেকে মাইল চারেক দক্ষিণে ফুলগাছিয়া গ্রাম। কাল ঐ খাঁকী-সন্ন্যাসীকে চিনতে পারা যায় নি। আজ দিগ্বিদিকে খবর ছড়াল, সন্ন্যাসী হল ফুলগাছিয়ার হাজরা বংশের ছেলে। নাম ব্রজো অর্থাৎ ব্রজেন। মন্বন্তরের সময় হাজরা বংশটা ধ্বংস হয়ে গেল চোখের সামনে। শহরে গেলে হয়ত বাঁচতো। কিন্তু আর পাঁচজনের মত কুল-মান-বংশের মর্যাদাকে ধুলোয় লুটিয়ে পথের ধুলোয় ভিক্ষাপাত্র হাতে নামতে পারল না বলেই লোপাট হয়ে গেল বংশটা। ব্রজেন একাই সেই সময়ে যুদ্ধে চলে গেছল সংসারের সঙ্গে ঝগড়া করে। যুদ্ধ থেমে যাওয়ার পরও ব্রজেন নাকি একবার-দুবার দেশের বাড়ীতে এসেছিল। খাঁকীর পোষাক পরা। হাতে রিস্টওয়াচ। মুখে সিগারেট। ওল্টানো চুল। পায়ে এমন চকচকে জুতো যাতে শরীরের ছায়া ফোটে। চোখে কালো চশমা। পকেটে মনিব্যাগ। সবাই বুঝেছিল যুদ্ধে গিয়ে একটা কিছু করে, কি করে তা অবশ্য কেউই জানতে পারে নি, প্রচুর পয়সা হাতে পেয়েছে ব্রজেন। সবাই ভেবেছিল এবার বুঝি বাপ-পিতামহের পোড়ো ভিটেয় নতুন সংসার গড়বে ব্রজেন। কিন্তু ব্রজেন একদিন একরাত্রি কুটুম্ব-বাড়ীতে কাটিয়ে আবার চলে গেল যে পথ দিয়ে এসেছিল সেই পথে। এতদিন পরে সেই ব্রজেন আবার ফিরে এসেছে। সন্ন্যাসী হয়ে।

শুনে গঙ্গা আদক বলে—ই যে ভারী মজা হল দেখি। সোলজার থেকে সন্নেসী।

ফুলগাছিয়া পদ্মর বাপের বাড়ীর গাঁয়ের গা-লাগোয়া গ্রাম। পদ্ম এই খবর শুনে খুশী হয়। ভাবে বাপের বাড়ী গিয়ে সন্ন্যাসীর কাছে আরও ভাল করে হাত দেখাবে একবার।

খবর শুনে আঙুরের রাগ পড়ে বাপের ওপর থেকে। কিন্তু সেই সঙ্গে বায়না ধরে অন্য এক জায়গায় যাওয়ার। অন্য জায়গাটি হল সিনেমা। বাখুরী থেকে তিন মাইল দূরে নতুন সিনেমা হল বসেছে। গোসাঁইদের পাশের ঘর চক্রবর্তীদের মেয়েরা কয়েকবার রিক্শায় করে দেখে এসেছে। আবদার শুনে আর রাগ দেখান না বড় গোসাঁই। গতকাল বিবাহযোগ্যা মেয়েটাকে অন্যায় শাসন করে বগায় প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ আজকে তাকে বাইরে বেরুবার অনুমতি

দিলেন তিনি। আঙুর কিন্তু একা সিনেমায় যায় না। সঙ্গে থাকে মাধুরী। মাত্র কিছুদিন হল সে বাপের বাড়ী কলকাতা শহর থেকে গ্রামে এসেছে। মাধুরীর সিনেমায় যাওয়ার ইচ্ছে ছিল না। তার শ্বশুর জোর করে পাঠালেন। বড় গোসাঁই ভেবেছিলেন শহরের মেয়ে যখন তখন নিশ্চয়ই মাঝে মাঝে সিনেমা-থিয়েটার দেখাটা সকাল-সন্ধ্যের চা খাওয়ার মত একটা নিয়মিত অভ্যাসের জিনিস। মাধুরীকে নিজের পুত্রবধূ হিসেবে কাছে-টানা ভালবাসার চেয়ে সাধনের বৌ আর শহরের মেয়ে হিসেবেই তিনি বেশ খানিকটা দূরত্ব-রাখা স্নেহ-ভালবাসার কর্তব্য পালন করে চলেন। তার কারণ সাধন আর মাধুরীর বিয়েটা হয় বাপ-মায়ের অমতে ও অনুমতি ছাড়াই। মাধুরী চেয়েছিল আগে রেজিস্ট্রি করে নিয়ে পরে সামাজিক উৎসব ও অনুষ্ঠান ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে বিয়েটাকে সামাজিক স্বীকৃতি দিতে। মাধুরীর পূর্বপুরুষেরা এক সময়ে কলকাতা শহরের এক নামজাদা বংশ ছিল। দুটো যুদ্ধ আর যুদ্ধ পরবর্তী-কালের অনিবার্য সামাজিক ভাঙন তাদের সেই বিরাট একান্নবর্তী পরিবারের ঐশ্বর্য ও আভিজাত্যকে ভাঙতে ভাঙাতে আজ প্রাসাদ থেকে ভাড়াটে কুঠরিতে নামিয়ে এনেছে। মাধুরীর বাবা ছিলেন বড় সরকারী চাকুরে। প্রথম কন্যার বিয়ের সময়ে গায়ে-হলুদের জিনিস-পত্র কিনতে গিয়ে গাড়ী চাপা পড়ে মারা যান। মাধুরীর দু-ভাই। বড় ভাই চাকরি করে একটা ইলেকট্রিক ফ্যানের কারখানায়। ছোট ভাই কলেজের ছাত্র এখনও। আগে তুখোড় রাজনীতি করতো। এখন তার থেকে কিছুটা সময় বাঁচিয়ে করে একটা-দুটো টিউশনি। মাধুরী আই. এ পড়তে পড়তে সাধনকে বিয়ে করতে চাইল।

সাধন মনের ভেতরে খুব বিরক্ত হয়েছিল মাধুরীর রেজিস্ট্রি করার প্রস্তাবে। তার চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল বাবা অবিনাশ, মা সত্যবতী, কাকা হরিদাস ও আরও অনেক আত্মীয়-পরিজনের জোড়া জোড়া ক্ষুব্ধ, রুষ্ট, শানিত চোখের দৃষ্টি। শেষ পর্যন্ত সাধনের সামন্ততান্ত্রিক অভিমানের কাছে হার মানল মাধুরীর গণতান্ত্রিক চেতনা, বিশ্বাস ও আদর্শের সংমিশ্রণে গড়া অভিনব অভিলাষ। বিয়ের ব্যাপারে সাধনের এই স্বেচ্ছাচারে, সাধনের বাপ-কাকা বা মা-কাকীমা প্রথম দিকে যতই বিরুদ্ধাচারণ করে থাকুক, শেষ পর্যন্ত তাঁদের সম্মতিদানে বাধ্য হতে হয়েছে নানা কারণে।

তার মধ্যে সবচেয়ে বড় কারণটা হল এত পয়সা-কড়ি খসিয়ে তদবির-তদারক করে মাস পিছু ষাট টাকা মেস খরচা চালিয়ে যে ছেলেকে আজ দেড়শো

পৌনে দুশো টাকার সরকারী কেরানী তৈরি করা হল, তার রোজগার থেকে বঞ্চিত হতে হবে সংসারকে। মনের জ্বালার চেয়ে পেটের জ্বালার মূল্য আধুনিককালে অনেক বেশী কিনা!

অবশ্য গ্রামের কোন কোন লোকের মুখে সাধনের বংশ, ধর্ম ও সমাজের বিরুদ্ধে বিয়ে করার মারাত্মক অনাচারের সমালোচনা শুনলে সাধনের কাকা হরিদাস বলে—তবে দিনকাল যা পড়েছে, সত্যি কথা বলতে কি, এইসব দরকারও হয়ে পড়েছে। ছেলেপুলেরা মানুষ হয় কার কাছে? মায়ের শিক্ষা-দীক্ষাতেই মানুষ হয়। আমাদের সমাজের বৌ-ঝিগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখো, তাহলেই বুঝতে পারবে আজকালকার ছেলেপুলেগুলোর অকালে ডেপো হয়ে যাওয়ার কারণ কি? তার পর ধর একা স্বামীর রোজগারে যে সংসার চলে না, মেয়েরা বৌয়েরা যদি সেখানে একটা চাকরি-বাকরি করতে পারে, সংসারের মানুষগুলো খেয়ে-ঘুমিয়ে বাঁচে। বুঝলে হে, মেয়েদের লেখাপড়া শেখাটা দরকার হয়ে পড়েছে। যেমন দিনকাল তেমন ত চলতে হবে।

সাধনের বাবা অবিনাশ চিরকালের গোঁড়া, ধর্মভীরু মানুষ। মনের খেদ মনে লুকিয়ে তিনিও ছেলের পক্ষে বলেন—যাই বল, সাধন একটা কাজের মত কাজ করে দেখাল। এত ত লেখাপড়া জানা ছেলে আছে আমাদের সমাজ-শ্রেণীতে, কই বর-পণ না দিয়ে কুন ছেলেটা বিয়ে করেছে বল দেখি? বর-পণ আবার কি? বর কি গরু-ভেড়া, যে দর-দস্তুর করে তাকে কিনতে হবে।

যারা শোনে তারা মুখ ও মাথা নেড়ে সমর্থন জানালেও মনে মনে খুঁটিয়ে সমালোচনা করে। বর-পণের টাকার হিসেব নিয়েই দু-মাস আগে তুমি বাপু সাধনের সঙ্গে হাড়ি-কিচকিচি করেছ, আর আজ একদম ভারী সাধু পুরুষটি সেজে গেলে। মাথার উপরে বিয়ের যুগ্যি ডাগর-ডোগর মেয়েটা কিনা, তাই এখন ভোল পাল্টে অন্য বোল শুরু করেছ, যদি বিনা পণের বর জুটিয়ে মেয়েটাকে উদ্ধার করা যায়।

সিনেমার ছবিটা মাধুরীর একদম ভাল লাগে নি। গোড়া থেকেই গা ঘিনঘিন করছিল। ছাত্রী-জীবনে ছায়াছবি সে খুব অল্পই দেখেছে। যা দেখেছে তার মধ্যে অধিকাংশই ইংরেজী ছবি। তবে মাধুরীর এইটুকু জানা ছিল যে এই ছবির অভিনেতা-অভিনেত্রী দুটির নামে বাংলাদেশে আজকাল প্রবল চাঞ্চল্য ও রোমাঞ্চ জেগে উঠেছে। মাধুরীর নিজেকে খানিকটা সস্তা, খেলো, রুচি-জ্ঞানহীন মেয়ে বলে মনে হয়।

আঙুর কিন্তু আগাগোড়া ছবিটি উপভোগ করে পরম আগ্রহ ও উৎসাহে। তার চোখে মুখে ঘনিয়ে ওঠে এক উজ্জ্বল উচ্ছলতা। ছায়াছবির কৃত্রিম আনন্দ-বেদনা ও বিরহ মিলনের জগৎ থেকে সে যেন খুঁজে পেয়েছে জীবনের অনেক অজানা বৈচিত্র্যের বন্ধ দরজার চাবিকাটিটা।

ভুতু শো-ভাঙার শেষে দেখতে পায় মাধুরী আর আঙুরকে। হাতের সিগারেটে শেষ কয়টা টান দিয়ে সাইকেল হাতে ওদের রিকৃশার পাশে এসে দাঁড়ায় সে। আঙুরের দিকে তাকিয়ে বলে—মাসী, সিনেমায় এসেছিলে তোমরা?

মাধুরী ও আঙুর দুজনেই সিগারেটের গন্ধ পায়।

ভুতু মাধুরীর দিকে তাকিয়ে হাসে। কিন্তু মাধুরীকে প্রণাম করে না। বিয়ের রাত্রে গুরুজনদের সামনে পড়ে গিয়েছিল বলে করেছিল একবার। মাধুরী ভুতুর মামী হয়।

আঙুরদের সাইকেল রিকৃশাটা সকলের পিছনে পড়ে গেছে। সামনের রাস্তাটা বড় সরু। তাই কথা বলার সুযোগ জোটে কিছুক্ষণ। ভুতু জিজ্ঞাসা করে—তুমি এর আগের ছবিটা দেখেছ টুনু মাসী।

না।

ইস্, যা মিস্ করলে। শুধু লাস্ট সীনে যদি শুক্লারানীর কান্নার দৃশ্যটা দেখতে দাম উঠে যেত। আর ঐ ছবিতেই প্রথম নেচেছে শুক্লারানী। আপনি দেখেছেন মামীমা?

না। তুমি বুঝি খুব সিনেমা দেখ।

না, না, সব ছবি দেখি না। যে ছবিতে অভয়কুমার আর শুক্লারানী নামে সেইগুলোই বেশী দেখি। তা ছাড়া ওদের ছবিতে প্লে-ব্যাকে কারা গান গায় জানেন তো? বোম্বায়ের এ, সাহানী। আর বাংলার স্নিগ্ধা বন্দ্যোপাধ্যায়, এখন আর বন্দ্যোপাধ্যায় নন। স্নিগ্ধা ভাদুড়ী। বিখ্যাত ডিরেক্টার নির্মল ভাদুড়ীর সঙ্গে গত বছর বিয়ে হয়ে গেল। স্নিগ্ধা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখেছেন আপনি?

কোথায় দেখব বল?

ভুতু ভাবে, হয় নতুন মামী তার সঙ্গে রসিকতা করছে। নইলে বুঝতে হবে নতুন মামীটার প্রাণের মধ্যে রস-কষের গন্ধটুকুও নেই।

আঙুর ব্যগ্র হয় স্নিগ্ধা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবিটা দেখার জন্যে।

আছে নাকি রে তোর কাছে? দিস্ তো আমাকে।

ভুতু বলে—কাল দেবো। এখন নেই। আমার এক বন্ধু একটা সিনেমা কাগজের গ্রাহক। তার কাছে আছে।
সামনের সরু রাস্তা পেরিয়ে রিক্‌শাগুলো একে একে বড় রাস্তায় গিয়ে পৌঁছলে আঙুরদের রিক্‌শাটাও চলতে শুরু করে। ভুতু তার সাইকেল ধরে দাঁড়িয়ে থাকে। আঙুর পিছন ফিরে তাকায়। তাকিয়ে একটুখানি হাসে। পাকা রাস্তার দু-ধারে নতুন বানানো দোকান-পাটের আলো-জ্বালা এলাকাটুকু পেরিয়ে গিয়ে আঙুর যদি হাসতো, তাহলে সেটা এমন উপভোগ্য হয়ে ভুতুর মনে সাড়া জাগাতো কিনা সন্দেহ।
ভুতু তার আত্মীয়দের সঙ্গে কথা কইছে দেখে নৃপেন এতক্ষণ ধরে দূরে দাঁড়িয়েছিল। রিক্‌শা চলে যেতেই সে কাছে আসে ভুতুর। বলে—চ', চা খাই।
চা খেতে খেতে নৃপেন জিজ্ঞেস করে—ঐ তোর নতুন মামী, না ?
হ্যাঁ।
আচ্ছা, তুই লক্ষ্য করেছিস মুখের সঙ্গে তাপসী দত্তের মুখের অনেকটা মিল আছে না ? চোখ আর কপালটাতে। হুবহু মিলে যায়। তাই না ?
তাপসী দত্ত একজন নবাগতা চিত্রাভিনেত্রীর নাম। ভুতু সে কথার মৌখিক উত্তর না দিয়ে মুখে শুধু সামান্য হাসে। কিছুক্ষণ অন্যমনস্ক থেকে সে বলে—জানিস, আমার টুলু মাসীর জীবনে মাইরী অনেক পসিবিলিটি ছিল। এত কনজারভেটিভ ফ্যামিলি ওদের, মেয়েটাকে বাড়তে দিলে না রে। কবে বিয়ে হবে তার ঠিক নেই। ক্লাস সিক্স-এ পড়ছিল। আজ দু-বছর ঘরে বসিয়ে রেখেছে চুপচাপ।
গরম চায়ে সেঁতানো নিমকি ডুবিয়ে দুজনে চা খায়। আর ভুতু গভীর আবেগে তার টুলু মাসীর গল্প শোনায় নৃপেনকে।

নয়

শনিবার হলেই দুপুরের দিকে মকবুলের মা পেট-কোঁচড়ে হাসের ডিম নিয়ে ফেরি করতে বেরোয়। সেই সঙ্গে সুখ-দুঃখের গল্পও করে নেয় কিছুটা।
মাছের বাজার-দর এখন তেল-নুন-চাল-ডালের দামকে ছাড়িয়ে মোটামুটিভাবে সচ্ছল অবস্থার গৃহস্থদেরও ধরা-ছোঁয়ার বাইরে চলে গেছে। তবু সংসারের মানুষ সপ্তাহ-ভোর যাই খাক, যারা গতরে খেটে সংসারটা প্রতিপালন করছে তাদের

জন্যে সপ্তাহে একটা-দুটো দিন মুখ বদলাবার মত নতুন কিছু রান্নার প্রয়োজন হয় বই কি। মাছের বদলে কম দামে মাছ না খেতে পাওয়ার খেদ মেটাতে পারে তিন-আনা জোড়া ডিম। তাও মকবুলের মা ঘরে যেচে দিয়ে যায় বলেই তিন আনা। বাজারে একটা দু-আনার কমে বিক্রি নেই।

মকবুলের মা চক্রবর্তীদের বাড়ীতে চারটে ডিম বিক্রি করে গোসাঁইদের বাড়ীর দরজায় এসে গলার সাড়া দিল। আঙুরের কাকীমা রাতের রান্নার জন্যে হলুদ বাটা থামিয়ে উঠে এল। মকবুলের মা'র ছায়াটা দরজার যেদিকের পাল্লায় লেপটে গেছে তার উল্টো দিকের পাল্লায় ঠেস দিয়ে কাকীমা বলে—ঘরে মাছের দানাটা পর্যন্ত নেই। আজ ছেলেটা ঘরে আসবে। তুই এসে ভাল করেছু চাচি। ডিম ক'টা আছে ?

তিনটে আছে গো মোটে। অদের দলিজেই যে চারটে নিয়ে নিল কিনা মা।

তিনটে ? তিনটে মোটে ? তিনটে কি হবে ? এতগুলো মানুষের পাতে বাঁটবো কি করে ?

গ্রামের মানুষের কথাবার্তা, চালচলন, অঙ্গভঙ্গী ইত্যাদিকে পর্যবেক্ষণ করার মধ্যে মাধুরী বেশ অভিজ্ঞতা লাভের আমোদ উপলব্ধি করে। সেও এসে দাঁড়িয়েছিল তার কাকীমার পেছনে। কাকীমা মকবুলের মাকে ফিরিয়ে দেবার সময় সে বললে—কাকীমা ডিমগুলো নিন না। আমি একটা অন্যরকমের রান্না করবো আজ।

বিয়ের উপহার হিসেবে পাওয়া গল্প-উপন্যাসের বই-এর সঙ্গে মাধুরী সচিত্র রন্ধন প্রণালীর বই-ও পেয়েছিল একটা। ডিমকে ভেজে মামলেট বানিয়ে তাকে আবার বরফির মত চৌকো চৌকো করে কেটে ঝোল তৈরি করার নতুন রকম একটা ফরমুলা তার চোখে পড়েছিল বলেই সে সাহস করে ঝুঁকিটা নিল। নতুন বৌ বলে এখন মাধুরীকে রান্না-বান্নার কাজে হাত লাগাতে দেয় না। মাধুরী নিজেই উৎসাহ দেখাল আজ। আজ সাধনের বাড়ী আসার দিন।

মকবুলের মা বামুন-পাড়ায় ডিম বেচার পয়সা নিয়ে চাষী-পাড়ায় তুঁষ-কুঁড়ো কিনতে বেরোয়। মান্নাদের বাড়ীতে দুটো ঢেঁকির কাজ হয়। তাই তুঁষ-কুঁড়ো অপর্যাপ্ত। মকবুলের মা নিশ্চিন্ত মনে চারপালি কুঁড়ো মাপিয়ে আঁচলের খুঁট থেকে পয়সা বের করে গুণে গুণে দামটা লম্বা দশাসই চেহারার মান্না-বৌ-এর হাতে তুলে দেয়। মান্না-বৌকে দেখে বোঝবার উপায় নেই যে পাঁচটি ছেলের মা সে। তাও ছেলে বলতে কোলে-কাঁখের ছেলে নয়। দুটো

জোয়ান ছেলের বিয়ে হয়ে গিয়ে তাদেরই ছেলেপুলের সংসার ভর্তি হতে চলেছে। এখনও মান্না-বৌকে দেখলে মনে হয় আরও দুটো-তিনটে ছেলে জন্ম দেওয়ার প্রয়োজন হলে তার উপযোগী জোর ও জৌলুষ জোগান দেওয়ার অসুবিধে ঘটবে না তার শরীরে।

পয়সা গুণে মান্না-বৌ বলে—আরও একআনা দিতে হবে।

মকবুলের মা ভুরুকে কপালে তুলে বলে—চার আনাই তো দিয়েছি। ভাল করে গুণে দেখ না।

চার আনায় কি হবে? পালি এখন পাঁচ পয়সা।

পাঁচ পয়সা কি গো? পরশু দিনে যে নিয়ে গেনু চার পয়সা করে।

তা বললে কি হবে। চালের দামটা কি রকম বাড়তেছে দেখেছ? ধান ভেনে কি থাকে? যা থাকে ঐ কুঁড়োতেই।

মকবুলের মা বলে—তবে রাখ বাবু। অন্যখেনে দেখি।

মকবুলের মা এ-বাড়ী ও-বাড়ী ঘুরে বুঝতে পারে দামটা হিসেব কষে এক সঙ্গেই বাড়িয়েছে সকলে। অনেক কষ্টে দু-পালি কুঁড়ো সে যোগাড় করল পুরনো দরে। বাকী দু-পালির খোঁজে হাজির হল সাঁতেদের বাড়ীর দরজায়।

পদ্ম উঠোনে ঝাঁট দিচ্ছিল কোলে বড়-বৌ বীণাপাণির পেটরোগা মেয়েটাকে নিয়ে।

কুঁড়ো হবে নাকি গো?

কুঁড়ো? দাঁড়াও, বড়দিকে জিজ্ঞেসা করি। ভিতরে এসো না।

বড়-বৌ বীণাপাণি রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে মকবুলের মাকে ঘাটের দিকে ডেকে নিয়ে যায়। বলে—কাউকে বোলো নি যেন। লুকি দুবো, লুকি নিয়ে যাবে। খুদ আছে এক পালি।

কত করে?

ছ'আনা করে দুবোখন। ভাল খুদ।

এক সের চালের দাম ন'আনা। তার জায়গায় ছ'আনা সেরের খুদ পাওয়াটা মকবুলের মায়ের কাছে যেন জলের দরে সোনা পাওয়ার মত খুশীর ব্যাপার হয়ে ওঠে।

বীণাপাণি ঘরের ভেতরে এলে পদ্ম ঘাটে যায়।

কি কথা হচ্ছিল গো?

কি কথা হবে মা। এই তোমাদের বড়-বৌ জিজ্ঞেসা করতেছিল মোর ছেলের

কথা। তাকে কদিন হল পুলিস আবার ধরে নিয়ে গেছে কিনা। ছেলে তো মোকে বাড়ী থিকে তেইড়ে দিয়েছে। সেখেদের গইলের পাশে মাথা গুজবার মত ডেরা বেঁধে থাকি মা, নিয়ত মন্দ।

তোমার ছেলে কি আবার ডাকাতি করতে গেছল। এইতো সে-মাসে, কি মাসে যেন, কাত্তিকে না অঘ্রানে ছাড়া পেল যেন জেল থেকে।

মকবুলের মা গলা ভারী করে বলে—অর নসীবে অপঘাতে মিত্যু আছে, দেখে নিও তোমরা পাঁচজন।

কম দামের খুদ পাওয়ার আনন্দেই যেন ডাকাত ছেলেটার জন্যে মায়া-মমতায় গলা ভারী করতে সাধ হয় মকবুলের মা'র।

বৌ-টার কি হবে ?

পদ্মর মনে পড়ে যায় তফুরনের মুখ। টিউবওয়েলে জল আনতে গিয়ে অনেক-বার দেখা হয়েছে, দুটো-একটা কথাও হয়েছে তার সঙ্গে। ধুলো-ময়লা জড়ানো হাতে পায়ের রূপোর গয়নার মত দুঃখ-কষ্টের ময়লা লাগা রুপোলী রঙের বৌটিকে বেশ লাগে পদ্মর।

তফুরনের কথায় মকবুলের মা বিকৃত মুখভঙ্গী করে।

উ ঘর-জ্বালানি, পাড়া-জ্বালানি ভাতার থাকীর কথা আর বল কেন মা। মোর মকবুল থাকে তো বছরে ছ'মাস জেলে, ছ'মাস জঙ্গলে। মাঠে দশরাত তো ঘরে একরাত। অথচ ফি বছরে এত ছেনা গজায় কোথা থেকে বলদিনি ?

বীণাপাণিকে আসতে দেখে পদ্ম ঘরের দিকে যায়।

কি জিজ্ঞেসা করছিল উ ?

না, সে-সব কিছু নয়। মোর ছেলে-বৌ-এর কথা।

বীণাপাণি কুঁড়োর পয়সা আলাদা রেখে দেয় সন্ধ্যের পর সুরেন জমির কাজ সেরে ঘরে ফিরলে হিসেব দেবে বলে। আর গোপনে বেচা খুদের পয়সাটা রেখে দেয় তার শোবার ঘরের তক্তপোশের নীচে পুরনো চাল, পুরনো তেঁতুল ইত্যাদির হাঁড়ি-কলসীর আড়ালে মরচে-ধরা একটা ছোট্ট বার্লির কৌটোর ভেতরে। আগেকার নানা গোপন পন্থায় জমানো পয়সাগুলোরও হিসেবটা মিলিয়ে নেয় সেই সঙ্গে।

বীণাপাণি আবার গর্ভবতী হয়েছে। এই সময়ে টক-ঝাল-নুন ইত্যাদি খাবারের প্রতি বেশ লালসা জাগে। বীণাপাণি ঠিক করে কাল কাউকে দিয়ে বাজার থেকে গরম আলুর চপ্ আনিয়ে পান্তাভাতের সঙ্গে খাবে। কিন্তু ইচ্ছার

ঘোরে পান্তাভাতের কথাটা ভেবে ফেললেও একটু পরে হিসেব কষতে গিয়ে বীণাপাণির মন-মেজাজটা পান্তাভাতের মতই ঠাণ্ডা জোলো-জোলো হয়ে যায়। চালের দামে আগুন লেগেছে। অর্ধেক দিন ভাতের ফ্যান দিয়ে ভাতের খিদে মেটাতে হচ্ছে মেয়েদের। পুরুষ মানুষগুলোকে প্রাণ-বাঁচানোর জন্যে দিনরাত গায়ে-গতরে খাটতে হয় বলে আগে তাদের পাতেই অন্ন যোগাতে হয়। সুরেন কি রজনী খেতে বসলে মাটিতে একটা ভাতের দানা পড়লেও খুঁটে খায়।
তাহলে ? বীণাপাণি মন থেকে পান্তাভাতের স্বাদটা ভুলবার চেষ্টা করে। খুদ বিক্রিটা কি তার তাহলে অন্যায় হল ? না, ওতো বালি, কাঁকর, তুঁষ-মেশানো পোকা-পড়া অনেকদিনের খুদ। ভাল করে চাখবার-চিনবার সুযোগ পেলে মকবুলের মা ওকে পাঁচআনা দামেও কিনতে চাইতো নাকি ?
সন্ধ্যের দিকে ঈশান কোণের আকাশে ক্রমশ ঝড়ের মেঘ ঘনায়। মেঘের মাটি কাঁপানো গর্জনে জলের চেয়ে ঝড়ের আভাসটাই বেশী মনে হয়। আর এখন জলের চেয়ে ঝড়কেই ভয় বেশী।
সুরেন মাঠ থেকে তাড়াতাড়ি ঘরে ফেরে গরুগুলোকে তাড়িয়ে। রমণী গেছে কেনায়েত সাহেবের নতুন কেনা জমিতে পুকুর কাটার জন খাটতে। আর রজনী দখিণ পাড়ায় পান বরজের কাজ করতে।
বাড়ী ফেরার পথে রজনী যখন খালের সাঁকো পার হচ্ছিল, খাল বেয়ে নন্দ আদকের মাল-বোঝাই নৌকোটা তখন এগোচ্ছিল বাজারের দিকে নন্দ রজনীকে দেখতে পেয়ে ডাকে। ডেকে জোর করেই নৌকোয় তুলে নেয়। নৌকো ভর্তি বড় বড় কেরাসিন তেলের টিন, নারকেল দড়ি, খোল আর বস্তা ভর্তি অন্যান্য মসলাপাতির পাঁচমিশেলী গন্ধের ঘ্রাণ নিতে বেশ লাগে রজনীর।
কার মাল এল ইগুলো ?
গোবিন্দ পধ্বানের।
গোবিন্দ প্রধানের দোকান আশপাশের মধ্যে সবচেয়ে জাঁকালো জমকালো। কেনাবেচারও যেমন সমারোহ, মাল-পত্রেরও তেমনি। লোক খাটে চার-পাঁচজন। প্রধানের দোকান থেকেই পাইকারী হারে মাল কিনে আশপাশের খুচরো দোকানদারেরা ব্যবসা করে। ইঁট-গাঁথা সিমেণ্ট করা দোকান। নিজেদের বসবাসের বাড়ীটাও পাকা।
রজনী বলে—আমাকে ডাকলু কেন নন্দ ?

নৌকোতে আমি একলা। আকাশে মেঘ ঘুটে এল দেখেই ডাকনু তোকে। ঝড়-ঝাপটা উঠলে একা যদি সামলাতে না পারি।

রজনী বলে—মাল তো আজ খুব বেশী নেই।

নন্দ বলে—কলকাতায় গণ্ডগোল চলতেছে। নইলে মালের ভারে জলে নৌকোয় সমান সমান হয়ে থাকত।

কলকাতায় কিসের গণ্ডগোল হচ্ছে?

কি সব স্টেরাইক-মেরাইক হচ্ছে। কেনাবেচা বন্ধ। হরতাল।

কিসের জন্যে হচ্ছে?

সে-সব জানি নাকি। উ-সব খপোরে কি হবে আমার।

নন্দর নির্দেশে রজনী তামাক সেজেছিল। রজনী কিছুক্ষণ টেনে নন্দকে দেয়। নন্দ তামাক খেতে থাকলে রজনী কিছুক্ষণ লগি ঠেলে। একটু পরেই নৌকোটা খালের শেষ প্রান্তে এসে থামলে নন্দ হুঁকো রেখে নোঙর ফেলে দিয়ে রাস্তায় নেমে যায়। পথচারী কোন চেনা-জানা লোকের মারফত খবর পাঠায় প্রধানের দোকানে। চার-পাঁচজন ঝাঁকা-মুটে ও ঠিকে মজুর এসে যায়। একটু বাদে ভূতের কুঁটি ওড়ানোর মত যেন চোখের পলকেই মালগুলো খালাস হয়ে গিয়ে খালি হয়ে যায় নৌকোটা। আকাশে তখন মেঘের গর্জনটা কমে গিয়ে বৃষ্টির লক্ষণ দেখা দিয়েছে। রজনীকে জোর করে বাজারে টেনে নিয়ে যায় নন্দ। আর তাদের চায়ের দোকানে গিয়ে বসবার কিছু পরেই বৃষ্টি নামে।

নন্দ জিজ্ঞেস করে—চা খাবি ত?

রজনী বলে—না, চা আমি খাই নি।

অথচ সত্যিই বেশ খিদে পেয়েছিল রজনীর।

কেন রে?

কেন আবার, খাই নি, খাবা ওভ্যেস নেই বলে। এক-আধদিন খেয়েছি ভূষণ কাকার বাড়ীতে। সে নুন-চা।

চায়ের চেয়ে একটা জিনিস খাবার ইচ্ছে হচ্ছিল রজনীর, যা সে কখনো খায় নি। একটা গোটা পাঁউরুটি খাওয়ার ইচ্ছে। সে কথা তো নন্দকে প্রকাশ করা যায় না। দু আনা পয়সা দাম।

নন্দ ও রজনীর ছোটখাট সংলাপটি কানে যায় দোকানের অন্য খদ্দেরদের। তাদেরই একজন চা খেতে খেতে বলে—উনি ঠিকই বলেছেন মাঝির পো। এক একজন মানুষের চা পছন্দ নয় একবারে। অনেকের আবার নেশায়

জিনিস। গাঁজা, আফিং, তামাকের মত। না খেলে হজম হবে নি পেটের ভাত।

নন্দ ফতুয়ার পকেট থেকে একটা চৌকো টিনের বাক্স বার করে দুটো বিড়ি নেয়। একটা দেয় রজনীকে। আর একটা নেয় নিজে। বাক্সটা পকেটে রাখতে গিয়ে আবার সেটা থেকে বার করে আর-একটা বিড়ি। সেটা বাড়িয়ে দেয় সামনের দড়ি পাকানো শরীরের দাড়িওলা এক বুড়োর দিকে।

বুড়োর নাম গহরালি। এককালে খুব নামকরা রাজমিস্ত্রী ছিল। এখন একেবারে বুড়ো অথর্ব অকেজো হয়ে পড়েছে, বুড়ো বয়সেই পয়সার লোভে কাজ করতে গিয়ে হাত-পা ভেঙে। নন্দ ছেলে-বয়েস থেকে দেখেছে তার বাবা অশ্বিনীর সঙ্গে গহরালির খুব ভাব-সাব।

বুড়ো গহরালি যে পোষাক পরে বসেছিল তা দেখলে অচেনা অজানা লোক মাত্রেই ভাববে লোকটা হয় পাগল, নয় লোকজনকে হাসিয়ে-জমিয়ে কোন কিছু বেচা-কেনা করার কৌশল হিসেবেই এমন কিম্ভূতকিমাকার পোষাকে সেজেছে। এর কোনটাই সত্যি নয়। গহরালির এক নাতি মেটিয়াবোরুজে দর্জিগিরি শেখে। পাতলা, মোটা নানা রকমের রঙিন কাপড়ের অজস্র টুকরোর জোড়াতালি দিয়ে বুড়ো দাদুর জন্যে পা-ঢাকাপড়া এই আলখাল্লাটা বানিয়ে দিয়েছে। হাত ভেঙে অকেজো হবার পর থেকে নিজের ছেলেরা গহরালিকে আর তেমন মান্যগণ্য করে না। দু-বেলা পেট-ভরাবার মত দু-মুঠো খেতে দেয় কেবল। বেঁচে থাকার অন্য উপকরণ গহরালি সংগ্রহ করে ভিক্ষের মারফত। হাত পেতে দোরে দোরে ভিক্ষে নয়। সৎ এবং শিষ্ট মুসলমান হিসেবে তাকে ভালবাসে শুধু আশপাশ নয় সারা থানার লোকজনই। তারাই সাহায্য চাইলে ভালবেসে সাধ্যমত দেয়।

বুড়ো গহরালি বিড়িটা ধরায়। ধরিয়ে কফে জড়ানো ভাঙা ভাঙা গলায় কাশতে কাশতে বলে—নেশা বল আর যাই বল ই-সব চা-টা বাবু আমাদের সময়ে ছিল নি। গতরে খাটার মানুষ। আধ-ধামাটাক মুড়ি দাও, গুড় দাও একবাটি, সেটা হবে জলখাবার। ঘরে ফিরলে জনাকে জনা সেরটাক চালের ভাত। পদ্মপুকুরের পাড়ে ছোটবাবুর যে হাওয়া-খেলানো বাড়ীটা উঠল তার ভিত গেঁথেছি কত হাত জান? পাঁচ হাত? সামনে পুকুর বলে মাটিটা নরম কিনা। ঐ ভিত না গাঁথলে অমন পেল্লায় বাড়ীটা আসমানের দিকে ঘাড় উঁচু করে দাঁড়াতে পারতো? তেমনি হল জোয়ান বয়সের খাওয়া। ঐ নোনতা বিস্কুট

আর চা খেয়ে উ শরীর তো দুদিনে নোনা ফুটে কাত হয়ে পড়বে। অথচ মোদের সময়ের চেয়ে তো কাঁচা টাকার রোজগার বেড়েছে অনেক। থালে শরীরটাকে কষ্ট দেওয়া কেন মিছেমিছি।

নন্দ বলে—মিস্ত্রী চাচা, রোজগার বেড়েছে, খরচটা কি তেমন বাড়ে নি। যারা চা খায়, তারা কি শখে পড়ে খায়, না পেটের জ্বালায় খায়।

গহরালি চটে ওঠে। বলে—আমি সেই কথাটাই বলতেছি গ। পেটের জ্বালাই যদি এত তাহলে শখ করে চার পয়সার চা খাবা কেন?

নন্দ মনে মনে কথাটার জবাব ভাবে, কিন্তু মুখে বলে না পাছে বাপের বয়সী বুড়ো মানুষটা রেগে অসন্তুষ্ট হয়। নন্দ যে জবাবটা ভেবেছিল প্রায় সেটাই বলে অন্য একজন গহরালির পাশ থেকে।

তুমি যেকালের কথা বলতেছ মিস্ত্রী চাচা, সে-সব দিনকাল আর পৃথিবীতে ফিরবে নি। সে-সব কালই গেছে আলাদা। আজকালকার মত ঘাসপাতা গু-মুত খেয়ে মানুষ বাঁচতো নাকি? কি বলবো গো দুঃখের কথা। মোর বাপ-ঠাকুর্দার আমলের আমড়া গাছ। তা মন্বন্তরের সময় পেটের দায়ে দিনু তো পুকুরটা বেচে চাটুজ্যে বাবুদের। তা বেচেছি বলে গাছের দুটো ফল পাড়ার আইন নেই গা? দুপুর বেলা ছেলেটাকে দুমদুমিয়ে কিলিয়ে-চড়িয়ে আমড়াগুলো কেড়ে নিয়ে তবে তাঁদের স্বস্তি হল। হায়রে দিনকাল!

ইতিমধ্যে ঝমঝম করে বৃষ্টি নেমেছে। ধুলোর দানার মত বৃষ্টির গুঁড়ো ঝাপটা-বাতাসে ঢুকছে দোকানের ভেতর। টালির ফাঁক দিয়ে টেবিলে টস্‌টস্‌ করে জল পড়তে দেখে দোকানী সেখানে একটা জলের ছোট্ট মগ পেতে দিয়ে গেল। নন্দ চায়ের অর্ডার দিয়েছিল দু'কাপের। একটা তার। আর একটা গহরালির।

মেঘের ডাক, বিদ্যুতের চমক আর দমকা বৃষ্টির ধরন দেখে রজনী বুঝতে পারে বসতে হবে বেশ কিছুক্ষণ। তাই সে নেহাত খেয়ালের বশেই এককাপ চা খেতে চায়। নন্দ আরেকটা অর্ডার দেয়। বৃষ্টির ক্রমশ ঝেঁপে আসার ভঙ্গী দেখে দোকানের আলোচনাটা অন্যদিকে বাঁক নিচ্ছিল। চৈত-বৈশাখেই যদি আকাশ এত ঢালে, আষাঢ়-শ্রাবণে মাঠের দশা কি হবে তাই নিয়ে হালকা ধরনের ভাবনা-চিন্তার আলোচনা। নন্দ আর রজনীর কানে সে-সবের অল্পই ঢুকছিল। বৃষ্টির ছাটের ভয়ে গহরালিদের চোখের সামনের দরজাটা ভেজিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু দোকানের টিনের ঝাঁপটা খোলা আছে। নন্দ আর রজনী তারই ফাঁক দিয়ে একটা করুণ দৃশ্যের দিকে তাকিয়েছিল। চায়ের

দোকানের উল্টোদিকে কাপড়ের দোকান। তারই রক্ ঘেঁষে একটি রিকৃশা এসে থামল। দুজন যাত্রী। খুব সম্ভবত নতুন বিয়ে হওয়া বর-কনে। ঢ্যাঙা স্বামী। গোলগাল বেঁটেখাটো বৌ। প্রায় শরীরের মাপেই ঘোমটা টানা। এক-গা জবড়জং শাড়ী-কাপড় বৃষ্টিতে ভিজে ন্যাতার মত চুপসে-নেতিয়ে কী করুণ রকম অসহায় করে তুলেছে লজ্জাবতী বৌটিকে। স্বামী বেচারাও মহা অস্বস্তিতে পড়েছে। স্ত্রীর জন্যে কি করবে ভেবে না পেয়ে কেবল ঝগড়া করছে রিকৃশাওলাটার সঙ্গে। রিকৃশার মাথার পর্দাটা ছেঁড়া ছিল বলেই ত ভিজে জাব হতে হয়েছে তাদের। রজনী ও নন্দ দুজনে আলাদা আলাদাভাবেই উপভোগ করছিল দৃশ্যটা। এমন সময় বৃদ্ধ গহরালির গলাটা কানে বাজল তাদের।

ইসব পাপের জন্যে হয় হে। খোদাতাল্লার খাতায় মানুষের পাপের সমস্ত হিসেব লেখা নেই ভেবেছ? ইসব যে কাণ্ডকারখানা দেখতেছ আজকাল সব পাপের ফল।

দোকানসুদ্ধ সকলেই গহরালির দিকে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকায়। নন্দর মত রজনীর মত, অন্যান্য সকলেও বুঝতে পারে না কি কথা থেকে এই পাপের কথায় পৌঁছল গহরালি। গহরালির কুঞ্চিত, কৃশ মুখের আদলে কোন রকম উত্তেজনার ছাপ ফুটে ওঠে নি অথচ।

পাপের কথায় দোকানের একজন খদ্দের এমনভাবে ঘাড় নাড়ে যেন তারই মনের কথাটা ব্যক্ত হয়েছে গহরালির মুখ দিয়ে। বলে—ইটা তুমি ঠিক বলেছ চাচা, আমিও বলি—

গহরালি তাকে দাবড়ী হাঁকায় চড়া গলায়।

আরে, থামত তুই। কত বয়স তোর। তুই তো তেঁতুলগাছির গোপাল সাউ-এর বেটা। এই তো সেদিন জন্মেছু। তুই আবার জানবি কি?

গহরালি নন্দর দিকে ঘাড় বাঁকিয়ে বলে—জানতো ওর বাপ, আর জানতাম আমি। আর পৃথিবীতে জনমনিষ্যি কেউ জানতো নি।

বৃষ্টির শব্দকে চাপা দিয়ে বাতাসের গোঙানী আর অন্ধকারকে চিরে চিরে বিদ্যুতের ঝলসানি ক্রমশ প্রবল হয়ে উঠছে। মাঝে মাঝে মেঘের গর্জন আকাশ থেকে মানুষের বুকের মধ্যে বাজছে গুরগুর ধ্বনি তুলে। যেন কোন মহা-আতঙ্কের দুর্ভাবনার মত।

নতুন কোন চায়ের অর্ডারের সম্ভাবনা নেই দেখে দোকানদার সামনের চৌকিতে

নন্দর পাশে বসল সুপারি কাটতে। সকলে বুঝতে পারে বৃষ্টিটা থাম্ বললেই এখুনি থামবে না। সুতরাং নিছক সময় কাটানোর খাতিরেই গহরালির গলায় কোন রহস্য-ঘেঁষা কাহিনীর আভাস পেয়ে সকলেই সেদিকে মনোযোগ দেয়।

কই গো চাচা, থামলে কেন? বল না কিসের কথা বলতেছ।

নন্দও ঔৎসুক্য প্রকাশ করে। অনুরোধ জানায়। যে কাহিনীর সঙ্গে তার বাপের জীবন জড়িয়ে আছে সেটা শুনতে পাওয়ার আগ্রহে।

সকলের আগ্রহ দেখে গহরালি ভয় পায়। বলে—না গো, সেসব কথা হাটে-মাঠে বলার নয়। বললেও আবার পাপ হবে।

তবু সকলের নাছোড়বান্দা অনুরোধে গহরালিকে বাধ্য হতে হয় কাহিনীটা বলতে।

বাইরের বৃষ্টি-ভেজা পৃথিবী, মেঘ-ভরা আকাশ আর বিদ্যুৎ-চকিত অন্ধকার গহরালির অন্তরের নিভৃতে রচনা করেছিল গল্প বলার একটা আন্তরিক প্রেরণা।

গল্পের আগে গহরালি ভূমিকা করে খানিকটা।

দেখ বাবু, ইসব কথা জীবনে কারুর কাছে ব্যক্ত করি নি। ওর বাপ মরে গেছে। আমি বেঁচে আছি। তিয়াত্তর-পঁচাত্তর বছর বয়স হল, খোদার কসম করে বলতেছি, কাউকে ভাঙি নি ইসব গোপন কথা। তেনারা সব স্বগ্যোবাসী। নইলে কানে শুনলে ধড়ে আর মাথা থাকত নি।

শ্রোতারা আশ্বাস দেয় সব কথাই গোপন রাখবে তারা। দিব্যি-দিলাসাও খায় কেউ কেউ। যেন সত্যি সত্যিই এরকম গোপন কথা গোপন রাখার স্বভাব আছে তাদের।

গহরালি গল্প বলা শুরু করে।

জমিদার বাড়ীর ছোটকত্তার কথা বলতেছি।

শ্রোতাদের মধ্যে একজন সঙ্গে সঙ্গে মন্তব্য করে—আহা ভারী দেবতুল্য মানুষ ছিলেন তিনি।

গহরালি বিরক্ত চোখে তাকায়। বলে—কথার মাঝখানে ফুট কাটবে তো তুমিই না হয় বল, আমরা শুনি।

আবার সকলে গহরালিকে আশ্বাস দেয় কথার মাঝে তারা কেউ রা' কাড়বে না।

তা ছোটকত্তার কথা বলতেছি। তিনি তো শেষ কালটায় পদ্মপুকুরের পাড়ে

নতুন মহলে থাকতেন। সেইটে মোর হাতের গড়া। নতুন মহলটা কেন হল সেইটে আগে বলি। মেজকত্তার ছোটছেলের বিয়েতে বেনারস থেকে বাঈজী এসেছিল সে তো তোমরা জান। তা বিয়ের রাত শেষ হবার পরের দিন বাঈজীর চলে যাবার কথা। ছোটকত্তা আটকালেন, আরেক রাত্রি নাচগান হবে। এই করে দু-তিন রাত্রি কেটে গেল। সবাই বুঝল কিছু একটা ঘটেছে ছোটকত্তার ভিতরে। সবাই বুঝেছে, কিন্তু মুখ ফুটে কেউ বলছে না কিছু। আমরা তো অন্দর মহলে মাঝে মাঝে ঢুকতুম। দেখি সব থমথমে। কানে না শুনলেও অন্যের মুখে শুনি ছোট-মা মুখে পানি পর্যন্ত দেওয়া বন্ধ করে কান্নাকাটি করছেন।

ততদিনে বাঈজীর দলের লোকজন সব চলে গেছে। আছে একজনমাত্র ভদ্র-লোক। বোধ হয় বাঈজীরই নিজের লোক। তিনি রাঙা-মা'কে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চান। ছোটকত্তার হুকুমে কিন্তু রাঙা-মা'র ঘরের বাইরে বেরোনাও বন্ধ। শেষতক্ ভদ্রলোক একাই ফিরে গেলেন। আর ছোটবাবুর হুকুমে পদ্মপুকুরের পাড়ে আমরা তখন নতুন মহল গাঁথার গোড়াপত্তনি করছি। কদিন পরে ভদ্রলোকটি ফিরে এল আবার। জমিদার বাড়ীতেই নয় শুধু, গ্রামের দশদিকে একটা সাড়া পড়ে গেল, কি-হয় কি-হয় ভাবনায়। ভদ্রলোক পণ করে এসেছে রাঙা-মা'কে ফিরিয়ে না-নিয়ে ফিরবে না। কিন্তু ছোটবাবুর হুকুম মিলছে না। ভদ্রলোকটি আইন-কানুন, মামলা-মোকদ্দমার ভয় দেখাচ্ছেন। ছোটবাবু সে-সব কথা কানেও তুলছেন না। বাড়ীসুদ্ধ লোকের অনুরোধে, বিশেষ করে মেজকত্তার হাতে-ধরা অনুনয়-বিনয়ে ছোটবাবু শেষ পর্যন্ত বললেন—কুসুম যদি নিজের গরজে যেতে চায়, তাহলে যেতে পারে। মেহমান ভদ্রলোকটি দাবি জানালেন—কুসুমকে আমার সঙ্গে কথা বলতে দিতে হবে। ছোটবাবু অনেক ভেবেচিন্তে রাজী হলেন। বললেন—সন্ধ্যের আগে দেখা হবে না।

এই পর্যন্ত বলে গহরালি থামল। শ্রোতাদের মধ্যে ঔৎসুক্য বেশ জমাট হয়েছে। এমন কি দোকানদার পর্যন্ত হাতের জাঁতি থামিয়ে হাঁ করে গল্প শুনতে অন্যমনস্ক হয়ে গেছে। গহরালি চোখ বুজিয়ে আবার শুরু করলে।

ওদিকে ঐ কথা বলে এদিকে ছোটবাবু লোক পাঠিয়ে ডাকলেন অশ্বিনীকে। অশ্বিনী তখন মাঝি হিসেবে খুব ঝানু মাঝি। নদী-আকাশের চলন-বলন সব তার মুখস্থ। অশ্বিনী আসতেই ছোটবাবু বললেন—অশ্বিনী, আমি আজ ওপারে খেলতে যাব। আমার ষোলো দাঁড়ের ছিপটা তোমাকেই চালাতে হবে।

ছোটবাবু ছিলেন তল্লাটের মধ্যে মস্ত নামজাদা দাবাড়ে। নদীর এপারে ওঁর কেউ জুড়ি ছিল না। নদী পেরিয়ে তমলুকের শহরে ছিলেন একজন। শহরের এস. ডি. ও সাহেব। ওঁর নাকি ছেলেবেলার বন্ধু। ষোলো দাঁড়ের ছিপে চেপে খেলতে যেতেন ছোটবাবু। দাঁড়ি-মাঝি সবই ছিল নিজেদের। আমরা তাই ভেবে অবাক হলাম অশ্বিনীকে ডাকা হল কেন?

যাই হোক অশ্বিনীর পালা চুকতেই এল আমার পালা। আমাকে ডেকে নিয়ে গেলেন পদ্মপুকুরের পাড়ের শিবমন্দিরের অন্ধকার দিকটায়। রক্তের মত গায়ের রঙের জৌলুষ। খড়োর মত নাক। চোখ দুটি পটল চেরা। কী সুপুরুষ মানুষ! কিন্তু সেদিন যেন ছোটবাবুর মুখের চেহারা দেখে বুকে ঢাকের বাজনার মত শব্দ হচ্ছিল। ছোটবাবু বললেন—গহর, এটা আমাদের মন্দির। এর সামনে দাঁড়িয়ে তোকে যা বলবো তা যেন পৃথিবীর কেউ কোনদিন ঘুণাক্ষরে না টের পায়। আমি বললুম—আজ্ঞে, খোদার কসম রইল। আপনি বলুন। জানতাম একটা কিছু জটিল রকম কাজের হুকুম দেবেন। কিন্তু সেটা যে এমন ভয়ংকর তা বলবার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত টের পাই নি। শুনে রক্ত যেন—

হঠাৎ সমস্ত দোকানটা টলে উঠল একটা প্রচণ্ড বজ্রপাতের শব্দে। মানুষের চোখকে অন্ধ করে দেবার মত তীব্র আলোয় ঝলসে উঠল চারপাশ। দোকানের লোকজন কানে আঙুল দিয়ে গুটি-সুটি পাকিয়ে গেল। কিছুক্ষণের জন্যে মানুষ ভুলে গেল গহরালির গল্পের ভয়ংকর রকম কিছু একটা পরিণতির কথার আগ্রহ দেখাতে।

আর ঠিক সেই সময়েই ঝট্‌কা বেগে ভেজানো দরজাটা ধড়াস করে ঠেলে দোকানে ঢুকল সাধন। বৃষ্টিতে ভিজে জামা-কাপড় গায়ে লেপ্টে গেছে। জামা-কাপড় কাদায় মাখামাখি।

সাধনকে যারা চেনে তারা প্রায় সকলেই দুঃখ প্রকাশ করে তার দুর্দশা দেখে। সাধন কোঁচার কাপড়ে ঘাড় থেকে হাতের আঙুল পর্যন্ত মুছে পাটাতনের একদিকে বসে বলে—বেশ গরম করে এককাপ চা দাও দেখি মল্লিক-দা।

রজনী ও নন্দ সাধনের জন্যে জায়গা করে দেয় গায়ে গায়ে বসে। গহরালিও সাধনকে যথেষ্ট চেনে। ছেলেবেলা থেকেই চেনে। চাকুরে হবার পর থেকে সাধন গহরালিকে মাঝে মাঝে দু-চার আনা সাহায্য করে। গহরালি জিভ্ দিয়ে চুকচুক শব্দ করে বলে—বাবু বুঝি জলে-ঝড়ে পড়েছিলেন?

সাধন চা খেতে শুরু করলে, শ্রোতারা আবার গহরালিকে খোঁচায় গল্পটা শুরু করার জন্যে। সাধন ঔৎসুক্য প্রকাশ করে—কিসের গল্প গহর চাচা? বলেই সে রজনীর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে—রজনী, বাড়ী যাবে তো?

রজনী বলে—আজ্ঞে হ্যাঁ, বৃষ্টি একটু না ধরলে কি করে যাই।

সাধন বলে—বৃষ্টি এবার ধরে যাবে মনে হচ্ছে। তবে মেঘটা ছাড়ে নি। চল, তুজনে একসঙ্গেই যাওয়া যাবে।

গহরালি হেসে সাধনের কথার জবাবে বলে—না, গল্প কিছু নয় বাবু, এই কথায় কথায় ছোট কত্তার কথা উঠল।

ছোট কত্তা মানে কুমুদবাবু তো?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

সাধন একটু গম্ভীর হয়ে গহরালির দিকে তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞেস করে—হ্যাঁগা চাচা, একথা কথা কখনো জিজ্ঞেস করি নি তোমাকে। ছোট কত্তার সম্বন্ধে যে-কথা শোনা যায় সেটা সত্যি?

কোন্ কথা?

খুনের কথাটা। উনি কি সত্যিই নিজের হাতে খুন করেছিলেন লোকটাকে?

গহরালির বুকের মধ্যে টিপটিপ শব্দ ওঠে। সে কথার জবাব না দিয়ে মাথা নাড়ে কেবল।

সাধন বলে—বাবার মুখে শুনেছিলুম একবার গল্পটা। ছেলেবেলায়। যে লোকটা রাঙাবুড়ীকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছিল তাকে নাকি নিজের হাতে খুন করে শোবার ঘরের মেঝেয় পুঁতে রেখেছিলেন।

দোকানের লোকজন সাধনের দিকে সাগ্রহে ঘুরে তাকায়। গহরালির অস্তিত্ব যেন মুছে গেছে দোকান থেকে। সে চোখ বুজিয়ে নিথর বসে থাকে। সাধনকে সকলের চাপে পড়ে তাকেই গল্পের সবটা খুলে বলতে হয়।

ছোট কর্তা খুন করার পর আট মিনিটের মধ্যে নদী পেরিয়ে দাবা খেলতে বসেছিলেন এস. ডি. ও-র সঙ্গে। মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে আদালতে মামলা উঠল। শুধু সময়ের হেরফের ঘটিয়ে জিতে গেলেন ছোট কর্তা। ছোট কর্তার হয়ে আদালতে সাক্ষী দিলেন এস. ডি. ও সাহেব। বললেন—যে সময়ে খুন করা হয়েছে বলা হচ্ছে সে সময় উনি আমার বাংলোয় দাবা খেলছিলেন।

সাধনের কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত শ্রোতার মুখের চেহারাটা দ্রুত গতিতে পালটে যায়। সবাই বুঝতে পারে গহরালি যে পাপের কথা তুলেছিল

সেটা তার নিজেরই পাপ। খুন করা লোকটাকে ও-ই তাহলে মেঝের তলায় পুঁতে রেখেছিল। মুহূর্তের মধ্যে এতগুলো লোকের চোখে গহরালির শান্ত মুখাবয়বটা কেমন যেন বীভৎস ও বিদ্রূপের সামগ্রী হয়ে ওঠে। ছোট কর্তার একটা মানুষকে দিবালোকে খুন করার চেয়ে অনেক বেশী অপরাধ মনে হয় যে লোকটা সেই মৃত দেহটাকে ইট-বালি-সুরকির তলায় থেঁতলে পিষে সমতল করেছে।

সাধন জিজ্ঞেস করে—ঘটনাটা সত্যি নাকি চাচা?

জবাব দিতে গিয়ে গহরালির গলাটা কাঁপল। আকাশের মেঘ গর্জনের মধ্যে দিয়ে কথাটা শোনা গেল বলেও কাঁপার কথা মনে হতে পারে।

আজ্ঞে, ছোট কত্তা সেই রকমই জানতেন। আমি খোদার কসম খেয়ে বলেছিলাম, তাঁর কথাই অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছি। কিন্তু লোকটাকে খুব গোপনে পুড়িয়ে ফেলার যুক্তি দিয়েছিলুম মেজকত্তাকে। বামুনের বংশের ছেলে, নাহলে যে বেহেস্তে ঠাঁই পাবে নি সারাটা জীবন।

গহরালি থামে। বড় বিষণ্ণ দেখায় তার মুখটাকে।

শ্রোতারা এতক্ষণ যে দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়েছিল গহরালির দিকে, তার মধ্যেও একটু একটু বদল ঘটতে থাকে।

দশ

বৃষ্টি থেমে গেলে রজনী, নন্দ ও সাধন দোকান থেকে বেরোয়। নন্দ আসে নৌকো পর্যন্ত। সে নৌকোয় যাবে। রজনী আর সাধন আগু-পিছু হয়ে হাঁটে। সাধনকে মাতালের মত টলমল করে হাঁটতে দেখে রজনী বলে—সাধনবাবু, আপনার ব্যাগটা আমাকে দিন। বুড়ো আঙুল টিপে হাঁটুন। ইদিকের রাস্তাটা এঁটেল মাটির কিনা!

আরও খানিকটা এগিয়ে রজনী জিজ্ঞেস করে—সাধনবাবু, কলকাতায় কিসের গণ্ডগোল হচ্ছে?

কে বললে?

ঐ নন্দ বলতেছিল। কি সব স্ট্রাইক-হরতাল হচ্ছে নাকি?

হ্যাঁ, সে মিটে গেছে। জিনিসপত্রের দাম বড্ড বেশী বেড়ে গেছে কিনা। তারই প্রতিবাদে একদিন হরতাল হয়েছিল।

হরতালের ব্যাপারটাকে রজনী যতটা জটিলভাবে ভেবেছিল, সাধনের সাদামাঠা জবাবে সে বিষয়ে সে নিশ্চিন্ত হয়। ওরা দুজনে রাস্তার যে বাঁকটার কাছে এসে পৌঁছয় তার একদিকে পুকুর, অন্যদিকে ঘন ফণিমনসার ও কাঁটা ঝোপের ঝাড়। রজনী আরেকবার সাবধান করে দেয় সাধনকে।

থামুন গ সাধনবাবু, ইখেনে একলা যাবেন নি। আমার কাঁধটা ধরে হাঁটুন। সাধন রজনীর কাঁধে ভর দিয়ে আছাড়-খাওয়ার রাস্তাটা নিরাপদে পার হয়। এর পর কিছুটা পথ লোকালয়হীন। দৃশ্যহীন ঘন অন্ধকারের অসীমে হারিয়ে গেছে দু-ধারের জগৎ-সংসার। মাঝে মাঝে সেই প্রগাঢ় অন্ধকার বিদীর্ণ হচ্ছিল বিদ্যুতের সুতীক্ষ্ণ প্রহারে। সাহস করে রজনী একবার তাকিয়েছিল আকাশের দিকে। আকাশের সেই ভয়ংকর ও উন্মত্ত মহিমার দিকে তাকিয়ে রজনীর মনে হল পৃথিবীর বুকে তারা অতি ক্ষুদ্র দুটি প্রাণী পিঁপড়ের মত হামাগুড়ি দিয়ে চলেছে বুঝি।

আবার গ্রামের ঘর-বাড়ীর আওতার মধ্যে এসে গিয়ে রজনীর মনে পড়ে গেল চায়ের দোকানে বসে শোনা প্রচণ্ড বজ্রাঘাতের শব্দটা। গতবছর পাশের গ্রামের একটা গোটা সংসার পুড়ে ছাই হয়ে গেছল ঐ বজ্রাঘাতে। বৃষ্টি হচ্ছিল অবিশ্রান্ত ধারায়। আকাশের অভিশাপ আকাশের আশীর্বাদের ধারায় নিভল না তবু। রজনীর মনে ভয় হল যদি এ বছরও তেমনি শোচনীয় দুর্ঘটনা ঘটে আশপাশের কোন বাড়ীতে।

বেদনাদায়ক এই চিন্তার সূত্র ধরেই রজনীর আবার আকস্মিকভাবে মনে পড়ে যায় জিনিসপত্রের ক্রমাগত দাম বেড়ে চলার কথা। রজনী সাধনকে প্রশ্ন করে—তা শহরে কি রকম সব ব্যবস্থা হচ্ছে সাধনবাবু দু-দশ দিনের মধ্যে দর-দাম নামবে কিছুটা। নইলে যে…

রজনী যে তখন থেকে সেই দ্রব্যমূল্যের ওঠা-নামার হিসেব করছে এটা বুঝতে পেরে অবাক হয় সাধন। ভাবে—একজন মধ্যবিত্ত আর একজন শ্রমিক বা কৃষকে কত তফাত। রজনীর মাথায় ঘুরচে দ্রব্যমূল্য। আর সাধন এতক্ষণ জীবনের মূল্যের কথা ভাবতে ভাবতে প্রায় মৃতের মত বাকৃশক্তিরহিত হয়েই পথ হাঁটছিল। একজন খ্যাতনামা ঔপন্যাসিকের একটি প্রসিদ্ধ উপন্যাসের প্রথম লাইনটা বার বার ঘুরে ফিরে মনে আসছিল তার। আকাশের দেবতার সামান্য কটাক্ষপাতে সেই উপন্যাসের প্রথম চরিত্রটির মতই তারও কি মৃত্যু হতে পারে না এই মুহূর্তে। নিজের মৃত্যুকে কল্পনা করতে গিয়ে সাধনের দুর্ভাবনার

ভেতরে বার বার ফুটে উঠছিল মাধুরীর মুখ। সে মুখ আসল মাধুরীর চেয়ে একশ গুণ সুন্দর। মৃত্যুর আতঙ্ক ক্রমশ এত প্রবল হয়ে উঠছিল তার ভাবনায় যে এক সময়ে তার মনে হল যেন এই কাদা, অন্ধকার, বজ্রপাত বিদ্যুৎ পার হয়ে সে কোনদিনই আর পৌঁছবে না নিজের বাড়ীর উঠোনে কিংবা মাধুরীর পরিপাটী করে সাজানো সুখশয্যায়।

রজনীর গলার সাড়া পেঁয়ে অর্থাৎ তারই পাশে একজন জীবন্ত মানুষের অস্তিত্বের নিদর্শন পেয়ে, সাধনের সংবিৎ ফিরে আসে। রজনীর কথা এই সব ভাবনার মুহূর্তে একবারেই বিস্মৃত হয়ে গিছল, আরও কিছুটা এগিয়ে প্রায় নিজের বাড়ীর কাছাকাছি এসে সাধনের হাস্যকর মনে হতে শুরু করে তার হঠাৎ মনে-আসা মৃত্যুর চিন্তাকে। শৈশব থেকে সাধন বজ্র-বিদ্যুৎকে ভীষণ ভয় পায়। এত বয়সেও সে আতঙ্ক ঘোচে নি তার।

সাধনের দোরগোড়ায় এসে রজনী সাধনের ব্যাগটা তার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলে—আমি চলি তাহলে।

সাধন দরজার কড়া নাড়তে নাড়তে বলে—না, না আরে রজনী থাম, দাঁড়া, একটু জিরিয়ে যা।

দরজা খুলে দিতে আসে হ্যারিকেন হাতে সাধনের ছোট ভাই নন্ত। দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ পেয়েই সাধনের বাড়ীর দোতলার বারন্দায় এসে দাঁড়িয়েছিল তিনটি ছায়ামূর্তি। সাধন পলকের জন্যে তাকিয়েও তিনটি ছায়ামূর্তির ভেতর থেকে মাধুরীকে অনায়াসে আবিষ্কার করে নেয়। সাধন দাওয়ায় উঠে সত্যবতীর উদ্দেশে বলে—মা, রজনী এসেছে। ও না থাকলে আজ কী যে দশা হতো আমার। ওকে কিছু খেতে-টেতে দাও মা। কিছুতেই আসবে না। জোর করে নিয়ে এলাম।

সত্যবতী সাধনের সামনে এসে তাকে ভাল করে নিরীক্ষণ করার পর মন্তব্য করেন—আরে, হায় হায় বাছা, গোটা রাস্তাটা তুই এমনি কাছাড় খেতে খেতে এলি? কর্তা এই ঘুমিয়ে পড়লেন। বলছিলেন নন্তকে আলো নিয়ে পাঠাতে। আমরা এই-এল এই-আসছে ভেবে পাঠাতে দেরি করছিলাম। রাস্তা কি এমন খারাপ?

সাধন বলে—রাস্তা আর বলে না ওকে, যমের দক্ষিণ দুয়োর। কাছাড় বা খাবার খেয়েছি বড় রাস্তায়। যেখানে কাছাড় খেলে হয় পুকুরে পড়তে হতো, নয় গড়াতে হতো ফণিমনসার বনে, সে-রাস্তাটা রজনী বাঁচিয়ে দিয়েছে।

আরে রজনী, তোর যদি আসনে বসতে এত লজ্জা হয় তো তুই 'রেল'টাতে চেপে বস না।

সত্যবতী সাধনের ব্যাগটা দিয়ে ভাঁড়ারে চলে যান। ব্যাগ থেকে আম, লিচু ইত্যাদি জিনিসপত্র বার করতে করতে তিনি ভাবেন—আহা! রজনীটা ভাগ্যিস সঙ্গে ছিল, নইলে বাছাকে আমার কি কষ্টই না পেতে হতো!

হিসেব করে সত্যবতী ব্যাগ থেকে ছটা লিচু আর একটা আম নিয়ে ছাড়াতে বসেন রজনীর জন্যে। আম কুটতে কুটতেই কি খেয়াল হয় তিনি ছ'টা থেকে দুটো লিচু আলাদা করে নেন। ঘরে এতগুলো মানুষ আছে, একেবারে এত হাত দরাজ করলে হয় কখনো। চারটে লিচু ও কিছু আমের কুচিতে ছোট বাটিটা প্রায় ভরে উঠেছে। সত্যবতীর মনে হল—সাধনের বলার গুণেই মনে হচ্ছে রজনী বুঝি কী একটা সৃষ্টিছাড়া কাজ করেছে। বাড়ী তো ফিরছিল দুজনেই। তাই সঙ্গে সঙ্গে এসেছে একটু। এইটুকু উপকারের জন্যেই হঠাৎ একজন চাষীর ছেলেকে এতটা খাতির করে বসা কেমন যেন বেমানান মনে হল তাঁর। তিনি বাটি থেকে আরও দুটো লিচু তুলে নিলেন।

দোতলার বারান্দা থেকে তিনটি ছায়ামূর্তির একটি ধীরে ধীরে নেমে আসে হাতে সাধনের পরবার একটা আটপৌরে ধুতি নিয়ে। সাধনের দিকে কেমন একটা মনের দূরত্ব রেখে মাধুরী নিষ্পলক তাকিয়ে থাকে। জলে-ঝড়ে ভিজে, কাদায় আছাড় খেয়ে, কাদা-মাখানো জামা-কাপড়ে সাধনের ছন্নছাড়া মূর্তিটা আজ বড় অভিনব লেগেছে মাধুরীর চোখে। উন্মুক্ত প্রকৃতির নিত্য-নতুন আবর্তন-বিবর্তন-পরিবর্তনের পটভূমিকায় সাধনকে মাধুরী কত নতুনরূপে খুঁজে পায়। রাত্রির অন্ধকারে ভালবাসার গভীর উপদ্রবে যে লোকটা 'দস্যু' বা 'শয়তানে'র মত (মাধুরী গভীর আবেগের মুহূর্তে সাধনকে ঐ দুটি নামে সম্বোধন করে) মাধুরীর জীবন-যৌবনকে বিপন্ন ও আচ্ছন্ন করে ফেলে, রাত্রির অন্ধকারে প্রকৃতির উন্মাদ উপদ্রবে সেই লোকেরই এমন শাস্তি-পাওয়া শিশুর মত অসহায় অবস্থা বিস্ময়কর ঠেকে মাধুরীর কাছে। শহর হলে কি এভাবে কোনদিন দেখা যেত সাধনকে ?

মাধুরী কাছে এগিয়ে এলে সাধন তার হাতের রিস্টওয়াচ, যেটা এতক্ষণ হাতেই রুমালে জড়ানো ছিল, পকেটের মনিব্যাগ ইত্যাদি মাধুরীর হাতে তুলে দেয়। মাধুরী ঠোঁটে বাঁকা হাসি নিয়ে সাধনের ঠোঁটের ঈষৎ হাসি ও শরীরের ভঙ্গিগুলো লক্ষ্য করে।

এই সময় ওপরের বারান্দা থেকে অবশিষ্ট ছায়ামূর্তি ছুটিও নীচে নেমে প্রণাম করে সাধনকে। সাধন ভুতুর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে—আরে, তুই কখন এলি? ওপরে বুঝি তুই-ই দাঁড়িয়েছিলি। তাই ভাবছিলাম, নন্তু খিল খুলে দিলে, বারান্দায় নন্তুর মত কে দাঁড়িয়ে?

ভুতু জবাব দেয়—আর বল কেন মামা, সেই সন্ধ্যে থেকে আটকে আছি বৃষ্টির জন্যে।

ভুতু রজনীকে বলে—রজনীদা, তুমি ত বাড়ী যাবে? চল, তবে একসাথে বেরোই।

ভাঁড়ার ঘরের ভেতর থেকে সত্যবতী হাঁকেন—ও আঙুর, ভুতু কি চলে যাচ্ছে? ওকে এখানে পাঠা না একবার।

সত্যবতী ভুতুকে একটি প্লেটে কয়েকটি লিচু, আম ও মিষ্টি খেতে দেন।

সন্ধ্যের কিছু আগে ভুতু এসেছিল এখানে। আঙুরকে লুকিয়ে সিনেমা পত্রিকাটি পড়তে দেবার জন্যে। ভুতু পৌঁছবার একটু পরেই ঈশান কোণের পাঁশুটে মেঘ জলে-ঝড়ে পৃথিবীটাকে কাঁপিয়ে তুলল। তাই বাধ্য হয়েই ভুতুকে সেই থেকে বসে থাকতে হয়েছে এখানে। গল্প-গুজবে, রেডিওর গান শুনে সময়টা কেটে গেছে। মাঝে রান্নাঘর থেকে ডাক আসতে মাধুরী একবার নীচে নেমে গিছল আধঘণ্টার জন্যে। সেই সময় আঙুর একা ছিল ঘরে।

তখন বাইরের আকাশে যেন মহাযুদ্ধ চলেছে কুরুক্ষেত্রের। অবিশ্রান্ত বাণবর্ষণের মতই মনে হচ্ছে অনর্গল বৃষ্টিপাত। মেঘের গর্জনে মাঝে মাঝে কেঁপে উঠছে দোতলার পাটাতন। ভেজানো দরজা-জানলার ফাঁক দিয়েও ঘরে ঢুকে পড়ছে বিদ্যুতের তীক্ষ্ণ ঝলক। বিদ্যুৎ যেন একটা বেতের চাবুক হাতে নির্দয় শাসকের মত শাসিয়ে বেড়াচ্ছে পৃথিবীময় অন্ধকারকে। বাইরের পৃথিবীতে এই বিশ্বজোড়া চঞ্চলতা ভুতুর প্রাণেও এক অভিনব রোমাঞ্চের শিহরন জাগায়। জীবনে যেন সে এই রকম একটা স্বর্গ-মর্ত-রসাতল কাঁপানো উন্মাদনাকেই খুঁজে পেতে চায়।

আঙুর তন্ময় হয়েছিল সিনেমার কাগজে ফিল্ম-স্টারদের ছবি দেখার দিকে। ভুতু সেটা ছিনিয়ে নেয়। আঙুর প্রথমে অবাক ও পরে বিরক্ত হয়ে পত্রিকাটি ভুতুর হাত থেকে কেড়ে নেওয়ার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে গিয়ে বলে—আমি চলি।

ভুতু জোর করে আঁচল ধরে টেনে চোখের ভঙ্গীতে করুণ মিনতি জানিয়ে বসায় তাকে। বসিয়েই আকস্মিকভাবে শুরু করে দেয় অনর্গল বাক্যোচ্ছ্বাস। যা এতদিন তার অন্তরের অতি গোপন অন্তরালে লুকনো ছিল।

একজন বিখ্যাত চিত্রাভিনেতা হওয়াই তার জীবনের ধ্রুব লক্ষ্য। সিনেমার কাগজ থেকে ঠিকানা যোগাড় করে ইতিমধ্যে বহু অভিনেতা-অভিনেত্রীর সঙ্গে নিয়মিত পত্রালাপ শুরু করে দিয়েছে। তাদের কাউকে সে সম্বোধন করেছে দিদি। কাউকে মাসী। কাউকে দাদা। কাউকে শুধু শ্রদ্ধাভাজনেষু ইত্যাদি ইত্যাদি।

শুনতে শুনতে মুখে ঠাট্টা-রসিকতা করলেও আঙুরের মনের ভেতরে ভয় ভাবনা ও আনন্দের এটা মিশ্র অনুভূতি খেলে যায়। এতদিনের দেখা-জানা ভুতুর চোখ-মুখ-নাক চেহারা সব যেন পাল্টে যায় তার চোখে। মনে হয় ভুতু বুঝি অনেক দূরের মানুষ, দরের মানুষ।

ভুতু ও আঙুর দুজনেই যখন দুজনের প্রতি মমতাপূর্ণ আবেগে কথোপকথন করছিল সেই সময়ে আকাশ পৃথিবী বিদীর্ণ করে একটা বজ্রাঘাতের শব্দ হল। বাখুরীর বাজারে চায়ের দোকানে গহরালির গল্প থেমে গিছল যে সময় বজ্রাঘাতের শব্দে—এটাও সেই সময়ের ঘটনা। বজ্রাঘাতের শব্দে আঙুর কানে আঙুল লাগিয়ে ছিটকে ভুতুর দিকে সরে এসেছিল প্রাণের আতঙ্কে। সত্যিই আজকের বজ্রাঘাতটা বড় ভয়ংকর রকমের। কিন্তু তাতে যে মানুষ এমন মারাত্মক রকমের ভয় পেতে পারে ভুতু আঙুরকে দেখে বুঝেছিল।

রজনী যখন উঠতে যাচ্ছে, সত্যবতী সাধনের কানে কি যেন বললেন। সাধন রজনীকে উদ্দেশ করে বললে—আরে রজনী, কাল সকালবেলা একবার জালটা ফেলবি আমাদের পুকুরে, খুব নাকি মৌরলা মাছ হয়েছে।

রজনী বলে—আচ্ছা দেখবো।

বাইরে বেরিয়ে বৃষ্টি-ভেজা থমথমে অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে রজনী একটা বিড়ি ধরায়।

ভুতু বলে—রজনীদা, থাকে ত আমাকেও একটা দাও দেখি।

তুমি বিড়ি খাও নাকি ভুতুবাবু ?

না, সিগারেট খাই। আজ কি বাজারে যেতে পেরেছি জল-ঝড়ে। এই মাসীদের বাড়ীতে আটকে আছি সেই সন্ধ্যে থেকে। কি হল, তুমি কি ভয় পাচ্ছ ? জাতের ভয় ? আমি ওসব মানি না।

অগত্যা রজনী একটা বিড়ি বাড়িয়ে দেয় ভুতুকে। ভুতু বিড়িটা ধরিয়ে গভীর আক্ষেপ প্রকাশ করে বলে—জাতের ভয় তোমাদের এখনো গেল নি। জন্ম-জন্মান্তর বামুন জাতটার খড়মের তলায় চাপা পড়ে চেপটে, তোমাদের

শিরদাঁড়াটা মচকে গেছে একেবারে। যখন বিড়ি চাইলাম, মুখের এঁটো বিড়িটা বাড়িয়ে দিতে পারলে না ?

রজনী বুঝতে পারে ভুতু বয়সের চেয়ে অনেক বেশী পেকেছে। আরও একটা জিনিস বুঝতে পারে রজনী। ভুতু তার বাপের জুড়ি নয়।

বাড়ী ফিরে খাওয়া-দাওয়া চুকিয়ে শোবার সময় প্রতিদিন মাথার সামনে হ্যারিকেন জ্বালিয়ে একটা বই পড়া ভুতুর অভ্যেস। কিন্তু আজ সে বইয়ে মন বসাতে অক্ষম হল। বার বার তার চোখে ভেসে উঠছিল আঙুরের মুখ। মেয়েরা যে-যেমনই হোক, তাদের কিছু ভঙ্গিমা, কিছু হাসির ধরন, কিছু চোখের কটাক্ষে একটা অস্বাভাবিক শক্তি আছে, চুম্বকের লোহাকে আকর্ষণ করার শক্তির মত। ভুতু আলো নিভিয়ে দিয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করে। ঘুমোবার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত তার মনটা হায় হায় করে নিজের নির্বুদ্ধিতার দৃষ্টান্তে। বজ্রাঘাতের শব্দে ভয়ে ঠিকরে আঙুর তার কত কাছে এসে গিছল। তখন কি তাকে ভয় পাওয়ার ছলেও আলিঙ্গন করা যেত না !

ভুতু ঘুমল। সমস্ত পাড়াও ঘুমে জুড়িয়ে গেল। কিছুক্ষণ আগেও সাধন জেগে ছিল মাধুরীকে দৃঢ় আলিঙ্গনে জড়িয়ে। মাধুরীকে সে রাস্তার মৃত্যু-চিন্তার ঘটনা শোনাচ্ছিল।

জান মাধুরী, এক এক সময় ভাবতেই পারি না পৃথিবীতে কোন এক জায়গায় তুমি আছ আর আমি সেই ঐশ্বর্যময়ী তোমাকে কাছে পাব। যখন পাই তখন যেন ধন্য হয়ে ওঠে জীবন।

মাধুরী সাধনের গলাটা আকুল আন্তরিকতায় জড়িয়ে ধরে বলেছিল—না তুমি অমন করে মৃত্যুর কথা ভাববে না।

এই জাতীয় আলাপ রচনার মধ্যে ওরা দুজনও ঘুমিয়ে পড়েছে কখন।

ঝড়ের প্রহারে ক্ষত-বিক্ষত, সমস্ত পৃথিবীটাও যেন ক্লান্ত স্তব্ধতায় আচ্ছন্ন। তখনও পৃথিবীতে একটি প্রাণীর চোখে ঘুম নেই। সে রজনীর। ঘুম প্রায় এসে গিয়েছিল তার চোখে। সেই সময়ে একটা অস্পষ্ট কান্নার শব্দ কানে এল তার। রজনী প্রথমে ভেবেছিল সুভদ্রার কাতরানির শব্দ। তার পর ভেবেছিল হঠাৎ বুঝি কেঁদে উঠেছে সুরেনের পেট-রোগা মেয়েটা। কিন্তু কিছুক্ষণ অন্তর অন্তর কান্নার শব্দ পেয়ে রজনী বুঝল—এ কান্না পদ্মর। পদ্মর কান্নার কারণ কি তা আকাশ-পাতাল ভেবে খুঁজতে গিয়েই ঘুম আসছে না রজনীর চোখে। পদ্ম যে কারণেই কাঁদুক একথা ত সত্যি, পদ্মর অসুখী

জীবনের অশ্রুপাতে রজনীর অন্তর বেদনা ও সমবেদনার প্রবাহে আলোড়িত ও অভিভূত হয়।

এগার

কিছুদিন পরের কথা।

খালের ধারে কোনমতে মাথা গোঁজার একটা চালায় বুড়ী হরিমতির বসবাস। গ্রামের লোকে ডাকে হরিবুড়ী। আরও একটা নাম ছিল হরিবুড়ীর। 'মদার মা'। সে নামে আজকাল কেউ ডাকে না।

হরিবুড়ীর এক সতেরো বছরের ছেলে ছিল। নাম মদন। বিয়ে হওয়ার বয়স পেয়েছিল। একবার তেলেভাজার দোকান দিলে গাজনের মেলায়। মেলার শেষে সারাদিনের লাভ-ক্ষতির হিসেব-নিকেশের সময়ে মাঠের ফাটল থেকে একটা বিষধর সাপের সরু জিভের সূক্ষ্ম স্পর্শে অল্প একটু চিনচিনে ব্যথা পাওয়াকে পোকা-মাকড় কি পিঁপড়ের কামড়ানি ভেবে নিশ্চিন্ত হবার কিছুক্ষণ পরেই মুখ দিয়ে ফেনা তুলতে তুলতে মরে গেল।

হরিবুড়ী সেই থেকে একা। ভিক্ষে করে খায়। ভিক্ষে ছাড়া আরও একটি রোজগার আছে। বাজার কুড়নো।

সপ্তাহে দুদিন, সোম আর শুক্র, হরিমতি সকলের আগে বাজারে যায়। সকলের শেষে ফেরে। কুঁজো বলে লাঠি ঠুকে হাঁটে। আধপচা আলু, পোকালাগা বেগুন, ফুলকপির ডাঁটা, বাঁধাকপির পাতা, কুমড়োর বিচি, কাঁঠালের ভুঁতি, পায়ে চটকানো আমের অবশিষ্টাংশ ইত্যাদি যা কিছু পায় সবই সাগ্রহে কুড়িয়ে কোঁচড়ে ভরে। ঘরে গিয়ে ধুয়ে-পাকলে সবগুলো আলাদা করে বাছে। একটা পেট। তাই খুব অসুবিধে হয় না বেঁচে থাকতে।

সেই হরিবুড়ীই একদিন ঘরে ফেরার পথে একে-ওকে ডেকে শোনায়—জানু রসিকের মা, শুনেছু কেষ্টার বৌ, উ-পাড়ার সেই মাগীটা হাটে বসেছে।

কে বলতো?

অই যে উ-পাড়ার চারুবালা। শেতলার মাগ।

তুমি চোখে দেখলে?

না দেখে কি মিছে কথা কইতে এসেছি? মিছে কথা বলা মোর কুষ্ঠিতে লেখে নি।

কি দেখলে গা ?

দেখনু, এক ধামাটাক চাল নিয়ে ঐ সতীশ মল্লিকের কলগোড়ার পাশে বসে রয়েছেন। আমি দেখেই সরে এনু। যেন নজরে পড়ে নি।

ও খুড়ি, ঘরে এস। দুটো কথা শুনবো।

কে একজন খুড়িকে বাড়ীতে ডেকে নিয়ে যায়।

একটা কাজ করে দাওনা গা খুড়ি। আর পারতেছি নি।

কি কাজ বল না লো। কবে আর করি নি।

এই চিকনি শাকগুলো বেছে দাও দিনি খুড়ি। যাবার বেলা মুড়ি নিয়ে যেও। উদিকে নয়, ইদিকে এই রান্নাশালের মুখটায় এসে পিঁড়েটা টেনে নেসে বসো। তুমিও বাছো। আমিও ডালটা সেঁতলে নি।

বুড়ী শাক বাছে। রান্নাশালের ভেতর থেকে হাঁক আসে—অ খুড়ি, চুপ মেরে রইলে যে। কথা কও না গ, কি কইতেছিলে। কান পাতা আছে।

হরিবুড়ী আবার কথা বলে। তাই বলি বৌ, ভাগ্য, ভাগ্য, সবই ভাগ্য। বরাতে যা আছে তা খণ্ডায় কে ? অই চারুবালা যেদিন গ্রামের মাটিতে প্রেথম পা দিলে সেদিন কি দেমাক। কথায় বলে নি—

অতি বাড় বেড়োনি ঝড়তে উড়াবে,
অতি ছোট হোয়নি ছাগলে মুড়াবে।

হলও তাই। ভারী বেড়েছিল। পুরুষ মানুষের কাছে লজ্জা নেই সরম নেই। মাথায় ঘোমটা নেই। ঢ্যাঙস-ঢ্যাঙস করে ইখেনে-সিখেনে হাঁটতেছে জুতো পায়ে। সে যেন এক দিগম্বরী মূর্তি।

যুবতী আমরাও ছিনু বৌ। মোর বে' হয়েছিল ন' বছর বয়েসে। ভাতার বলে কি বস্তু তা যেদিন জানমু, তার এক বছর পরেই কোলে ছেলে এল। আর উ মাগী যখন গ্রামে এল, কুন-না-কুন বয়েসটা হবে সাতাশ-পঁচিশ। মাগী তখনও অবিয়স্ত। বলি, মেয়েমানুষ হয়ে যদি গভ্যোধারিণী না হতে পারলু ত তোর জম্মে ধিক্। মাগীর ধেড়ে বয়সে যদি বা ছেলে হল, ত সোয়ামী মরল। ইসব কেন হয় ? পাপে গো পাপে।

হরিবুড়ী যে বাড়ীতে বসে চিকনি শাক বাছতে বাছতে এই সব গল্প করছিল, তার পাশের বাড়ীটাই রজনীদের। ঘটনাচক্রে কথাটা রজনীর কানে গিয়ে পৌছল। সম্ভবতঃ পদ্মর মারফত।

শুনেই মনটা তিতো হয়ে যায় রজনীর। রজনীকে না জানিয়ে চারুর কি

অধিকার আছে হাটে বেরোনোর ? রজনী কি বেঁচে নেই ? নিজের দুঃখ-দুর্দশার খবরটাকে আগে দেশসুদ্ধ লোককে না জানিয়ে তাকে গোপনে একান্তে ডেকে বললে হতো না ?

রজনী তার কাজের ফাঁকে সন্ধ্যের প্রত্যাশা করে। রাগ জুড়িয়ে যাচ্ছে। অল্প রাগ নিয়ে চারুর সামনে গিয়ে দাঁড়ালে অভিমান অভিযোগের গলাটা ঠিক মত ফুটবে না। চারু হাসবে। এক-সময়ের পূর্ণ পরিপুষ্ট যৌবনের শেষ স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে যে হাসিটুকু আজও টিকে রয়েছে, সেই হাসি। সে হাসির উষ্ণতায় রজনীর জমাট ক্ষোভ গলে যেতে পারে।

চারপাশের এই একঘেয়ে জীবন, একই মানুষ-জন, একই ভাল-মন্দ আনন্দ-কষ্ট, এর মাঝে বেশীদিন থাকতে রজনীর আর মনের সায় নেই। পানায় ভরা, আগাছায় অপরিষ্কার একটা এঁদো ডোবার মত হয়ে উঠেছে চারপাশ। এখান থেকে ঠাঁই-নাড়া হতে হবে। এই জীবন থেকে নবতম এক জীবনে এগিয়ে যাওয়ার একটা পরিকল্পনা মাথায় ঢুকেছে তার।

চারু তার সমস্ত সম্মান ও আভিজাত্যকে বিসর্জন দিয়ে পথে নেমেছে। রজনীও যে পথে নেমে দূরের দিকে পাড়ি দিতে চায়, সেটা আজকে স্পষ্ট করেই জানিয়ে দিতে হবে চারুকে।

চারু রজনীর মুখ চোখ দেখে অবাক হয়।

কি হয়েছে তোমার ? সব সময় মুখ ভার, মন খারাপ। তুমি আমার কাছে লুকোচ্ছ কেন ? বল না কি হয়েছে ?

রজনী কথা বলে না। চারুর মুখের দিকে তাকাতেও ভয় হয়। যদি হাসে, রাগ জুড়িয়ে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। চারু রজনীর পিঠের কাছে বসে পড়ে। অতিরিক্ত গরমে রজনীর গায়েও ঘামাচি ফুটেছে একটা-দুটো। চারু নখ দিয়ে সেগুলো টিপে টিপে মারে।

রজনী বিরক্ত হয়ে পিঠটা সরিয়ে নেয়—আঃ, কি হচ্ছে।

কি হয়েছে তোমার ?

আহা ! একদম ভালমানুষটি। একদম ন্যাকার রানী !

আমি আবার কবে ভালমানুষ হলাম ? তোমার কাছে তো চিরটাকাল খারাপ মেয়ে। কত কলঙ্ক-কালিমা মাখিয়েছি তোমার গায়ে। সেইজন্যে মনের কথা লুকোচ্ছ ?

আর তুমি বুঝি একদম মনের কথা, প্রাণের কথা উজাড় করে বল।

চারু হাসে।

কি লুকিয়েছি তোমার কাছে ?

কি লুকিয়েছ তা তুমি নিজে আর জান নি ?

আচ্ছা, এসেই মানুষটার রাগ গোসা ? এলে তো তাও কদ্দিন পরে।

রাগ গোসা করবো নি কি করবো ? তুমি আমাকে আর মানুষের মূল্য দিতে চাও নি। কোন কাজে আমার পরামর্শ নেবার দরকার নেই তোমার। হাটে চাল বিক্রি করতে গেলে আমাকে লুকিয়ে। কেন গেছলে ? আমি কি মরে গেছি ?

চারুর মুখে হাসি খেলে যায়—ওঃ, এই অভিমান। আমি বলি কি-না-কি অপরাধ করেছি বুঝি। তা যাব নি কি করবো ? তোমার দেখা নেই দুদিন। খেতে হবে তো। এই হাটটা বাদ গেলে ফিরে হাট চারদিনের ধাক্কায়। না গিয়ে কি করি বল ?

চারু রজনীকে আরও খ্যাপাতে চায়। রাগ বাড়িয়ে মজা দেখবে। আবার ভয় হয় মনে। যা গোঁয়ার মানুষ, এখুনি উঠে পালিয়ে তিনদিনের মত ডুব দেবে। চারু শেষ পর্যন্ত কথাটাকে ভাঙে—চাল বিক্রি বলে নাকি ওকে। মানসিকের মাগোন-মাগা চাল। খোকার অসুখে মানসিক করেছিনু নি তারকেশ্বরের, সেই চাল বিক্রি করতে গেছনু।

রজনীর মন হালকা হবার মুহূর্তে আবার ভারী হয়ে যায়।

কবে যাচ্ছ তাহলে ?

পাড়ার লোকজন তো যাবে। দেখি কবে যায় তারা।

চারু তারকেশ্বরে যাচ্ছে। রজনীর মনে হয় এটা যেন তারও ঘর ছাড়া হবার একটা সংকেত। চারু আহত হবে। সংসার বিক্ষুব্ধ হবে। তবু এছাড়া পথ নেই। চারুকে নিজের জীবনযাত্রার পটভূমি থেকে সরিয়ে ফেলতে চায় সে। চারুর প্রতি তার আর কোন ভালবাসা নেই। দূরে থাকলেই ভুলে থাকা যায়। একদিন যে চারুকে গ্রামের ইতর, ভদ্র, ধনী দরিদ্র সমস্ত মানুষের কাছেই এক দুর্লভ মণি-মাণিক্যের মত মূল্যবান মনে হতো তার সেই রাজ-রাজেশ্বরীর প্রতিমা ভেঙে-চুরে শুকনো খড়ের ভুরটা বেরিয়ে পড়েছে। যাওয়া-আসার পথে গরু-ছাগলে যার গা চেটে যায়। তা নয় কি ? আগে চারু ছিল একা রজনীর। আজ সে সকলের। কারো কাজের বাড়ী বাটনা বাটতে মাছ কুটতে ডাকলে হ্যাংলার মত ছোটে। সময়ে সময়ে এখানে-সেখানে ঢেঁকিতে ধান ভেনে

আসে। রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে ছেলে-ছোকরাদের সাথে ফ্যাকফ্যাক করে হাসে, গল্প করে। রজনীর দম্ভটা আর রইল কই? আজ বাদে কাল কেউ যদি চারুকে মাসিক দশ টাকা মাইনে আর ভাত-কাপড় দিয়ে বাড়ীর চাকরানী রাখতে চায়, তাতে কি আর চারু রাজী না হবে? অথচ আমি কেন মিথ্যে আমার জীবনটা ওই চারুর পেছনে বেঁধে রাখবো?

তাছাড়া আরও একটা সমস্যা হল চারুর ছেলে। ঐ ছেলের সঙ্গে নিশ্চয় তারও রক্তের যোগ আছে। কিন্তু ঐ প্রেত-শাবকের মত শিশুটিকে নিজের সন্তান মনে করতে গিয়ে রজনী এতটুকুও তৃপ্তি পায় না। মনে হয় তারই অন্তরের পশু প্রবৃত্তির প্রতীক হিসেবে পশুর আকৃতি নিয়ে জন্মেছে চারুর সন্তান।

সন্তানের প্রতি রজনীর অন্তরে সত্যিই একটা সংগোপন মোহ আছে। অথচ গোটা পৃথিবীতে কোথাও সে দেখতে পায় না সুস্থ, সবল, চাঁদের কণার মত সুন্দর পবিত্র একটা শিশুকে। পদ্মর পেটে ছেলে আসে নি এক দিক থেকে ভালই, নইলে সেও ত একটা বাঁদরের কি শুয়োরের বাচ্চা বিয়োত।

এসব কথা ভাবতে ভাবতেই রজনী কখন যেন চারুকে প্রশ্ন করে ফেলে—কবে ফিরবে?

চারু বলে—যেতে না যেতেই ফেরার তাড়া। ভাবতেছি আর ফিরবো নি। তার চেয়ে তীথ্যস্থানেই ধর্ম-কর্ম করে দিন কাটাবো। ঘর-সংসারে আর মন নেই।

রজনী গম্ভীর হয়ে থাকে। চারু সেই গাম্ভীর্যকে লক্ষ্য করে বলে—কি ভাবতেছ গা? আমি না ফিরলে কি করে দিন কাটবে তোমার সেই কথা। অত ভাবতে নেই গো, অত ভাবতে নেই। তোমার ব্যবস্থা না করেই কি তীথ্যে যাবো?

রজনী উপলব্ধি করে আকস্মিকভাবে চারুর গলাটা ভারী হয়েছে।

সারাজীবন তুমি আমার জন্যে এত করলে, আমি তার কি প্রিতিদান দিয়েছি বল। একটা সাধ অনেকদিন আমার মনের মধ্যে আছে। কাউকে বলি নি, তোমাকেও নয়। সে সাধটি না মিটিয়ে আমার তীথ্যিবাস হবে নি।

চারু একটু থামে। এমন গভীর অন্তরাবেগের কথাতেও রজনী খুঁটিতে ঠেস দিয়ে খুঁটির মতই নিথর হয়ে আছে দেখে চারু মুখে হাসি ফোটায়।

একটা রাঙা টুকটুকে বৌ বিয়ে করবে তুমি। আমার গলার সাতভরি সোনার হারটা আমি লুকিয়ে রেখেছি সিন্দুকে। আমি নিজে ফুলশয্যের রাতে সেই

হারটি পরিয়ে দুবো তার গলায়। খুব ফর্সাপানা বৌ চাই কিন্তু বাবু। কালো মেয়ের গলায় আমি কিন্তু হার পরাতে পারব নি।

রজনী বিস্ফারিত চোখে তাকায় চারুর দিকে।

তুমি যে একদিন বলেছিলে হারটা নেই, শেতলদা'ই বিক্রি করে গেছে।

চারু আরও তরল হেসে জবাব দিল। বাইরের লোককে হাঁড়ির খবর বলি, আর সে একদিন দাঁও বুঝে ঘরে সিঁধ কাটুক আর কি। সকলকে সব কথা বলতে নেই।

চুরি!

আহা! যেন গাছ থেকে পড়ল। কী সাধু মানুষটি।

বলেই চারু তার কীর্তনের গানের কয়েকটি লাইন কথার মত বলে শোনায়। যার অর্থ—শৈশবে ননী-চোরা, গোপীনিদের বস্ত্র হরণ করা আর রাধার প্রাণ-মন চুরি করা সেই একই চোরা কানুর কীর্তি।

রজনীর মনটা আজ এমন সব গুরুতর ভাবনা-চিন্তায় জট পাকিয়ে গেছে যে চারুর ঠাট্টা-তামাশার মধ্যে সে কিছুতেই খোলা মনে যোগ দিতে পারছে না। চারুর কথাগুলো যেন অনেকদুর থেকে হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে অতি ক্ষীণস্বরে তার কানে এসে বাজছে। অথচ দুজনের মধ্যে দুরত্বটা মাপলে দেড়হাত হবে। রজনী প্রতিদিনের মত বসেছে দাওয়ার খুঁটিতে ঠেস দিয়ে। একটা ছেঁড়া চাটার ওপর বসেছে চারু। ক'দিনের বর্ষায় চারুর গায়ের ঘামাচি যে একটু শুকিয়ে কালচে করে দিয়েছে গায়ের চামড়াকে, তাও দেখতে পায় রজনী। ভুরুর ওপরে যে বড় একটা ফোড়া উঠেছিল ক'দিন আগে সেটাও শুকিয়ে এসেছে। দূরে শুয়ে আছে চারুর ছেলে। মাথা-ভারী বিকৃত বিকলাঙ্গ শিশুটি জীবনে কোনদিন হাসে নি, কাঁদে নি। গোঙানীর মত শব্দ করে হাত-পা ছুঁড়ে যাকে ক্ষুধা-তৃষ্ণার সংকেত জানাতে হয়।

রজনী বলে—বিবি-বৌ, তোমার সব কাজ সারা হয়ে গেছে?

কেন?

আমার কিছু কথা আছে তোমার সঙ্গে।

এত কি গভীর কথা যে কাজ সেরে বসতে হবে। মহাভারত পড়ে শোনাবে নাকি? একটু বসো। একটা কাজ সেরে এসি।

চারুর ভয় হয় খামখেয়ালী রজনী আজ কি তাকে কোন দুর্ভাবনার কথা শোনাবে? আর সেই সঙ্গে মনে পড়ে আরেক দিনের কথা। সেদিনও রজনী

ঠিক এমনি ভার-মুখ নিয়ে বলেছিল—বিবি-বৌ, তোমার সাথে আমার কিছু কথা আছে। চারু আর রজনীর প্রণয় পর্বের সেই সবে শুরু। চারু পাশে বসতেই রজনী বলেছিল—বিবি-বৌ, তুমি আমার কাছে কি চাও খুলে বলতো। চারু চমকে উঠেছিল এই প্রশ্নে। কিন্তু আজকের মত জড়তা ছিল না তার শরীরে বা মনে। সেদিন সে ছিল প্রবাহ প্লাবনে তরঙ্গময়ী। তাই সঙ্গে সঙ্গে রজনীর গলাকে জড়িয়ে ধরে বলেছিল—এই চাই।

আমার ভয় করে কিন্তু।

কিসের ভয় ?

ভয় করে আমার বয়েসকে আর তোমার যৌবনকে।

চারু হাসে। দাঁতে ফুলঝুরি ফোটে।

মরণ আমার !

লোকে যে নানা কথা বলে।

কি বলে ?

বলে—শেতল পরামানিক দুধ কলা দিয়ে সাপ পুষতেছে। আরও খারাপ মন্দ নানা কথা বলে। তোমার শুনে কাজ নেই।

শুনতেও চাই না।

চারুর ফুলঝুরি ফোটানো দাঁত ঠোঁটের মোচড় খাওয়া ভাঁজে ঢাকা পড়ে যায়। আমি তোমার শীতলদাদার কেনা বাঁদী নয়। আমার খুশি আমি আছি তার কাছে। আমার যেদিন খুশি হবে চলে যাব।

রজনী ভয় পায় চারুর চোখের গনগনে আঁচের তাপ পেয়ে।

বিবি-বৌ, আমার উপর রাগ করতেছ নাকি ?

চারু চুপ করে থাকে। হঠাৎ রজনীর নীচু-মুখের চিবুকটাকে উপরে টেনে তুলে চারু বলে—আমার দিকে তাকাও।

রজনী তাকাবার চেষ্টা করে।

তুমি যদি পুরুষ মানুষ হও—তাহলে ওদের সামনে দিয়েই বুক ফুলিয়ে আসবে। আসতে পারবে কিনা বল ?

রজনী ভয়ে ভয়েই হয়ত জবাব দিয়েছিল—আসবো।

মেয়েরা পৌরুষের নম্রতা দেখেই প্রেমে পড়ে। প্রেমের পর খোঁজে পৌরুষের জোর। যে রজনীর বিশাল বক্ষপট—তার মনটা যে এত সহজ সলজ্জ আর ভীত—সেই কারণেই হয়ত চারুর আকর্ষণটা ছিল তীব্র।

ঠাকুরপো, তুমি বাজনা শেখ। খোল শেখ না। আমি গাইবো। তুমি বাজাবে।

রজনী চারুর কাছে শিশু। সব কিছুতেই তাই অনায়াস সম্মতি।

চারু গা এলিয়ে দেয় রজনীর গায়ে।

আমার গান বাজবে তোমার খোলে। শিখবে?

খোল নয়, খোলের চেয়ে আরও দ্রুত লহরা রজনীর রক্ত-প্রবাহে বেজেছিল সেদিন। তার পর বহু বছর ঘুরে গেছে। রজনী বাজনা শেখে নি। কিন্তু চারুর জীবনের সঙ্গে কিংবা বলা যায় চারুর ভালবাসার সঙ্গে সে সমানে সঙ্গত করে গেছে।

হাতের কাজ সেরে চারু এসে বসল রজনীর পাশে।

বল কি বলবে।

জান বিবি-বৌ, আমি তোমাকে একটা কথা বলব বলব করে বলতে পারি নি। আমার আর গ্রামে থাকতে মন চায় নি। বাইরে যাবো কোথাও।

কোথা যাবে? চাকরি-বাকরি করতে?

তাইত ভাবতেছি। আমার বড় ভগ্নীপতি কাজ করে বাস্নুড়ের চটকলে। সে অনেকবার ডেকেছে। বলে—এলেই কাজ পাবি। যেতে মন চায়। কিন্তু ঘর-সংসারের জন্যে, মায়ের অসুখটা না সারার জন্যে মন ওঠে নি ঠিকমত। ভাবতেছি কি কম দিন থেকে? গতবারে বানের জলে চাষ-বাস একদম নষ্ট হয়ে যাবার পর থেকেই ভাবতেছি।

চারু রজনীকে উৎসাহ যোগানোর ভাষায় বলে—বেশ ত, ভাল। কাছাকাছি যদি থাক, হপ্তায় হপ্তায় মাইনে পেলে চলে আসবে। গতর যখন খাটাবে, তখন মাঠে খাটলেও খাটা, আর কলে খাটলেও খাটা।

কেবল চারুর আন্তরিক সমর্থনে বা নিজের অন্তরের তাড়নায় নয়, ঘটনাচক্রে পড়ে দু-এক দিন পরে সত্যি সত্যিই রজনী তার ভগ্নীপতির কাছে চিঠি লিখে বসল। ঘটনাটা সামান্য। কিন্তু রজনীর কাছে তা সামান্য নয়। ফুসকুড়ি দেখে প্রকাণ্ড বিষফোঁড়ার অনাগত আতঙ্ক তাকে উদ্বিগ্ন করল।

দু-জায়ে ঝগড়া। বড় বৌ বীণাপাণির ছোট একটি ভাই একদিনের জন্যে এখানে রাত কাটায়। পরের দিন সে যখন বাড়ী চলে যাবে বীণাপাণি তার হাতে বাপের বাড়ীর জন্যে কিছু সওগাত পাঠায়। দুটি বড় ঝুনো নারকেল। সেরখানেক বেগুন। কলাপাতায় মোড়া একডেলা গাছের পাকা তেঁতুল।

পদ্ম আবদার করেছিল ওরই হাতে তারও বাপের বাড়ীতে বেগুন নয়, তেঁতুল নয়, দুটি নারকেল পাঠাতে। পদ্ম ও বীণাপাণির বাপের বাড়ী পাশাপাশি না হলেও পাশাপাশি দুটি গাঁয়ে। পথে আগে পড়ে পদ্মর বাড়ী। বীণাপাণি রাজী হয় নি। ঐটুকু ছেলে একা অত বইতে পারবে না—এই যুক্তিতে। তা থেকেই কথা কাটাকাটি শুরু হয়। বীণাপাণি পদ্মকে গালমন্দ দেয় এই বলে যে, যেহেতু পেটে তার ছেলে জন্মায় নি সেহেতু ছেলে-মানুষের প্রতি তার দয়া-দরদ নেই। এবং বীণাপাণির প্রতি হিংসার জ্বালাতেই সে জ্বলে মরছে। পদ্ম প্রথমদিকে গলা ছেড়ে খানিক চীৎকার-প্রতিবাদ করে শেষে ঘরে খিল দিয়ে কেঁদে কাটিয়েছে সারা বেলা। কিছুদিন হল সে একটি সাদা বেড়াল পুষেছে। নাম পটল। বেড়ালটি তার সন্তানের মত। সারা বেলা সে সেই বেড়ালেরও খোঁজ করে নি।

এইটুকু ঘটনার মধ্যেই রজনী তার অদ্ভুত অত্যাশ্চর্য দূরদৃষ্টি দিয়ে দেখতে পায় সাঁত বংশের ভাগাভাগি হয়ে-যাওয়া সংসারের ভগ্নদশার ছবি।

রজনী তার ভগ্নীপতি রাইচরণকে লেখে—আমি মনস্থির করিয়াছি, আপনি আমার জন্য একটি কাজ যোগাড় করিয়া রাখিবেন। চার পাঁচদিনের মধ্যে রওনা হইব। মাতা ঠাকুরানীর অবস্থা সেই রকম। কদিন খুব বৃষ্টি হইল ইত্যাদি। আগে রাইচরণকে চিঠি লিখে পরে বাড়ীতে খবরটা দিল রজনী।

বারো

রজনী বাড়ীতে কথাটা পাড়ার পর সুরেন হ্যাঁ বা না কিছু বললে না। কেবল মনে হল তার চোখ দুটো যেন অসম্ভব রকম গর্তে ঢুকে গেছে।

রমণী বললে—তোর আক্কেল-মর্জি বোঝা দায়।

রজনী বললে—কেন, এতে বে-আক্কেলের কি আছে? যাচ্ছি ত রোজগারের জন্যে। বুনো ষাঁড়ের মত ঘুরে বেড়াতে যাচ্ছি নি ত? তোমরা মাঠে খেটে ঘরে ধান তুলবে। আমি কলে খেটে টাকা আনবো। তাতে সংসারের ক্ষতির কি আছে? আর জায়গাটা ত এমন কিছু বিদেশ-বিভুঁই নয়। এই ত কাছে-কাছে। প্রতি হপ্তায় ঘরকে আসতে পারবো।

বয়স হয়েছে, নইলে রমণীর ইচ্ছে করছিল ঠাস্ করে একটা চড় সাঁটিয়ে দেয় রজনীর গালে। মইয়ের জন্যে বাঁশের গাঁট ছাড়াচ্ছিল সে। মনের রাগটা

চাপতে গিয়ে জোরে জোরে বাঁশের ওপর কয়েকটা কোপ চালিয়ে গলার স্বর একটু খাটো করে নেয়।

দ্যাখ রজো, বংশের কতগুলো বিধি-বিধান থাকে। সেগুলো মানতে হয়। শুধু গোঁয়ার্তুমি করলে হয় না। চোদ্দপুরুষ ধরে আমরা মাটির সেবা করে আসছি। কাদা মাটিতেই জীবন। মাটি হচ্ছে লক্ষ্মী। সেই মাটির সেবায় তোর অরুচি? বাপ-পিতেমোর কব্জির তেজ, গায়ের ঘাম, রক্তের তাগদ মিশে আছে ঐ মাটিতে। তাকে ছেড়ে তুই যাবি পরের নোকরি করতে?

এর জবাবগুলো রজনীর জানা আছে।

মাঠে ক্ষেতে কি আর সুখ নেই? কিন্তু সুখ-দুঃখ পাশাপাশি। ধানের মরা-হাজা আছে। ঝড়-বান আছে। গেঁদে পড়ে ধান লালচে মেরে যেতে পারে। ওড় নামলে ধানের গোড়াটা সরু হয়ে মাঝখানে পেট ফুলে শিকড় নামবে। বোগা মারতে পারে। ধানে দুধ বসে বসে, সেই সময়ে যদি জল হল ত সব আঁকড়া। হাপসে পচে গেল।

'কোল পাতলা ডাগর গুছি
লক্ষ্মী বলে এখানে আছি।'

সে-সব দিন আর নেই, এখন আষাঢ়েও আকাশের কৃপা নেই। আবার আশ্বিনে উজাড়।

ধানের দেবী লক্ষ্মী। তিনি মেয়েমানুষ। মেয়েমানুষের ভিতরে ঋতুবতীও আছে। বাঁজাও আছে। সুখের ভাগ আর দুঃখের ভাগ সমান-সমান। আর যন্ত্রের দেবতা হল বিশ্বকর্মা। তিনি পুরুষমানুষ। ব্রহ্মার আদেশে তিনি গড়েছেন এই বিশ্ব-চরাচর। তাঁর ক্ষয়-বিনাশ নেই। একবারে অজরামর। কলে কারখানায় যাও। গতর খাটালেই পয়সা। নগদানগদি।

রমণী আরও তেতে ওঠে।

যন্ত্রপাতি কলকারখানা হয়েছে আজকে। আবহমান কাল থেকে, মোর বাপ-ঠাকুদ্দার সময় থেকে আমরা মাটির সেবাইৎ। তখন ত যন্ত্র ছিল নি। তখন কি সুখ ছিল নি সংসারে? সুখ যদি থাকে ত তখনই ছিল। কাঁসার বাসনে ভাত। কুটুম এলে কালো পাথরের থালা-গেলাস। বৌ-ঝির হাতে সোনা-দানা। দেশে আনন্দ-উৎসবের ছড়াছড়ি। জমিদারবাবুদের দেউড়ীর মাঠে রাসের বাজী পুড়ত, ধর না কেন পাঁশশো টাকার। এই ত গাজন হচ্ছে গ্রামে। আমরাও ঢ্যাং ঢ্যাং করে নাচি। আমাদের বাপ-ঠাকুদ্দাও নাচত। হনুমন্ত

ভোগ, রাজভোগের দিনে গ্রামসুদ্ধ লোক মূল সন্নেসীদের সঙ্গে সং সেজে জমিদার বাড়ীতে যেতো। জনাকে জনা খাবা দাবা। আবার বকশিশ। তখন জমিদার বাড়ীতে ঝাড়লণ্ঠন জ্বলত। চাঁদের কিরণকে কানা করে দিত সে আলো। আজ হয়েছে রেলগাড়ি। রেলগাড়ি যখন ছিল 'নি তখন কি মানুষ-জন ঘরে ঠুঁটো জগন্নাথের মত বসে থাকত। দেশ-বিদেশে তীর্থে-তীর্থান্তরে যেত নি? তখনই বরং বেশি যেত। ঠাকুমা মরেছিল কোথায়? হরিদ্বারে গিয়ে না? সত্তর বছরের বুড়ী পায়ে হেঁটে হরিদ্বারে গেছল। তখন ছিল আট বেয়ারার পাল্কী, চতুর্দোলা, আর জলপথে ছিল ষোলো দাঁড়ের ছিপ। এই আছে ত এই নেই। যেন হাওয়ার উপরে ভর দিয়ে উড়ে গেল চক্ষের নিমেষে।

এর জবাবেও রজনীর অনেক কথা বলার আছে। কিছু সে জেনে শিখেছে। কিছু শিখেছে দেখেশুনে। বাবা-পিতামহের আমল আর আজকের আমলে যে অনেক তফাত সেটা সে বোঝে। তাই যদি না হবে ত দেশ থেকে কটা-ভানুনিরা উঠে যাচ্ছে কেন? ধানের বস্তা মাথায় করে সবাইকে সতীশ মল্লিকের ধান কলে ছুটতে হচ্ছে কেন? গ্রামে ত এত পুকুর, তাহলে গ্রামসুদ্ধ লোক 'টিউকলে'র জন্যে দরখাস্ত লিখে পাঠিয়েছিল কেন? বাপ-ঠাকুর্দাবা ত 'টিউকলে'র জল খেত নি। আজকাল কারুর ঘরে রোগ-নাড়া হলে কবিরাজকে ডাকে কজন? কেন ছুটে যায় পাস-করা ডাক্তারের কাছে। বাপ-ঠাকুর্দার আমলে ত গ্রামে শহরের পাস-করা ডাক্তার পাকাবাড়ী তুলে ডিসপেনসারি করত নি।

এখন ত তবু হাল-লাঙলে, গরু-বলদে চাষ-বাস করতেছ। দ্যাথ না আর ক-বছর পরে কি হয়। যন্ত্র দিয়ে চাষ হবে। দিনকাল যে পাল্টাচ্ছে সেটা বুঝতে হবে ত। বাপ-ঠাকুর্দার আমলই যদি এত ভাল ছিল, তাহলে সেটা আর রইছে নি কেন? তখন আমাদের ছিল তিরিশ বিঘে ভোগ-দখলের জমি। এখন সব মহাজনের পেটে গিয়ে পাঁচ বিঘেয় ঠেকেছে কেন? কেন ভাগ চাষের জন খাটতে যেতে হয় পরের ঘরে। সেটা নোকরি-গোলামী নয়? বাপ-ঠাকুর্দা কি পরের বাড়ী জন খাটতো?

এসব ছাড়াও আরও কিছু যুক্তি জানা আছে রজনীর। সেগুলো ঠিক যুক্তি নয়। দৃষ্টান্ত। রজনী জানে সে যা করতে যাচ্ছে সেটা এমন কিছু পৃথিবীকে উল্টে দেওয়ার মত নতুন আর ভয়ংকর অসম্ভব অঘটন নয়। এই বাখুরী গ্রামেরই কত চাষীর ঘরের পুরুষ-যুবা দেশ-বিদেশে গিয়ে কাজ-কারবার বা চাকরি করেছে,

ও করছে। দখিন পাড়ার শীতল পরামানিকের কথাই ধর। তারও ত চোদ্দপুরুষ ছিল চাষী। সে কেন কলব.তায় গেল লোহার ব্যবসার দালালী করতে? কার্তিক গড়ায়ের দু ছেলে রাজকৃষ্ণ আর হরেকৃষ্ণ ত কবছর ধরে কলকাতায় শোভাবাজারে ডাবের ব্যবসা চালাচ্ছে। রামপুরের কাপড়ের মিলে হপ্তা খেটে যারা পেট-চালায় আর পেট-চালানোর ব্যবস্থাটাকে অনেকটা নিশ্চিন্ত নির্ভাবনাহীন করার দাবি তুলতে গিয়ে গুলি চালানোর সামানে দাঁড়িয়ে জখম হয়ে জেল খেটে একেবারে পুরোপুরি শ্রমিক হয়ে গেছে, তারা কাদের বংশধর? তাদের বাপ-ঠাকুর্দারা মাটির সেবাইৎ ছিল না? তাহলে?

যাবার দিনে সুভদ্রা ডাক ছেড়ে কেঁদে ওঠে। তার ধারণা রজনী রাগ করে কোথাও চলে যাচ্ছে।

ওর বাপ যে ছিল ঐ রকম। পান থেকে চুন খসলে রাগ। বাড়ী ছেড়ে উধাও। আবার একবেলা পরে ফিরে এসে মোর ভয়ে চুপি চুপি ঘরে ঢুকে বসে থাকতো। নেশাখোর মানুষের মর্জি ত! পায়ের সাড়া পেয়ে আমি অমনি এক কলকে তামুক সেজে মুখের সামনে হুঁকোটা বাড়িয়ে দিলে মোটা গোঁফের ফাঁকে হাসি খেলে যেত।

কিন্তু রজনী যেন আরও অবুঝ। বাপের দ্বিগুণ। দেশে-ঘরেই যদি এরকম করে তাহলে বিদেশ-বিভুঁয়ে গিয়ে অজানা-অচেনা মানুষের সঙ্গে কি বলতে কি করবে সেই আশঙ্কায় সুভদ্রার ময়লাটে আঁচলটা চোখের জলে ভিজে যায়।

পদ্ম আগের দিন রজনীর জামা-কাপড় কেচে দিয়েছিল। যাবার দিনে একটা মরচে-পড়া টিনের সুটকেসের ভেতরে জামা-কাপড় গামছা ইত্যাদি সাজিয়ে-গুছিয়ে দেয়। আর দেয় এক শিশি মাথায় মাখার নারকেল তেল। একটা ছোট ফ্রেমহীন আয়নার কাঁচ আর অল্প-কয়েকটা দাড়া-ভাঙা একটা চিরুনি। সুটকেসের গায়ে ছুঁইয়ে দেয় লক্ষ্মীর সিঁদুর খানিকটা।

পদ্ম বলে—সুটকেসের চাবিটা সাবধানে রেখ।

রজনী পদ্মর ধরা গলার ভাঙা ভাঙা আওয়াজ শুনে চোখ তুলে তাকাতে পারে না। রজনী প্রণাম করতে গেলে পদ্ম হাত দুটো ধরে ফেলে। সে এতই উতলা যে সকলের সামনেই রজনীকে বুকে জড়িয়ে ধরল।

বড়-বৌ বলে—থাক্ ভাই থাক্, হয়েছে। ভাল ভাবে থেকো। হপ্তায় হপ্তায় বাড়ী চলে এসো। দেখতেই ত পাচ্ছ বাড়ীর সকলের মনের অবস্থা। সকলকে কাঁদিয়ে যাচ্ছ।

রজনী উঠোনে নামতেই সুভদ্রা হাঁক পাড়ে—থাম, থাম, দাঁড়ি যা।
পিছন থেকে মায়ের ডাক ভাল। 'আগে হতে পিছে ভাল যদি ডাকে মায়।'
সুভদ্রা বড়-বৌকে বলে—দরজার কাছে কোন খালি হাঁড়ি-কলসী থাকে ত সরি দে।

'শূন্য কলসী, শুকনো না।
এক পাও না বাড়াও পা।'

সুরেন ছিল গোয়ালে। পায়ে প্রণাম নিয়ে বলে—যাচ্ছু। রাইচরণের কাছে-কাছে থাকবি। সে যা বলে তাই শুনবি। দুগ্‌গা, দুগ্‌গা।
রমণী কোন কথাই বলে না। ঘরের লোক ছাড়াও পাড়া-প্রতিবেশীরা এসে ভিড় বাড়ায় এই বিদায়-দুঃখের মাঝখানে।
রজনী অনেকটা দূর এগিয়ে গিয়ে পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখে সকলেরই চোখে আঁচল।
সুরেন এনায়েৎকে ডেকে পাঠিয়েছিল। আজই ছিল তার আসার দিন। বিকেল হতে না হতেই এনায়েৎ হাজির।
বড়কর্তা কই গ?
সুরেন গোয়াল থেকে খড় কুঁচোতে কুঁচোতে উঠে আসে।
এনায়েৎ তার সঙ্গের গরুটাকে নারকেল গাছের গুঁড়িতে বেঁধে ট্যাঁক থেকে একটা বিড়ি ধরায়।
এই যে গ বড় কর্তা। সেলামালেকুম। তোমার জন্যে গরু নেসেছি। ই যা গরু, আর দেখতে হবে নি। যেন ভাগলপুরী। এখনও কমসে-কম সাতটা আটটা চাষ তুলবে। দাঁত দেখেছ? কার গরু জান? খাজনাবালার রবিউল কিনেছিল তার গাড়ির জন্যে। কিনেছিল এক ভেবে। এখন পড়েছে বাবু দুঃখের ফেরে। নিজের পেটে পানি না পড়লে গরুর দানা-পানি যোগান দেয় কি করে। কইলে—চাচা, দাওদিনি একটা খদ্দের যোগাড় করে। ভালই হল মোর। তোমার মত একটা খদ্দের পেয়ে গেনু।
এনায়েৎ হাঁটু চুলকোতে চুলকোতে ময়লা দাঁতে হাসে।
এত কথার উত্তরে সুরেন কেবল একটি কথা বলে।
না থাক।
সে কি গ! কি হল? দর-দামের জন্যে ভাবতেছ?
না থাক। ই চাষটা যাক।

এনায়েৎ গাছের গুঁড়ি থেকে দড়ির বাঁধন খুলতে খুলতে ভাবে—মানুষটা ত কখনো কথার খেলাপ করে নি। কি হল?

সুরেশের যে কি হয়েছে তা কেউ জানে না। পদ্ম শুধু অবাক হয়ে ভাবে—আমরা যে দুঃখে কাতর হয়ে বেঁকে যাই ঐ মানুষটি নীরবে সেই দুঃখকে বুকে বহন করে কি করে?

রজনীর ওপর অন্তরের গুমরে-মরা অসহায় রাগটাকে নিয়ে ছটফট করে পদ্ম। তার জমানো রাগটা ভরা কলসীর জলের মত নড়তে-চড়তে গেলেই উপচে পড়ে এখানে ওখানে।

বিলাসের নিজের ঘাট-পুকুর আছে। যেহেতু সংসার আছে, তাই তার বাসন-কোসন, চাল-ডাল, আনাজ-তরকারি সেই পুকুরেই ধুতে হয়। সংসারে যে দুটি-পাঁচটি প্রাণী আছে তাদের পেটের ময়লা, চামড়ার ময়লা, জামা-কাপড়, কাঁথা-কানির ময়লাও সাফ করার প্রয়োজন ঘটে। এত কাজ হয়। কিন্তু বিলাসের মুখ-ধোয়া আর দাঁত মাজা হয় না।

পদ্ম পুকুর-ঘাটে বসে বাসন মাজবে। তার উল্টো দিকের কোণে বসে যতক্ষণ খুশি দাঁত-মাজা চলবে তার। পদ্মই প্রশ্রয় দিয়েছে এতকাল। পাড়া-সম্পর্কে ঠাকুরপোর সঙ্গে যতটা মাত্রা রেখে মেলামেশা করা উচিত ছিল, পদ্ম তা মানে নি। মন-খোলা হাসি-ঠাট্টা, রসালো রসিকতায় বিলাসের ডাঁশা-ডাঁশা ষোলো-আঠারো বছরের মনটাকে পদ্ম প্রায় বিশ-বাইশের কোঠায় তুলে এনেছে না-জেনে না-বুঝে।

রজনী কারখানায় চলে যাওয়ার পরের দিন। পদ্ম ঘাটে বাসন মাজতে বসেছে। বিলাস সরাসরি এসে বসল খেজুর কাঠে বাঁধানো লম্বা ঘাট-সিঁড়ির একপাশে। পদ্মর মন-মেজাজের হদিস জানা ছিল না তার। বেশি অন্তরঙ্গ হবার উগ্র তাগিদে একটু বেশি রকম রসিকতা করতে গিয়েই গাল বাড়িয়ে চড় খেল সে। বাসন-মাজার ছাই-তেঁতুল-গোবর মাখানো হাতের চড়।

ডেঁপোমী শিখেছ ভারী, না? পেটে ছেলে এলে বুঝিবা তোর বয়সী হয়। তোর মুখে এই সব কথা। দাঁড়া তোর মাকে সব জানাচ্ছি আজ।

রাগ পড়ে যেতে পদ্ম সেটা আর জানায় নি। মানুষকে কষ্ট দেওয়া তার স্বভাব নয়।

বিকেলে এক বুড়ো ভিখারী গান গাইতে এল একতারা বাজিয়ে। গাইল দেহতত্ত্বের গান। একমুঠো চাল দিয়েই তাকে বিদায় করা যেত। পদ্ম

নারকেলের মালায় একমালা চালের সঙ্গে গাছের একটা বেগুনও দিল তাকে। ভাগ্যবতী কিংবা সন্তানবতী হওয়ার আশীর্বাদের লোভেই হয়তো।

তেরো

রজনীর অভাবটা সুভদ্রার পর পদ্মর বুকেই বাজল বেশি। পাঁচ-কাজ, পাঁচ-কথার এলোমেলো ঝঞ্ঝাটে নিজেকে জুড়ে দিয়ে মনের জ্বালা জুড়োতে হয় তাকে।

সেদিন হাতে কাজ ছিল কম। খাওয়া-দাওয়া মাজা-ঘষার কাজটা সকাল-সকাল মিটিয়ে সে বেরিয়ে পড়ল পাশের বাড়ীর কাঙালের বৌকে সঙ্গে নিয়ে। যাবে সে বড় গোসাঁইয়ের বাড়ী। সাধনের বৌ বাপের বাড়ী থেকে ফিরেছে। তাকে দেখতে।

সাধনের বৌ মাধুরী সম্পর্কে পদ্ম অনেক কথাই শুনেছে। কিন্তু চোখে দেখে নি। মাধুরী যে সুন্দরী হবে সে বিষয়ে পদ্মর সন্দেহ নেই। একে শহরের মেয়ে। তার ওপর লেখাপড়ার জ্ঞান রয়েছে। পদ্ম তবু মনে মনে যে-কারণে সঙ্কোচ বোধ করে সেটা মাধুরীর আচার-ব্যবহারের দিক। পদ্মরা চাষীর ঘরের গেঁয়ো মুখ্যু বোকা-হাবা ধরনের মেয়ে। মাধুরী তাদের দেখে নাক সিঁটকোয় যদি? যদি কথা না বলে মুখ বেঁকায়?

পদ্ম কাঙালের বৌ ষষ্ঠীকে বলে—শেষ পর্যন্ত কথাবার্তা কইবে ত?

যা বলেছ দিদি, শহরের মেয়ে, ঠাকুরের বৌ, গরব-গুমোরে আটখানা। চল তো যাই। চোখের দেখা দেখে আসি।

পদ্ম আর ষষ্ঠী গোসাঁই বাড়ীর দরজার কাছে এসে গানের আওয়াজ পেয়ে থমকে দাঁড়ায়। গানের সুরে পদ্মর মনটা হঠাৎ খুশি হয়।

গানও জানে বুঝি! বলি মোদের গ্রাম যে শহর-বাট হয়ে উঠল লো।

কিন্তু বাড়ীর ভেতরে ঢুকে পদ্ম আর ষষ্ঠীর ভুল ভাঙে। গানটা মাধুরীর গলার নয়। যন্ত্রের। ঐ যন্ত্রকে বলে 'রেডিও।' মাধুরীর বিয়েতে উপহার হিসেবে সাধনের আপিসের বন্ধুরা মিলে কিনে দিয়েছে।

মাধুরী বলে—আসুন, এখানে বসুন, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন?

মাধুরীকে যতটা সুন্দরী ও স্বাস্থ্যবতী দেখবে আশা করেছিল, পদ্মর সে আশা মিটল না। চোখ-মুখের গড়ন যতটা নিখুঁত হোক, শহরের মেয়ে যখন, গায়ের রঙটা আরও চকৃখড়ি-চক্‌খড়ি ফর্সা হওয়া উচিত ছিল। মাধুরীর চলনে-

বলনে গরব-গুমোর ঠাট-ঠমকের আশঙ্কাটাও বাজে হয়ে গেল পদ্মর। কথা বলে বেশ ছোট ছোট ও মিষ্টি সুরে। আপনজনের মত। অনেকদিনের চেনা-জানা মানুষের মতই অভ্যর্থনা।

ষষ্ঠী বলে—তোমরা বাবু শহরের মেয়ে, খানিকটা ভয়-ডরও—

পদ্মর চিমটি খেয়ে ষষ্ঠী চুপ করে। পদ্মই বেশি কথা বলে তার পর। মাধুরীকে কথার জবাব দিতে হয় না। তার ঠাকুরঝি অর্থাৎ সাধনের অবিবাহিতা বোন আঙুরই জিজ্ঞাসার আগে জবাব দেয়। বৌদির বিষয়-সম্পত্তি গয়না-গাটি উপহারের জিনিস ইত্যাদিতে যেন আঙুরেরও ভোগ-দখলের অধিকার আছে। আঙুর মেয়েটা জন্ম থেকেই চালাক চতুর। বিয়ের বয়সের দিকে দ্রুত এগিয়ে এসে শরীরের বাড়নটা যতটা দৈর্ঘ্যে ঢ্যাঙা হয়েছে, ততটা প্রস্থে পুষ্ট হয় নি। কিন্তু সব সময়েই হাসি-খুশিতে ছলাৎ ছলাৎ করছে। মাধুরীর চামড়ার সুটকেস, কাঁচের আলমারী, টিনের ট্রাঙ্ক খুলে আঙুরই সব দেখাতে শুরু করে দেয় পদ্ম আর ষষ্ঠীকে। পাটকে পাট শাড়ি সায়া ব্লাউজ, লাল ভেলভেটে মোড়া বাক্সে সোনার গয়না, রূপোর হরেক রকম ডিজাইনের সিঁদুর কৌটা, তেল, আলতা, স্নো, সাবান, সেণ্ট, পাউডার, খাতা, বই, কলম, এমন কি আয়না, চিরুনি, মাথার কাঁটা, যাবতীয় যা-কিছু মাধুরীর মেয়েলী জীবন-যাপনের সম্পদ সবই একে একে দেখায়।

পদ্ম নজর বড় করে সব দেখে, দেখতে দেখতেই প্রশ্ন করে মাধুরীকে।

এটি বুঝি বাপের বাড়ীর দেওয়া শাড়ি? বাপ মা আছে ত? ভাই বোন কটি? আর সব বোনেদের বুঝি বিয়ে হয়ে গেছে? মাথায় টিকলি দেয় নি? দেয়ালের ছবির সেলাইগুলি নিজের তৈরি বুঝি? রাধাকিষ্টোর মূর্তিটা ভালই হয়েছে ত। আমাদের উসব সেলাই-মেলাই জানা-শেখা নেই। গ্রামের ভেতরে বোনাবুনির কাজ জানে একজনই। সে সুখদা। খুব দরের সব আসন বুনেছে চটের উপর পাড়ের রঙ-বেরঙের সুতো দিয়ে। দেখে চোখ জুড়োবার মত। মাথায় কাঁটার গায়ে ফুল কুঁড়ির মত ঐগুলো আবার কি? গলার হারটা কিন্তু আর একটু ভারী হওয়া উচিত ছিল। ছাপানো শাড়িটা দেখি।

মনের আশা মিটিয়ে সব কিছু দেখা-শোনার পাট চুকিয়ে পদ্ম বলে—এবার উঠি গো বৌমা। আর একদিন আসবো অবসর মত।

মাধুরী লজ্জা-সজ্জা হেসে বলে—ছেলেপুলেকে ঘুম পাড়িয়ে এসেছেন বুঝি? এত তাড়া কেন, বসুন না।

পদ্ম দ্বিগুণ হেসে জবাব দেয়—হায় পোড়া কপাল! সে সুখ বরাতে হয় নি।
ফেরার মুখে গোসাঁই-গিন্নী পথ আটকায় পদ্ম আর ষষ্ঠীর। মুখে একটা দোক্তা মেশানো পানের খিলি পুরে একটু চিবিয়ে তার প্রথম পিকটা উঠোনের কোণে ধুলো-ময়লা ঝাঁটানো আনাজ-পাতির জঞ্জালের ওপর ফেলে জিজ্ঞেস করে—আলো, চলে যাস যে তোরা। আমার বৌকে কেমন দেখলি সেটা বলে যা। এ আমার ছেলের নিজের পছন্দ-করা বৌ। বাপ-মায়ের দেখে শুনে ঘেঁটে-বেছে বিয়ে-দেওয়ানো যেমন-তেমন বৌ নয় বাছা।
খোঁচা-খোঁচা কথা। পদ্ম ভাবে—এটা ঠিক মনের জ্বালার কথা। বৌকে ঠেস দিয়ে বলা হচ্ছে।
কেন গো গোসাঁই মা, বেশ ত হয়েছে বাবু তোমার বৌটি। ধীর, ঠাণ্ডা, লাজুক-লাজুক। শহরের মেয়ে বলে বুঝবার জো নেই। সাধনের কিন্তু যাই বল, পছন্দ আছে নজরের।
গোসাঁই-গিন্নী বলে—একটা পান খেয়ে যা লো তোরা।
পদ্মরা চলে আসার পর গোসাঁই-গিন্নী মাধুরীকে উপলক্ষ করে আঙুরকে ধমক দেন।
খবর্দার, একেবারে ঘরের ভেতরে ডেকে ওদের বসতে-টসতে দিওনি। দেখতে-শুনতে এসেছে, বাইরে বসিয়েই কথাবর্তা কওনা। চাষা-ভুষোর ঘরের মানুষ। পাঁচটা দেখতে দেখতে তোমরা যেই অন্যমনস্ক হলে অমনি একটা যদি পেট-কাপড়ে লুকিয়ে নেয়! ঐ রকমই ওদের স্বভাব-ধর্ম।
পদ্মরা চলে যাওয়ার পরেও অনেকক্ষণ মাধুরীর মুখে একটু লজ্জা বা বেদনা লেগে থাকে। একজন সন্তানহীনাকে সন্তানের অভাব স্মরণ করিয়ে দেওয়ার অপরাধের জন্যে। আঙুরকে সে মা না-হওয়ার কারণ কি জিজ্ঞেস করে। আঙুর জবাব দেয়—তুমি বোকা নাকি গো, বাঁজা মেয়েদের ছেলে হয় না এও জান না?
মাধুরী আরও লজ্জা পায়। মেয়েরা বাঁজা হয় এ-রকম একটা অস্পষ্ট জ্ঞান তার থাকলেও, এমন ধারণা কোনদিনও ছিল না যে একটি নারী চিরকালই বাঁজা থেকে যাবে। আঙুর পাকামী করে আবার খোঁচা দেয়—এও আবার জিজ্ঞেস করে কেউ?
আমি ভেবেছিলুম অন্য কিছু। এমন ত হয়, ইচ্ছে করেই অনেকে ছেলেমেয়ে বন্ধ রাখে।

আঙুর যেন গাছ থেকে পড়ে। যেন সূর্য পশ্চিম দিকে ওঠার খবর শুনল সে। তাই কখনো হয়?

মাধুরী তাকে ভাসা-ভাসা কিছু জানায়। এটা যে সম্ভব এইটুকুই বলে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির দিকে জোর দিয়ে কথা বলে। বাকী অনেক কথা চেপে রাখে নিজের মনে। আঙুরকে এসব ব্যাপারে নিতান্ত গেঁয়ো অপরিণত মনের মেয়ে ভেবে। আঙুর শুনলে হয়তো দম আটকে মারা পড়বে যে শহরে তার চেনা-জানা একজনের বিয়ের দশ বছরের মধ্যে সন্তান জন্মানোর মত ঘটনা ঘটে নি। দৈব কারণে নয়। ওষুধের প্রক্রিয়ায়। আর আঙুর হয়তো কেঁদেই ফেলবে যদি শোনে সাধন ও তার মধ্যে বিয়ের আগে থেকেই বোঝা-পড়া হয়ে গেছে, দুতিন বছরের মধ্যে ছেলেপুলে হওয়া চলবে না।

পদ্ম রাস্তায় নেমে ষষ্ঠীকে বলে— এই নিয়ে এত বিভ্রাট। দশ মুখে দশ কথা। কি এমন বৌ বাবা! মোদের সুখদাকে যদি রোজ সাবান মাখিয়ে স্নো পাউডারে মাজা-ঘষা করা যায়, সেও অমন সুন্দর দেখাবে।

ষষ্ঠী চালাকের মত উত্তর দেয়—রূপ নিয়ে ত কথা উঠে নি।

তবে।

পাঁচজনে যে পাঁচ কথা বলে যেত সাধনের ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাবার জন্যে।

বাড়ীতে মাথা গলানোর সঙ্গে সঙ্গেই মাথাটা যেন ঘুরে যায় পদ্মর। ভূত দেখে যত না চমকাতো, ঘরের চেনা মানুষকে ঘরে শুয়ে থাকতে দেখে তার চেয়ে বেশি চমকাল সে।

রজনীর ফিরে আসাটা সে মনে মনে সত্যিই বহুবার প্রার্থনা করেছে। অন্তরের আকুতি দিয়েই করেছে। কিন্তু সেটা যে সত্যি হবে এমন ভাবনা ভাবে নি। রজনীকে ঘরে নাক ডাকিয়ে ঘুমোতে দেখে পদ্ম ভয়ংকর রকমের অবাক হয়ে যায়। রজনীকে ভাল করে দেখার আগেই শাশুড়ীকে আর বড় জাকে বোকার মত প্রশ্ন করে।

ঠকুরপো কখন ফিরল, হ্যাঁ মা? কিছু অসুখ-বিসুখ হল নাকি? ফিরে এসে কিছু খেয়েছে, বড়দি? হাঁড়ি ত শুকনো। তাহলে?

সুভদ্রা বলে—বিদেশ-বিভুঁয়ে গিয়ে আবার বুঝি কুস্থ কাণ্ড বাধিয়ে এল। তুই একবার ডেকে-ডুকে খোঁজ নে ত মেজবৌ।

রজনীর পাশে বসে তার চেহারার দুর্গতি দেখে পদ্ম একই সঙ্গে মানুষটার প্রতি বিরক্ত হয়, আবার মমতা বোধ করে। শুকিয়ে অর্ধেক হয়ে

গেছে তাজা শরীরটা। চোখের কোণে কালি। গালে মুখে গোঁফ-দাড়ির চুল।

পদ্ম আস্তে ঠেলা দেয় কয়েকবার। রজনী পাশ ফিরে শোয় আরও আরামের ভঙ্গীতে। একটা হাত পদ্মর কোলের ওপর এসে পড়ে। পদ্ম হাতটা সরিয়ে দেয় না।

ক্রমশ জোরে জোরে ঠেলা খেয়ে রজনীর মুখ থেকে ঘুমের জড়তা মাখানো একটা অস্পষ্ট গোঙানী গোছের সাড়া পেয়ে পদ্ম বলে—কুম্ভকর্ণের মত ঘুমোচ্ছ এই সোনধে বেলা। বেলা যে গড়ি গেল। ওঠো গো। ওঠো, ও ঠাকুর-পো, ঠাকুর…

পদ্মর গলার শব্দ আর হাতের গরম স্পর্শে ঘুমে অচেতন শরীরের স্নায়ুগ্রন্থী-গুলোর ঝিমোনো জড়তা কাটতে কাটতে রজনী চোখ তুলে তাকায়।

মেজকী ?

হ্যাঁ গ। বেশ মানুষটা বটে। যেমন ধারা মানুষ, তার তেমন ধারা কাণ্ড। বলি, গেলে এত সাতকাণ্ড ঘটিয়ে। আবার ফিরে এলে কিসের জন্যে? নাও ওঠো, হাত মুখে জল দিয়ে কিছু পেটে পুরো দিকনি। সকাল থেকে পেটে পড়েছে কিছু ?

রজনী খেতে বসলে পদ্ম পাশে বসে নানান প্রশ্ন করে রজনীকে। রজনীর ফিরে আসার আসল কারণটা কথাচ্ছলে জেনে নেবার আগ্রহটা তার যেন আর সকলের চেয়ে অনেক বেশি

রজনী কোন জবাব দেয় না। আসল কথাকে পাশ কাটিয়ে যায়। জবাব দেবার মত উত্তরই বা আছে কি ?

হ্যাঁ আছে, একটা উত্তর আছে। কিন্তু সেটা পদ্মকে নয়, চারুকে দেবার জবাব। চারুকে রজনী স্থায়ী সুখের কথা বলেছিল। কিন্তু রজনী নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে আজ জেনেছে পৃথিবীতে স্থায়ী সুখ বলে কোন সুখ নেই।

পদ্মকে সমস্ত ঘটনাটা বুঝিয়ে বলার মত কোন কথাই মগজে আসছে না। সে যদি বলে—জীবনের গতিটা পাল্টে গেছে তার, যদি বলে নিজের সুখ-দুঃখ ছাড়া, নিজের গ্রামের এতটুকু গণ্ডীর মানুষগুলোকে ছাড়া আরও অনেক মানুষের সুখ-দুঃখ আপদ-বিপদের অংশীদার হবার মত চেতনা আপাতত কাবু করেছে তাকে, তাহলে কি পদ্ম ভাববে না যে মাথার গণ্ডগোল হয়েছে রজনীর ?

গণ্ডগোল খানিকটা হয়েছে সত্যিই। কিন্তু সেটা পদ্মর হিসেবের গণ্ডগোল নয়। পৃথিবীতে আরও যত মানুষ আছে, তাদের জীবন, তাদের মরা-বাঁচার ভাল-মন্দের হিসেব কষতে গিয়ে যে গণ্ডগোলে মাথা ফাটিয়ে মানুষ মরে।

পেট-জোড়া খিদের টানে জামবাটি ভর্তি গুড় মুড়ি চেটে-পুটে খেয়ে রজনী ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়।

তখন সন্ধ্যে। ভূষণ বাড়ীতেই ছিল। গলা খাঁকারী দিয়ে রজনী তার উঠোনে ঢুকল। রজনীকে দেখে ভূষণ অবাক হয়। বসবার জন্যে পিঁড়েটা এগিয়ে দিয়ে বলে—আরে রজনী, তুই কখন এলি? বোস, বোস।

রজনী বলে—না গ বসব নি। তুমি বরং বাইরে এসো। একটা কথা আছে।

ভূষণ বাইরে আসে। কিন্তু রজনী ঠিক কিভাবে তার নিজের কথা শুরু করবে ভাবতে পারে না।

তোমার জমির কিছু হেস্ত-নেস্ত হল?

না রে বাপু। ছোটবাবুর কাছে ত যাচ্ছি কদিন। দেখা-সাক্ষাৎ হয় নি। উদিকের গ্রামে ঐ গোপীবল্লভপুরেও নাকি সব গণ্ডগোল হয়েছে। মিটিঙ হচ্ছে। ছোটবাবু তাই নিয়ে ব্যস্ত। আজকে সন্ধ্যের পর যেতে বলেছে।

যাবে ত?

হ্যাঁ, যাব-যাব করতেছিনু ত। আমি যাব। শ্রীপতি যাবে।

কে? শ্রীপতিকাকা! কেন? তার কি হল আবার?

ও, তুই বুঝি সে খবর জানু নি? ইদিকে যে আরও এক কাণ্ড হয়েছে শ্রীপতিরও জমি ছাড়িয়ে নিয়েছে।

তার মানে? কে নিল?

ঘোষাল বাবুরা।

কেন?

কেন কিসের? তোমাকে চাষী করে আমার ক্ষয়-ক্ষেতি হচ্ছে, আমি অন্য চাষীকে দুবো। এর আর উত্তর কি।

উত্তর নেই? উত্তর যদি নেই ত ছোটবাবু কি করবে?

ছোটবাবু যদি কিছু করে দিতে পারে সেই জন্যেই ত শ্রীপতি দেখা করবে।

রজনীর বুকটা আইঢাই করে। শক্ত বাঁধের ছোট্ট হানা-র মুখে জমানো বন্যার জলের তোড় যে-ভাবে বাঁধ ফাটিয়ে দেওয়ার দুরন্ত শক্তি নিয়ে মোচড় খায়,

রজনীর বুকের মধ্যে অনেক জমানো-কথা তেমনি তোলপাড় করছিল আত্মপ্রকাশের আগ্রহে।

আমি জেলে গেছনু ভূষণকাকা।

জেলে? তুই কি জেলে গেছলু রে! কেন গেছলু?

হ্যাঁ গ। কারখানায় এসট্রাইক চলতেছিল। রাইচরণের সঙ্গে আমাকেও ধরে নিয়ে গেল। চারদিন চাররাত কাটিয়ে ছেড়ে দিল। আমি চলে এনু ভয় পেয়ে। রাইচরণ বললে—গণ্ডগোল চলবে। কলকাতা থেকে নাকি ফৌজ আসবে। লাঠি-গুলিও চলতে পারে।

ঘরের লোকজনকে বলেছু?

না। বলি নি একদম। রাইচরণের খবর শুনে মা কেঁদে-কেটে অসুখটা বাড়াবে ভেবে চেপে-চুপে আছি। পরে বলবো। আমিও যাব তোমাদের সঙ্গে।

কোথা যাবি?

ছোটবাবুর বাড়ী।

যাবার পথে কিন্তু শ্রীপতিকে ডেকে নিয়ে যেতে হবে।

চল।

শ্রীপতির বাড়ীর সামনে এসে রজনী বলে—তুমি ভিতরে গিয়ে ডেকে আনো, আমি বাইরে দাঁড়িয়ে থাকি।

কেন তোর ভিতরকে যেতে আপত্তি কি? জামাই হবার ভয়ে নাকি? আরে সে ভয় আর নেই। তুই আয় ত।

রজনীর বুকটা ছ্যাঁৎ করে ওঠে। ভয় নেই কেন? রজনীকে বাতিল করে অন্য কোন পাত্রের ব্যবস্থা এই কদিনেই পাকাপাকি হয়ে গেছে নাকি?

তুলসী ওদের বসবার জন্যে দুটো আসন পেতে দেয়। ভূষণের দিকে তাকিয়ে বলে—একটু বোস গো ভূষণকাকা, বাবা গেছে গইলে গরুকে জাবনা দিতে। তার পর রজনীর দিকে তাকিয়ে চোখ টিপে হাসে—চিনতে পার আমাকে? আমি তুলসী গো।

রজনীও মৃদু হাসে। বলে—কেন পারব নি।

বলি, নাও চিনতে পার। তুমি এখন ভারিক্কী মানুষ হয়েছ। তুমি যে কোথায় চাকরি করতে গেছলে? ফিরলে কবে?

রজনী দায়-সারা একটা জবাব দিয়েই চুপ করে যায়। তার মগজে তখন সুতো-কাটা তকলির মত বাঁই বাঁই করে ঘুরছে অন্য ভাবনা। রজনীর বিরক্ত

লাগে চারপাশের এই স্থির নড়বড়ে থমথমে আবহাওয়াটাকে। যে বাড়ীর মাথা-মানুষটার খাওয়া-পরার একমাত্র ভরসা চাষের জমিটা কদিন আগে হাতছাড়া হয়েছে—এটা যেন তার বাড়ীর .আবহাওয়া নয়। গোটা সংসারটা কতখানি অভাবের মুখে এগিয়ে এল। তবু তার জন্যে কোথাও ক্ষোভ নেই, রাগ নেই, জ্বালা-যন্ত্রণার তাড়না নেই। তুলসীর গোল বাতাবী ধরনের মুখটা কুঁচকে ঝুনো নারকেলের মত হয়ে গেলে রজনী বরং বেশী খুশি হতো।

ওদিকের রান্নাশালে চাপা গলার হাসি-ঠাট্টা বা কথাবার্তার টুকরো শব্দ আসছে। মরা উনোনে শুকনো নারকেল পাতা গুঁজে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আগুনটা দপ্‌দপ করে জ্বলে উঠছে এক একবার।

রজনী ঠিক যেন ঐ রকম আগুনই জ্বলতে দেখেছে মানুষের বুকের মধ্যে। একটা মজুরকে গায়ের জোরে ছাঁটাই করার জন্যে রাইচরণদের সারা কারখানায় ধর্মঘট। রাইচরণ বলেছিল—এই ধর্মঘট দু-চারদিনের মধ্যে না মিটলে পাশের কারখানাতেও ধর্মঘট হবে। একটা মজুরকে যুক্তিহীন অপমানজনক শাস্তি দেবার অপমানটা যেন যেখানে যত মজুর আছে, মজুর-দরদী আছে, সকলের। শুনতে শুনতে রজনীর রক্তেও আগুনের আঁচ লেগেছিল।

অথচ রজনীর এই নিজের গ্রামে, পাশাপাশি আরও পাঁচটা গ্রামের এলাকা-এক্তিয়ারের মধ্যে কত অপমানজনক ঘটনাই না ঘটে। মালিক বা মহাজনের হাতের চড়-চাপড়, পায়ের লাথি কিংবা জুতোয় দু-ঘা পিটিয়ে দেওয়াকে চাষী মানুষেরা ধর্তব্যের মধ্যেই আনে না।

রজনী বুঝতে পারে না চাষী এবং মজুরের মধ্যে এমন তফাতটা কি করে ঘটে। রাইচরণও ত চাষীর ছেলে। মজুর হতে না হতেই তার রক্তে এত তেজ যোগাল কে ? অভাবকে মেনেও অপমানকে না-মানার তেজ ?

শ্রীপতি গোয়ালের গরুর জাবনার ব্যবস্থা করে ফিরে এসে রজনীকে দেখে থ' বনে যায়। রজনীও কম অবাক হয় না শ্রীপতির ভোঁতা ভোঁতা মুখখানার উদাস ধরণ-ধারণে। বাড়ীর মেয়েমানুষগুলো না হয় হাবা-গোবা। কিন্তু শ্রীপতি, যার পেট চালানোর মাটিটা সরে গেছে পায়ের তলা থেকে, তার কি উচিত এমন মরা, সেঁতানো-মিয়োনো জবু-থবু হয়ে থাকা ?

শ্রীপতি তামাক সেজে আনে। ভূষণও তামাক খায়। কল্কের মুখে দমকা দমকা ধোঁয়া কাটে।

রজনী কারখানা এলাকায় গিয়ে কলের চিমনীর ধোঁয়া উগরোনো দেখেছে।

দেখেছে রাশিকৃত মানুষের জীবন, পরিশ্রম, ঘাম, কথা, কলরব, কারখানার গমগমানি, কলের চাকা, গাড়ির চাকা, যন্ত্রের হুঙ্কার সব কিছুর যোগাযোগে জীবনের গতিটা ওখানে যেন ভীষণ রকম দ্রুত। জীবনের সেই দ্রুতগতির সঙ্গে পাল্লা দিয়েই যেন চিমনীর কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলীও অক্লান্ত গতিতে উদয়াস্ত খেটে চলেছে কারখানারই কোন গুরুতর প্রয়োজনে।

আর এখানে দীর্ঘশ্বাসের মত হুঁকোর ভুড়ুক ভুড়ুক টান আর শীতকালের মল-মূত্র পেচ্ছাব-পায়খানা অথবা মুখের হাঁ থেকে যেমন ধোঁয়া কাটে—তেমনি কল্কের ধোঁয়া।

রজনী লক্ষ্য করে ভূষণের কপালে অনেকগুলো সরু ভাঁজ। যেন রজনীর এই আকস্মিক আগমনের দুর্ভাবনায় সেটা ফুটে উঠেছে। রজনীর মনে আরও একটা খট্‌কা লাগে। সুখদার সঙ্গে তার বিয়ের প্রসঙ্গটাকে নিয়ে মেয়েলী কৌতুক-কোলাহল শুরু হবার ভয়েই শ্রীপতির বাড়ীর ভেতরে আসতে গররাজী হয়েছিল সে। অথচ তা নিয়ে কেউ কোন ইঙ্গিতটুকুও করল না। গ্রামের মানুষের প্রাণহীনতার স্বপক্ষে রজনীর অন্তরের বিক্ষোভ যেন এই কারণে আরও বেশী তীব্র হল।

সুখদার প্রতি তার বিশেষ কোন আকর্ষণ নেই। তবু যেন সুখদাকে কেন্দ্র করে তার সম্পর্কে কিছু কথা-কৌতুক রজনীর পাওনা ছিল। চাষীর ঘরেও তো এমন ঘটনা নিয়তই ঘটে থাকে যে স্ত্রী হবার জন্যে মনোনীত পাত্রীকে স্বামী হবার জন্যে মনোনীত পাত্রের আশেপাশে চোখের নাগালের ভেতরে চলতে ফিরতে, ফিক্ করে হেসে লজ্জায় সরে যেতে, লজ্জায় আড়ষ্ট মুখের কেন্দ্রস্থলের দুটি নম্র চোখ থেকে বাঁকা চাউনির বিদ্যুৎ ও বেদনা ছড়াতে, মাথার আঁচল কিংবা বুকের বসন হঠাৎ খসে পড়ার মুহূর্তে পঞ্চবটী বনের মায়াবী হরিণের মত অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার নিপুণ অভিনয় দেখাতে বাড়ীর মা-দিদি-বৌদিরা জেনে-শুনেই সুযোগ ঘটিয়ে দিয়েছে। ভূষণের সামান্য ইঙ্গিত আর শ্রীপতির গোটা সংসারের ভীষণ-রকম নির্জীবতা রজনীর মনের মধ্যে একটা বেহিসেবী গোলমাল ঘটায়।

পথে বেরিয়ে রজনী গম্ভীর হয়ে থাকে। শ্রীপতির স্বভাবটাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করেও রজনী যে তার সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাতে চলেছে সেটা শ্রীপতির প্রতি বিশেষ কোন অনুরাগে নয়। শ্রীপতির বদলে অন্য যে কোন লোকের দিকেই সে এমন উৎসাহী আগ্রহী হতে পারত, যদি শ্রীপতির মত তারও ভরণ-পোষণের

একমাত্র নির্ভর চাষের জমি হাতছাড়া করে নিত জমির মালিক। ভূষণ ও শ্রীপতি কথা বলে। রজনী শোনে কেবল।

দেখ বাবু, মালি-মকদ্দমায় যেন জড়াতে যেওনি মোকে।

আগে থেকেই মালি-মকদ্দমার কথা ভেবে ভড়কাচ্ছ কেন?

জানু ভূষণ, উসব ভাগ্যের দোষ। লক্ষ্মী কখনো কি অচলা থাকে কারুর ঘরে। বাবুদের সাথে আর উ জমি-জমা নিয়ে ঝগড়া-বিবাদে যাব নি। জমিটা গেছে, তা বলে ত আর সম্পর্ক যায় নি। বাবু ত আর জমিটা কেড়ে নেয় নি গ মোর কাছ থেকে। মোকে বলে কয়েই নিয়েছে। ভাল রকম ফসল ফলতেছে নি ক বছর। তেজ-মন্দা হয়েছে মাটিতে। সার-খত ফেলে উর্বরা করার কথা ভেবেছে বলেই জমিটা হাত বদল করাতে চায় বাবুরা।

তা তোমার হাতে জমিটা রেখেই কি আর সেটা হতো নি?

শ্রীপতি জবাব দেয় না।

ওরা তিনজন ছোটবাবুর ঘরের দরজার সামনে পৌঁছে দেখল ছোটবাবু ছাড়া আরও কয়েকজন ভিন্ গাঁয়ের চাষীও আছে তাঁর ঘরে। মাদুরীর ওপর কাগজপত্র ছড়িয়ে সবাই ঝুঁকে পড়ে কি যেন যুক্তি-আলোচনা করছে।

রজনী এই প্রথম ঢুকল ছোটবাবুর ঘরে। ভীষণ নোংরা ঘর। চারদিকের কাগজপত্র, বিছানা-বালিশ, চেয়ার-টেবিল, ছবি-ক্যালেণ্ডারের গায়ে ধুলোর স্তর জমে আছে। সব যেন কেমন ছন্নছাড়া।

কি খবর ভূষণ? জমির ব্যাপার ত?

ছোটবাবু কাগজ থেকে মুখ তুলে তাকায় ভূষণের দিকে।

দু-দশ দিনের মধ্যে আরও দু-একজনেরও যাবে।

ভূষণের চোখ দুটো বলিদানের পাঁঠার শেষ চাউনির মত দেখায়।

আজ্ঞে, কার কার যাবে বলুন দিকি?

কার কার যাবে তা এখন জানাতে পারছি না। তবে যাবে এইটেই জেনে রেখে দাও। আর এটা ত শুধু বাথুরী গ্রামেরই একটা আলাদা ঘটনা নয়। সব গ্রামেই কৃষক এলাকাগুলোয় এই একই রকম উচ্ছেদের হিড়িক পড়ে গেছে। এই যে এরা কয়েকজন এসেছেন সাবুটি গ্রাম থেকে। এদের ওখানেও ঐ একই চক্রান্ত চলেছে।

ছোটবাবুর কথায় কোন উত্তেজনা নেই, রাগ নেই, ক্ষোভ নেই। শুধু ঠিকঠাক খাঁটি কথাকে সহজ করে বলে ফেলার ভঙ্গীটুকু ছাড়া।

চক্রান্ত! ভূষণের গলায় যেন খাঁড়ার কোপ পড়েছে একটা। উচ্চারণটা কেমন ভোঁতা-ভোঁতা, বিকৃত আর ভয়-পাওয়া হয়ে যায়।

চক্রান্ত! আজ্ঞে চক্রান্তটা কিসের?

কিসের? ভোটের সময় তোমরা যারা গ্রামের কর্তাব্যক্তিদের কথায় কান না দিয়ে ভেতরে ভেতরে উল্টো ঘোঁট পাকিয়েছিলে, তাদের শায়েস্তা করার চক্রান্ত। তাছাড়া আরও কারণ আছে। সামনে নতুন সেটেলমেণ্ট। জমির নতুন কড়চা-পত্রে ভাগচাষী স্বত্ব একবার কায়েমী হয়ে গেলে জোতদার-জমিদারদের অনেক রকম আইনের ফেরে পড়তে হবে চাষীদের সুখ-সুবিধে পাওনা-গণ্ডার দাবিতে। এখন থেকে তাই পুরনো চাষীদের উচ্ছেদ করে ভবিষ্যতের বিপদটা সামলে নেবার চেষ্টা চলেছে।

শ্রীপতির গলাও ভূষণের মত ভাঙা ভাঙা হয়ে একবার কেঁপে ওঠে।—আজ্ঞে বাবু, আমরা ত শেষ তক্ বাবুদের বলা-করা বাক্সেই ভোট দিয়েছি।

তাতে কি হয়েছে। মতি-গতির একটা পরিবর্তন ত ঘটেছে তোমাদের মধ্যে। এবারে না হয় চেপে-চুপে সামলে নিয়েছো, এর পরে ত কোনরকম বেসামাল কাণ্ড বাধিয়ে বসতে পার। সেই রোগের ওষুধের ব্যবস্থা করা হচ্ছে এখন থেকে।

তাহলে বাবু জমি-জায়গা ফিরে পাওয়ার আর কোন পথ নেই?

ছোটবাবু এতক্ষণে একবার হাসলেন। হাসলে ভারী অমায়িক দেখায় মানুষটাকে। অথচ এমনিতে কাঠ-কাঠ, পাথর-পাথর।

কেন পাওয়া যাবে না। আইনের পথ ত আছে। সে পথে চলতে পারলেই পাওয়া যাবে। দুনিয়াসুদ্ধ চাষীরা পাচ্ছে, তোমরা কি দুনিয়ার বাইরের লোক। এই ত এদের এখানে চার-পাঁচটা কেস একসঙ্গে চলেছে ভাগচাষ বোর্ডে। বোর্ডেই যে সব সময়ে জিত হবে তারও ঠিক নেই। কেন না বোর্ডগুলো বড়লোকের হাত-করা। তাদের মনের মত লোকেরাই চালায়। তখন কোর্ট আছে।

ছোটবাবু অনেক কথা বলেন। ঝানু ডাক্তারের মত। রোগীর রোগগুলো যার জানা আছে, রোগের আসানের ব্যবস্থার সঙ্গে।

ছোটবাবু, তাহলে কি আরেকদিন এসবো আমরা? আজকে ত আপনি ব্যস্ত আছেন।

হ্যাঁ, পরশু-তরশু করে। এই দুদিন ব্যস্ত থাকবো এদের কেসগুলো নিয়ে।

ওরা তিনজন উঠে দাঁড়াল। ওদের ঠিক বেরিয়ে আসার মুহূর্তে ছোটবাবু বললেন—রজনী, তুমি বাসুড়ের কারখানায় কেন গেছলে?

ওখানে আমার বড় ভগ্নীপতি কাজ করে। তার কাছে গেছনু।

জেল থেকে ছাড়া পেলে কবে?

রজনী হতভম্ব হয়ে যায়। ছোটবাবু কি জ্যোতিষী? দুনিয়ার নাড়ী-নক্ষত্রের খবর জেনে রেখেছে। বললে—কাল শেষ রাত্তে ছেড়ে দিল।

তুমি একবার দেখা করবে ত আমার সঙ্গে। কেমন?

রজনীর জীবনের লুকনো খবরটা জানাজানি হয়ে যাবে এবার। ভূষণকে রজনীর ভয় নয়। ভয় শ্রীপতিকে। এই ঘটনাটাকে সে হয়তো এমনভাবে রটাবে, লোকে ভাববে চুরি-চামারি করেই জেল খেটে এল রজনী।

শ্রীপতি সত্যিই ভয়ংকর রকম অবাক হয়ে ভূষণকে জিজ্ঞাসা করে—রজনী জেলে গেছল?

জেলে কেন যাবে? গেছল ওর ভগ্নীপতির কাছে। কি শুনলে তবে? কারখানায় ধর্মঘট চলছিল তখন। ওকেও ধরে নিয়ে গেল রাইচরণের সঙ্গে।

তিনজনে নীরবে পথ হাঁটে। ভীষণ গুমটে গাছ-পালা পশু-পক্ষীর জগতেও প্রাণের সাড়া বন্ধ হয়ে গেছে।

শ্রীপতি বলে—ভূষণ, মালি-মকদ্দমায় আমার মন নেই। কি বলতে কি হবে। বাবুদের সঙ্গে মামলা লড়ে আমরা কি টিকতে পারবো?

শ্রীপতির কথায় গা জ্বালা করে রজনীর। এরা যেন সব মরা মানুষ। মানুষ নয়। কাঠের পুতুল। রজনীর গলা আচমকা চড়ে ওঠে—কি হবে আবার! দুনিয়াসুদ্ধ লোকের যা হয় তাই হবে। তারা যদি বাঁচে ত আমরাও বাঁচবো। আইনটা ত সকলের জন্যেই। ছোটবাবু কথাটা কি বলল তাহলে?

রজনী বাকী রাস্তাটা ভূষণ আর শ্রীপতিকে কারখানায় ছাঁটাই-এর বিরুদ্ধে লড়াই জমে ওঠার কাহিনী শোনায়।

চোদ্দ

বাড়ী ফিরে রজনী পদ্মর কাছ থেকে শোনে আরেকটা কাহিনী। গরমে-গুমটে চোখের দুটো পাতা এক হয় না কিছুতে। শুধু এপাশ-ওপাশ আই-ঢাই। গরমের দিনে পদ্মর গা ঘামাচিতে ছেয়ে যায়। ঘামাচির জ্বালায় এক এক সময়

পাগল হয়ে হাতের সামনে যা পায় তাই দিয়ে গা-পিঠ ছুলে ফেলে। ঘামাচির জ্বালাটা তাতে কিছুক্ষণ উপশম হলেও গায়ের চামড়া ছুলে মৃদু মৃদু রক্তপাতের জ্বালা তাকে বাড়তি কষ্ট দেয়।

তালপাতার ছেঁড়া চাটাইয়ে খোলা উঠোনে শুয়েও ঘামে জবজবে হয়ে আর ঘামাচির জ্বালায় জ্বলতে জ্বলতে পদ্ম কিছুক্ষণ পরে উঠে বসে শোয়া ছেড়ে। ছেঁড়া একটা তালপাতার পাখায় চটপট শব্দ তুলে হাওয়া খাওয়ার চেষ্টা করে।

রজনীর চোখেও ঘুম ছিল না। সে শুয়ে ছিল তার ঘরের সামনের দাওয়ায়। পাখার শব্দে তার তন্দ্রা-ভাবটা কেটে যেতে সেও উঠে বসে।

কে গ, মেজকী ?

হ্যাঁ গ। দুর বাবু, রাত পেরোল দু-পহোর। তবু কি একটু ঘুম এল চোখে। অথচ উ মানুষটির রগড় দেখ।

পদ্ম রমণীর কথাই বলল বিদ্রূপ করে। সে যেহেতু নাক-ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছিল : কিন্তু রমণীর একার কি দোষ। আরও অনেকেই ত অকাতরে ঘুমোচ্ছে।

পদ্ম রজনীর বিছানার পাশে উঠে যায়।

খুব ভাল সময়ে এসে পড়েছ ঠাকুরপো।

কেন বল ত ?

আগো জান নি। ইদিকে যে সুখদার বিয়ের ঠিকঠাক হতে চলেছে।

কার সঙ্গে ?

ঐ যে পাড়ুইদের সুধীরের সঙ্গে। যে ছেলেটা এখন বড় রাস্তায় রিক্শা চালায়। রিক্শা চালিয়ে নাকি বেশ উপায় করে ছেলেটা।

কে ঘটকালি করল ?

ঘটকালিটা করেছে নিতাই। মোদের কুন্তিবালার ভাতার নিতাই।

হুঁ।

হুঁ কি গ, তুমি মত দিয়ে এবার বিয়েটা করে ফেল। তোমার ত পিছুটান গেছে।

পিছুটান গেছে মানে ?

শুনো নি নাকি ? আমি ভাবি বুঝি সেই খপর পেয়েই ফিরে এলে। তাই বুঝি তোমার চেহারার এমন দশা-দুর্দশা। তোমার চারুবালা ত ফিরে নি এখনও।

তার মানে ? মেজকী, কি রকম রসিকতা তোমার ?

আগো রসিকতা কি, মাইরী, তোমার গা ছুঁয়ে বলতেছি।

কি হয়েছে চারুর ?

তারকেশ্বরের উদিকে কলেরার ধুম পড়েছে না? গ্রামের যারা আগের ঝাঁকে সন্নেস করতে গেছল তারাই ফিরেছে। শেষের দল কি ফিরেছে? গোপী সাঁতের বাপ, নধর তেলির ছোট বেটা, ছোট বৌ, খুদে মল্লিকের মাগ, এরা কেউ ফিরেছে নাকি? বাড়ীতে কান্না-চোকার শুরু হয়ে গেছে শোন নি। তোমার চারুবালা ছিল ওদেরই দলে।

রজনী দাওয়ায় বসেই দেখতে পায় বেশি-রাতের আকাশে মরা জ্যোৎস্নার ফিকে আমেজটুকু। উঠোনে ধূসর ছায়া পড়েছে দেয়ালের, মাচার, কুমড়ো-ভারার। সেইখানে পাতা আছে পদ্মর বিছানা অর্থাৎ তালপাতার চাটাটা। পদ্মর শরীরটা খড়ের ভুষে কাদা মাখিয়ে গড়া প্রতিমার মত পুষ্ট। চারুও একদিন দেখতে ছিল পদ্মর মত। পদ্মর ঘামে-ভেজা শরীরের রক্ত মাংসের ঘ্রাণ রজনীর নাকে লাগছে।

পদ্ম কুট কুট করে নখের আঁচড়ে ঘামাচি মারে। রজনী সেইদিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ অনেক কিছু ভাবতে চেষ্টা করে। তার পর পদ্মকে বলে—মেজকী, যাও শুয়ে পড় দিকি।

হায় পোড়া কপাল, গরমের জ্বালায় কি আর ঘুম আসবে ?

পদ্ম হাওয়া-লাগা নরম বাঁশের কঞ্চির মত বেঁকে শরীরের আলস্য ভাঙে। রজনীর মনটা হঠাৎ একা-থাকার ইচ্ছায় অধীর হয়েছে বলেই বিরক্তি ফোটে তার কথায়। যাও না, ঘুম না পায় শুয়ে থাক চুপচাপ, আজেবাজে বোকো নি।

হ্যাগা, আজে-বাজে কি বকলাম আমি? আমি বলি আমার গরমের জ্বালায় মরার কথা।

মেজকী, গলায় ষাঁড় ঢুকেছে তোমার? এত চেঁচি-চেঁচি কথা কও কেন ?

তুমি মর গরমের জ্বালায়। আমি মরি প্রাণের জ্বালায়। যাও না, উঠো, ইখেন থেকে উঠো দিক্ নি।

প্রাণের জ্বালা! হ্যাগা, চারুবালার খপরটায় বুঝি ব্যথা পেলে। আমি বাবু না জেনে বলে ফেলেছি কথাটা।

না মেজকী, আমার মনের জ্বালাটা অন্য কারণে। তোমরা বুঝবে নি।

পদ্ম রজনীর পাশে ঘনিষ্ঠ হয়ে আসে।

কি কারণ গা! আমি বুঝবো, বল না।

রজনী পদ্মর মুখের দিকে স্পষ্ট তাকিয়ে হাসে।—ও, তুমি একদম ভারী মাতব্বর হে, সব বুঝে ফেলবে।

পদ্মর মুখের দিকে তাকাতে গিয়ে রজনীর চোখে পড়ে তার গালে ঠিক নাকের পাশে বেল কুঁড়ির মত একটা ব্রোণ পেকে আছে। রজনীর হাত দুটো নিশপিশ করে ওঠে সেটা টিপে দিতে।

বুঝি না বুঝি, তোমার বলতে কি মহাভারত উল্টে যাবে।

আর তুমি পাড়ায় পাড়ায় রটিয়ে বেড়াও। পেটে কথা থাকে তোমার ?

মাইরী বলছি ঠাকুরপো, কাউকে ঘুন্নাক্ষোরে জানাব নি।

পদ্ম রজনীর গা ছুঁয়ে দিব্যি খায়।

রজনী পদ্মকে শোনায় তার জেলে যাওয়ার কাহিনী। অবিশ্বাস্য কাহিনী শোনার মত বিস্ময়ে পদ্ম হাঁ-করে সব শোনে।

এই বাড়ীতে সকলের আগে ঘুম ভাঙে সুরেনের। ঘুম ভাঙলেই সে নারকেল পাতার আগুন জ্বালিয়ে হুঁকো ধরায়। দোতলার বারান্দায় সুরেনের ঘুম ভাঙার প্রথম গলা-খাঁকারির শব্দটা পেয়ে পদ্ম তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ল রজনীর বিছানায়। রজনী দরজা খুলে বেরিয়ে গেল বাইরে।

গ্রামের অধিকাংশ চাষী গৃহস্থেরই ভিটেমাটি আর ছোটখাট ঘাট-পুকুর ছাড়া আর তেমন খালি জায়গা থাকে না যেখানে নিত্য-নৈমিত্তিক মলমূত্র ত্যাগের একটা পাকাপাকি বন্দোবস্ত করা যায়। মেয়েরা এসব কাজ সারে বনে-বাদাড়ে, ঝোপ-ঝাড়ের আড়ালে। পুরুষরা খালের দিকে, মাঠে-ঘাটে। গ্রীষ্মকালের অনাবাদী মাঠে এসব ব্যাপারে মস্ত সুবিধে।

রজনী ঐ প্রয়োজনেই ঘর থেকে বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে মাঠের অনেকটা দূরে চলে গেল। আকাশে তখন সূর্য ওঠার আগের লাল রঙ ধরতে শুরু করেছে। হাওয়া বইছে মৃদু মৃদু। সেই হাওয়ায় রজনীর কানে ভেসে এল দূরের কোন একটা বাড়ী থেকে বিনিয়ে বিনিয়ে কান্নার স্বর। তারকেশ্বরে যারা গাজনের সন্ন্যাসী হতে গিয়ে কলেরায় মরেছে তাদেরই কোন একজনের মা-বাপ-বৌ-বোনেরই কান্না ওটা।

রজনীর মনের আভ্যন্তরীণ বিষাদটা সেই মুহূর্তে এক ভিন্ন স্তরে এসে পৌঁছল। তার মনে হল এই কান্না কোন ব্যক্তির নয়, কোন সীমাবদ্ধ পরিবেশের নয়, মানুষ ও মাটিতে মেশামেশি এই বিশ্ব পৃথিবীর অন্তর্যাতনাই যেন উর্ধ্বমুখী কান্নার রূপ নিয়ে আকাশের দিকে উত্থিত হচ্ছে।

রজনীর চোখে ভেসে উঠল চারুর সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ দিনগুলোর অল্প অল্প ভাঙাচোরা ছবি। কিন্তু চারুর জন্যে এই পৃথিবীতে কে কাঁদবে?

পনেরো

ছোটবাবু রজনীকে ডেকেছিলেন। কিন্তু সময় করে দু-তিনবার গিয়েও রজনী ছোটবাবুর দেখা পায় নি।

এই কদিনে রজনীর মনের জ্বালা আরও যেন বেড়েছে। গ্রামের মানুষের একঘেয়ে জীবনটায় একটা বড় রকমের আলোড়ন জাগিয়ে তোলার ইচ্ছেটাও প্রবল হয়েছে সেই সঙ্গে।

ছোটবাবুর দেখা না পেয়ে রজনী একদিন ভূষণের কাছে যায়।

তোমাকে একটা কাজ করতে বলি ভূষণকা।

কি বল্।

একটা গান লিখে দাও আমাকে। বেশ জব্বর গান।

কিসের জন্যে সেটা খোলসা করে বল্।

এই ধর দেশের লোককে জাগাবার জন্যে।

কিসের জন্যে জাগবে?

রজনীর চিন্তা গুলিয়ে যায় ভূষণের প্রশ্নে। এত গভীর করে কি সে ভেবেছে নাকি গানটা নিয়ে। তবু আমতা আমতা করে একটা জবাব দাঁড় করায় সে।

এই যে গ চালের দাম, ডালের দাম হুহু করে বাড়ছে, কাপড় ক্রাচিনের দাম বাড়ছে, তার পর ধর এই যে তোমাদের জমি থেকে উচ্ছেদ করার চক্রান্ত, তার পর এই যে ধর আকাশ সময়মত জল দেয় না, মাঠে হিসেব মত ফসল ফলে না, তার পর ধর যার ছেলে-পিলে না খেয়ে মরছে তার পেটে গণ্ডায় গণ্ডায় ছেলে জন্মাচ্ছে, আর যার বুক ফেটে যাচ্ছে ছেলে-ছেলে করে তার আশা মিটছে নি, এইসব দুঃখ কষ্ট ত আছে গ মানুষের জীবনে। এইসব নিয়ে একটা গান।

ভূষণ তার হুঁকোয় একসঙ্গে কয়েকটা টান দিয়ে একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে একটু হাসে।

তোর মাথাটা সত্যি বিগড়ে গেছে রে রজো। বেশ বললু তুই বটে। এর মাথা ওর ধড়ে। ওর মাথা এর গদ্দানে।

কেন ?

চালের দাম, ডালের দাম, কাপড়-ক্রাচিনের দাম বাড়াচ্ছে সরকার। জমি থেকে উচ্ছেদ করতেছে গ্রামের জমিদার। আর আকাশে জল নেই, মাটিতে ফসল নেই, মানুষ আশা করেও পেটে ছেলে পায় নি, এটা হচ্ছে ভগবানের ইচ্ছেয়। তা তুই একবারে তিনটেকে এক সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেছু।

রজনী বোকার মত তাকিয়ে থাকে। মনের ভাবনা-চিন্তাগুলোকে সে কিছুতেই ছয়ে অন্যের কাছে প্রকাশ করতে পারছে না।

রজনীর গান লেখানো হয় না। অথচ সে খবর পায় অন্যদের গান-বাঁধার।

গদাই বেঁধেছে লেখাপড়া-শেখা মেয়েকে বিয়ে করে সংসার করার বিপদের গান। বোঝা যায় সাধনের বৌ মাধুরী শহরের মেয়ে বলে ভদ্রঘরের মানুষদের মনের মধ্যে যে ঈর্ষাটা ক্রমশ বেড়ে ক্ষোভ হয়ে উঠেছে, সেটাই প্রভাবিত করেছে গদাইকে। নইলে এটা ত গদাইয়ের জীবনের সমস্যা নয়।

আরেকটা গান বেঁধেছে শ্রীকান্ত। ভোটের মিটিং-এর সময় কলকাতা থেকে বড় বড় বক্তা এসেছিলেন গাড়ি চেপে। তারা বলেছিলেন—সরকার ত ফসল বাড়াচ্ছে প্রতি বছর। কিন্তু মানুষের সংসারে এত বেশি ছেলে জন্মাচ্ছে বছর বছর যে তার ফলে সামলে-ওঠা যাচ্ছে না। ছেলে হওয়া কমাতে হবে। শ্রীকান্তের গানটা সেই বক্তাদের নিয়ে নয়। যাঁরা সেই বক্তাদের আনিয়ে গরীব চাষী-ভূষি মানুষকে জ্ঞানের কথা, উপদেশের কথা শোনাবার সুযোগ সুবিধে করে দিয়েছিলেন, সেই সব স্থানীয় কর্তাব্যক্তিদের নিয়ে। তাঁদেরই যে গণ্ডায় গণ্ডায় ছেলে সেই ত্রুটিটা ধরিয়ে দেওয়ার জন্যেই গান বেঁধেছে শ্রীকান্ত।

ওদিকে পুরোদমে চলেছে যাত্রার আখড়াই। যাত্রার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে একটা গ্রাম্য প্রহসন। গ্রামের ঘটনা নিয়ে নিজেরাই বানিয়েছে। প্রতি বছরই এইভাবে গ্রামের সারা বছরের সেরা ঘটনাকে নিয়ে প্রহসন বানানো হয়। এ বছরের প্রহসনে জমিদার বংশের মুখে কালি পড়বে খানিকটা। কাণ্ডটা সত্যি সত্যিই বাধিয়েছিল তাদের বংশেরই একজন হোমরা-চোমরা বাবু। ঘটনাটা এ পর্যন্ত দু'দশ জনে জানে। এবার জানবে শয়ে শয়ে। বিধবার গর্ভে ছেলে হওয়ার ঘটনা আর জাল নোটের ব্যবসা চালানো দুটোকে একসঙ্গে জুড়েই বানানো হয়েছে প্রহসনটা। কোন একজন বিশেষ লোকের লেখা নয়। দশজনের রাগ, ক্ষোভ, জ্বালা, বিদ্বেষ, দশজনের হাসি, ঠাট্টার সমষ্টিগত সংমিশ্রণেই গড়ে উঠেছে এই সরস প্রহসনটি।

গাজনের উৎসবকে কেন্দ্র করে সারা গ্রামের এই প্রাণ-চাঞ্চল্যকে বেশ ভাল লাগে রজনীর। বেশ জীয়ন্ত-জীয়ন্ত মনে হয় মানুষ-জনকে। যদিও নেশার মাত্রাটাও এই সময়ে বাড়ে বেশি।

একদিন বেপরোয়া রকম মাত্রা চড়িয়ে নেশা করে বসল রজনী। নেশার ঘোরে তার স্বাভাবিক চেতনার রাজ্যে একটা বড় গোছের ওলট-পালট ঘটে যাওয়ার ফলেই রজনী একই সঙ্গে অনুভব করে নিজের জীবনের প্রতি বিক্ষোভ আর মৃত চারুর প্রতি মমতা।

চারুরা সত্যিই মারা গেছে কিনা সে বিষয়ে রজনী বা গ্রামের অন্যান্য মানুষের মনে সন্দেহ আছে। চারু তারকেশ্বরে গেছল দ্বিতীয় দলের সঙ্গে। তাদেরও কেউই ফেরে নি। তারা সকলেই যে মারা গেছে এ-কথা ভাবতে অন্যান্যদের মত রজনীরও ভারী অবিশ্বাস্য ঠেকে। কিন্তু একা চারুর জীবনের বেলায় এই নিষ্করুণ পরিণামটিকে সত্যি ভাবতে পেরে স্বস্তি অনুভব করে সে।

সন্ধ্যের অন্ধকারে সে এগিয়ে যায় চারুর ভিটের দিকে। বাইরের দরজা আলগা। ভেতরের ঘরে তালা। উঠোনের মাচার কাছে বাঁশে আটকিয়ে একটা লাল গামছা পত্‌পত্‌ করে উড়ছে। চারদিক খাঁখাঁ। শুধু মাঝে মাঝে গামছাটা হাওয়ায় বেশি ফুলে উঠলে পাখীর ডানা ঝাপটানোর মত শব্দ ওঠে।

মানুষের গলায় শিস্‌ টানার মত শব্দও আসে। রজনী এদিক ওদিক সতর্ক চোখে তাকায়। কিন্তু মানুষের দেখা পায় না। দাওয়ায় উঠে সে বুঝতে পারে মনের ভুলটা। শব্দটা করছে মানুষ নয়। গামছা নয়। খাঁচার দাঁড়ে শিকলে বাঁধা চারুর পোষা ময়নাটা।

রজনী নেশার ঘোরে ভুল করে দাঁড়ের ময়নাটাকে মানুষ ভেবে তার সঙ্গেই কথা শুরু করে দেয়। পা দুটো তার এত টলমল করে আর পিঠের শক্ত মেরুদণ্ডটা এত শ্লথ হয়ে আসে যে আর দাঁড়াতে না পেরে খাঁচার নীচে বসে পড়ে সে।

হাই রে, তোকে ফেলে রেখে চলে গেছে? আয় শালা, তোকেও আকাশে উড়ি দি। আকাশের পাখী আকাশে যা।

পাখীটা রজনীর সাড়া পেয়ে কর্কশ গলায় আর্তনাদের মত চীৎকার করে।

কিরে, ভয় পেলি? নারে না, আমি তোর চারুবালা নই। চারুবালার সঙ্গে তুই কদ্দিন আছু? ধর দশ বছর। কি আট বছর। তুই ত পাখী, তোর আট বছরও যা আর আট দিনও তাই। আমাকে ভালবেসেছিল

তোর চারুবালা পাঁচবছর। আমার মনের কষ্ট-হাহাকারের তুই কি বুঝবি বল্ যে তোকে বলবো? চারুবালা সাবাড় হয়েছে। তুই আর কেন সাবাড় হবি? আয় তোকে আকাশে উড়ি দি। বিশ্ব চরাচরে উড়ে বেড়া।

রজনী উঠে দাঁড়ায়।

পাখীটা কিন্তু রজনীর নড়া-চড়া দেখে আরও ছটফট করে। ডানার পালক থর-থর করে কাঁপে।

কি রে উড়তে বুঝি সাধ নেই তোর? তবে এই খাঁচার মধ্যে সাবাড় হ।

দরজার কাছ থেকে মেয়েলী গলার সাড়া আসে।—কে কথা কয় গা ভিতরে?

আমি।

তুমি কে গা?

আমি রজনী।

নেশার ঘোরে মেয়েলী গলার আওয়াজ পেয়ে রজনী ভেবেছিল চারুর কথা। চারু যে মরে গেছে সেটা ঠিকমত মনে পড়ার পর সে ছাখে তারিণী মণ্ডলের মেয়েটা এসে দাঁড়িয়েছে তার সামনে।

তুমি ইখেনে কি করতেছ গা রজনীদা?

আর বলু কেন, ই শালার পাখীটা দাঁড়ে বসে না খেয়ে শুকিয়ে মরবে, তবু আকাশে উড়বে নি। আকাশে উড়ি দেবার কথা বললে কেমন চীৎকার করে দেখেতেছু।

তারিণী মণ্ডলের বাড়নসার মেয়ে খাঁদি রজনীর কথায় খিলখিলিয়ে হাসে।

আমাকে দিবে পাখীটা? ও রজনীদা—

তুই কি করবি? পুষবি! নিয়ে যা না। নিয়ে যা।

রজনী খাঁদিকে খাঁচাটা ধরতে বলে। আস্তে আস্তে পায়ের তলা থেকে সরু শিকলের বাঁধনটা খুলে দু'হাতের মুঠোয় পাখীটাকে চেপে ধরে। খাঁদির হাতে তুলে দেবার সময় বলে—সাবধানে ধরবি কিন্তু।

খাঁদি দুটো হাতের মুঠোয় বুকের কাছে পাখীটাকে চেপে ধরে। কিন্তু তার ডানার ঝটপটানিতে খাঁদির গা বুক শিরশির করার সঙ্গে সঙ্গে হাতের বাঁধন আলগা হয়ে গিয়ে পাখীটা উড়ে যায়।

পাখীটাকে ধরবার জন্যে হাত বাড়িয়ে রজনী খাঁদিকেই জড়িয়ে ধরে। খাঁদিকে তার মনে হয় পদ্ম। রজনী বলে—হাই মেজকী, দিলে পাখীটাকে উড়িয়ে। তোমার ছেলে-পুলে নেই। বেশ ত থাকতে একটা পাখী পুষে।

খাঁদি রগড় দেখে খিলখিলিয়ে হেসে পাখীর মতই উড়ে যায়।

রজনী একা অন্ধকারে দাঁড়িয়ে খাঁদির দৌড়ে পালানোর শব্দে অস্বাভাবিক রকম হতভম্ব হয়ে যায়।

শালার পাখীর আস্পর্ধা দেখ। আকাশে উড়বে।

যেদিন সন্ধ্যায় এই ঘটনাটি ঘটল তার পরের দিনই সদলবলে ফিরে এল চারু। দ্বিতীয় দলের কেউই মরে নি। প্রথম দলেরও মৃত কয়েকজন জীবিত হয়ে ফিরে এসেছে। ওদের ফিরে আসতে দেরি হওয়ার কারণটি ছিল মৃতদের সৎকার ইত্যাদি ব্যাপারের দায়িত্ব সামলানো। আরেকটি বিষয় লক্ষ্য করার মত। মৃতদের মধ্যে মহিলাদের সংখ্যাই বেশি।

গ্রামের অনেক শোকাতুর সংসারেই জীবনের এই পুনরাবির্ভাবে বেদনামণ্ডিত উল্লাসধ্বনি ও শান্তি প্রবাহিত হল।

চারুর প্রত্যাবর্তনে রজনীর অন্তরেও সমজাতীয় নিরাপদ শান্তি প্রবাহিত হওয়ার কথা। কিন্তু এই ব্যাপারে তার অদ্ভুত নির্লিপ্তি লক্ষ্য করা গেল।

রজনী কি চারুর মৃত্যু চায়? তা নয়। মৃত্যু শব্দটি বা মৃত্যু শব্দের অন্তর্নিহিত অনুভবটি জীবিত ব্যক্তি মাত্রের কাছেই অসম্ভব বেদনাতুর। রজনী জীবিত মানুষ বলেই মনুষ্যোচিত এই মানবিক অনুভবটি তার সম্পর্কেও প্রযোজ্য।

কিন্তু চারুর প্রত্যাগমনে রজনীর চিন্তা-জগতে রূপান্তর ঘটল অন্যরকম। চারুর প্রতি একরকম অস্বাভাবিক মমতার বশেই রজনী আকাঙ্ক্ষা করেছিল এই নগ্ন ও নগণ্য জীবনযাত্রা থেকে চারুর জীবন অব্যাহতি পাক।

চারুর জীবন মৃত্যুর আঁধারে বিলীন হয় নি, এর জন্যে রজনী আনন্দিত। কিন্তু জীবনকে উপভোগ করার মত কোন উপকরণ বা ঐশ্বর্য চারুর অবশিষ্ট নেই বলেই সে আনন্দকে চাপা দিয়ে রজনীর অন্তর ব্যথিত হয়।

এ-সব সত্ত্বেও গাজনের উৎসব চলাকালীন কয়েকদিন চারুর সঙ্গে রজনীর দেখা সাক্ষাৎ ঘটে গেল। তবে ভাল করে কথা বলার সুযোগ-সুবিধে ঘটে নি। চারু রজনীকে ডেকেছিল। রজনী বলেছিল—গাজনের ঝামেলা চুকলে যাবে।

গাজনের উৎসবের শেষ দিনগুলোয় রজনী সঙ সেজে নেচে গেয়ে, এবং নেশার মাত্রাটা চড়িয়ে দিয়ে অফুরন্ত চাঞ্চল্য ও উন্মাদনায় ডুবে রইল।

ষোল

সপ্তাহব্যাপী গাজনের উত্তেজনা স্তব্ধ হবার পর বাখুরীর জীবনযাত্রার অভ্যন্তরে একটা নিশ্চল অসাড় স্থবিরতা নেমে এল। দীর্ঘ ও কঠোর পরিশ্রমের পর স্বাভাবিক অবসাদের মত।

নতুন বছর এসে গেছে। আজ বৈশাখের চার কিংবা পাঁচ তারিখ। খুব হিসেবী মানুষ ছাড়া এখনও অনেকে সাল লিখতে গিয়ে প্রথম ঝোঁকে গত সালের অঙ্কটাই লিখে বসছে। কাগজ-কলম ছাড়িয়ে নতুন বছরের নতুনত্ব জীবনের আর কোনখানে প্রকাশ না হওয়ার ফলেই হয়তো।

বছরের প্রথম দিনের ঘটনাই ধরা যাক।

ভূষণের সাংসারিক অবস্থাটা ক্রমশ নীচের দিকে গড়াচ্ছে। অবস্থাটা তার কোনদিন যে খুব ঐশ্বর্যশালী ছিল তা নয়। ঐশ্বর্য ছিল কেবল অন্তরে। অবস্থা বিপর্যয়ের সঙ্গে সেটারও পতন শুরু হয়ে গেছে। নইলে নিজেরই দুধের মেয়ের গালে অমন কড়া-পড়া কেঠো হাতের চারটে থাপ্পড় বসাতে পারে বছরের প্রথম দিনের সকালবেলাতেই ? মেয়েটার অপরাধ সে পুকুরে নাইতে গিয়ে গামছা হারিয়ে এসেছে। গামছা হারানোটা এমন কিছু ভয়ংকর অপরাধ নয়। কিন্তু সেদিন মাসের পয়লা আবার বছরেরও পয়লা। ঐদিন কিছু হারানো মানেই বছরের সবকটা দিন নানারকম ক্ষয়-ক্ষতির মধ্যে দিয়ে কাটাতে হবে—এমনি একটা সংস্কার গ্রামাঞ্চলে প্রচলিত।

ক্ষয়-ক্ষতির মধ্যে ত ভূষণ আকণ্ঠ ডুবে আছে। তবুও যে মেয়েটার গালে এমন সশব্দে সে চড়টা মারতে পারল—তার কারণ তার অন্তরের অপরিসীম নৈরাশ্য। মেয়েটার গামছা হারানোর ঘটনাকে কেন্দ্র করে তার চিন্তা অদূর ভবিষ্যতের আরও অনেক ভয়াবহ সর্বনাশের দিকে ঝুঁকেছিল।

নিজের অন্তরের অন্তর্গত হতাশা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে কিছুটা আর বাকীটা মার-খাওয়া মেয়েটির প্রতি মমতা বশতঃই ভূষণ সন্ধ্যের দিকে এক পোয়াটাক মাছ কিনে নিয়ে বাড়ী ফেরে। ঘটনাটা ঘটে যায় খুবই আকস্মিকভাবে। সে যে মাছ কেনার পয়সা নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়েছিল তা নয়। বাজারে দেখা হয়ে গেল সৈয়দের সঙ্গে। সৈয়দ দিন দুই আগে, যখন দুজনেই কেনায়েত সাহেবের পুকুর-কাটার জন খাটছিল, ভূষণের কাছ থেকে কর্জ

করেছিল চোদ্দ আনা। সৈয়দ সেটা দেখা হতেই মিটিয়ে দিলে। ভূষণ পয়সা হাতে পেয়ে দেখলে মাছ কিনছে রজনী। দেখে সেও ঝোঁকের মাথায় কিনে বসল এক পোয়া মাছ।

মেয়েকে মারার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করতেই মাছ কিনেছিল ভূষণ। এর মধ্যে আনন্দও ছিল খানিকটা। বলতে গেলে আজকাল রোজগারের পয়সায় মাছ কিনে খাওয়ার সৌভাগ্য মাসে এক-আধদিনই ঘটে থাকে কোনক্রমে। কিন্তু তাকে পয়লা বৈশাখ মাছ খেয়ে মনের হতাশা জুড়োনোর আনন্দ উপভোগ করার প্রায়শ্চিত্ত করতে হল দোসরা বৈশাখের সকাল বেলাকার হাহুতাশ দিয়ে। খেয়ালের বশে মাছে কিনে এখন চাল কেনার পয়সায় টানাটানি।

আজ পাঁচই বৈশাখ। বিকেলের শেষে রজনী বাজারে এসে বসেছে বনমালীর সেলুনে। গোবিন্দ প্রধানের দোকানে আজ হালখাতা। কলাগাছ পুঁতে, হ্যাসাক জ্বেলে, তেলচিটের ছোপা-ধরা গদীর ওপর নতুন চাদর তাকিয়া বালিশ বিছিয়ে, রূপোর কৌটোয় পান, পেতলের রেকাবীতে সুপুরী সিগারেট সাজিয়ে এবং ইত্যাকার আরও নানাবিধ উপকরণের সমাবেশে ও সমারোহে প্রধানদের অতি-চেনা দোকানটাকে বেশ আকর্ষণীয় করা হয়েছে। এছাড়া আছে খাওয়া-দাওয়া। লুচি মিষ্টির অঢেল আয়োজন। প্রতিবছরই যেমন হয়ে থাকে। রজনী এই দোকানের খদ্দের নয়। জীবনে মাত্র দুবার সে এই দোকানে মাথা গলিয়েছে। দুবারই চারুর গয়না বন্ধক দিতে। দোকান ছাড়া গোবিন্দ প্রধানের আরও একটা ব্যবসা আছে। সেটা তেজারতী ও বন্ধকীর কারবার।

রজনী এসেছে গান শোনার জন্যে। সাত মাইল দূরের স্টেশন-বাজার থেকে ভাড়া করে আনা হয়েছে এ্যামপ্লিফায়ারের গান।

সন্ধ্যের দিকে দেখা গেল বনমালীর দোকানটা প্রায় ভর্তি। তারা যে কেবল গান শুনছে তা নয়। নিজেদের বেসুরো গলায় যতদূর সম্ভব সুর-সঙ্গতি এনে রেকর্ডের সঙ্গেই গাইছে বা গাইবার চেষ্টা করছে। কেউ কেউ আবার ঐ প্রসঙ্গে কোন্‌টি কোন্‌ ফিল্মের গান, কে গেয়েছিল, কি ভাবে গেয়েছিল, কে প্লেব্যাক করেছে ইত্যাদি আলোচনায় আত্মহারা হবার মত অবস্থায় এসে যাচ্ছে। রজনী কিন্তু আগোগোড়া চুপচাপ। কাজের মধ্যে যা করেছে তা কেবল বিড়ি খাওয়া, কখনও অন্যমনস্কতার ঘোরে পা নাচানো। তার খুব বেশী সিনেমা দেখা নেই। সুতরাং গানের ঠিকুজী-

কুষ্ঠি বা জন্ম-ইতিহাস বিচার করে তার গান ভাল লাগার কথা নয়। গানের চেয়ে বরং তার বেশী ভাল লাগল সানাই, সেতার, বেহালার বাজনাগুলো।

তন্ময় হয়ে গান শুনতে শুনতে এবং চারপাশে উৎফুল্ল মুখের ছবিগুলো দেখতে দেখতে হঠাৎ রজনীর মানসিক জগতে কেমন একটা নিভৃত বিষাদের সঞ্চার হল। যে পৃথিবীতে ইচ্ছে করলেই এমন অপরূপ সুরের জগৎ গড়ে তোলা যায় সে পৃথিবীতে মানুষের জীবনে এত দুঃখ-দারিদ্র্য কষ্ট-লাঞ্ছনা, ক্ষুধা-তৃষ্ণার অতৃপ্তি, হতাশা আর অবিশ্বাস, শাসন আর শোষণ, অন্তরের গ্লানি আর অন্তর্দাহের অশ্রু এই সব কিছুকেই কোন এক ছন্দজ্ঞানহীন নিরেট মস্তিষ্কের নিষ্ঠুর ইয়াকির মত মনে হল তার।

রজনী ঈশ্বরকে অন্যদের মত চলতে-ফিরতে স্মরণ না করলেও, বা হাতের তাগা-তাবিজে কি গলার তুলসীর মালায় ঈশ্বরের আশীর্বাদকে বয়ে না বেড়ালেও নিরবধিকালের সংস্কার তার মনেও সময়ে-সময়ে প্রতিক্রিয়া ঘটায়। মানুষের বিনা যত্নে যখন কোন আঁস্তাকুড়ের গাছে ঠিক সময়ে ঠিক রঙের ফুলটি ফোটে, আকাশে অমাবস্যার অবসানের সঙ্গে সঙ্গে জ্যোৎস্নারাত্রির আবির্ভাব ঘটে, লোকচক্ষুর অন্তরালেই নারকেল গাছের ছোট্ট মুচি একদিন শাঁসে-জলে পরিপূর্ণ হয়, তখন একজন সর্বশক্তিমান মানবেতর ব্যক্তির অস্তিত্ব সম্পর্কে রজনীর প্রত্যয় জন্মায়। কিন্তু মানুষের সমাজ সংসারের প্রতিদিনের প্রাণ-প্রবাহের দিকে তাকিয়ে রজনীর বিশ্বাস হয় না পৃথিবীর এত বিপুল অশান্তি, স্বার্থপরতা, বিবাদ-বিদ্বেষের পিছনে সেই ঐশ্বরিক অস্তিত্বের নির্দেশ রয়েছে।

সেই রাত্রেই বাড়ী ফেরার পথে ছোটবাবুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল রজনীর। তিনি সাইকেল থেকে নেমে জিজ্ঞাসা করলেন—কে যায়? রজনী?

রজনী সাড়া দেয়—আজ্ঞে হ্যাঁ।

তুমি আমার কাছে কদিন গিছলে, না? আমি বাইরের নানা কাজে একটু জড়িয়ে ছিলাম। এখন কি বাড়ীতে ফিরছ?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

তোমার সঙ্গে যে দরকার ছিল আমার। এখন সময় হবে বসে একটু কথা বলার।

রজনী বলে—আপনার বাড়ীতে যেতে হবে ত? চলুন।

ছোটবাবু আর সাইকেলে চাপেন না। রজনীর আগে আগে সাইকেলটা হাতে ধরেই চলেন।

ছোটবাবু চলার পথে রজনীকে আকস্মিকভাবে প্রশ্ন করেন—আচ্ছা, ভূষণ লোকটা কেমন বল ত রজনী।

রজনী প্রশ্ন শুনে প্রায় হক্‌চকিয়ে গিয়ে বলে—ভূষণ মানে আমাদের ভূষণকাকার কথা বলছেন ত ?

হ্যাঁ।

কেন উনি ত ভাল লোক। উচিত-কথার লোক। এই ত কদিন আগে গিরীশবাবুর সঙ্গে ঝগড়া-ঝাঁটি করে চাষের জমিটা খোয়ালে।

সেতো আমি সব জানি। আমি অন্যদিকের কথা বলছি।

ছোটবাবু একটু কেশে নিয়ে গলাটা খাটো ও ভারী করে বলেন—নিজের ভাল-মন্দের প্রয়োজনে ঝোঁকের বশে অনেকেই ত অনেক কিছু করে। কিন্তু নিজের ভালমন্দের সঙ্গে আর দশজন মানুষের ভালমন্দটাও ভাবা দরকার।

রজনী ঠিকমত কথাটা বুঝতে না পেরেও সায় দেয়—আজ্ঞে হ্যাঁ।

ছোটবাবু বলেন—আমি কি বলছি বুঝতে পারছো। যেমন ধর, এই যে চাল ডাল জিনিসপত্রের দাম হুহু করে বাড়ছে, এটা বাড়াচ্ছে কয়েকজন লোক, লাভও করছে কয়েকজন লোক। এর ফলে মারা পড়ছে তোমার মত আমার মত হাজার হাজার লোক। এখন হাজার লোক যদি একা একা চেষ্টা করে তাহলে ত কিছু কাজের কাজ হবে না। কিন্তু সকলে মিলে একসাথে যদি একটা কিছু করা যায়, তার প্রতিক্রিয়াটি হবে অন্যরকম। একটা ঠেলায় যেটা নড়ত না, একশো কজি ঠেললে সেটা মড়মড় করে ভাঙবে।

এইটুকু বলেই ছোটবাবু প্রসঙ্গ পরিবর্তন করেন।

আমি ভূষণের কথা কেন জিজ্ঞেস করছিলুম জান রজনী। ভূষণ পাঁচটা ব্যাপারে উৎসাহ দেখায় বলেই জিজ্ঞেস করছি। আমার ঐ রকম দু-চারজন লোককে দরকার। তুমি আছ, আর ধর যদি ভূষণকে পাই, কি আরও দু-একজন আসে, তাহলে এখানে বড় রকমের একটা মিটিং করি।

রজনী বলে—আজ্ঞে তা ত করতে পারেন। আমরা গরীব চাষী-ভূষি মানুষ। আমাদের ত একদম মরবার দাখিল। আমার ত মনে হয় ছোটবাবু, আপনি মিটিং ডাকলে গ্রামের লোক সাড়া দিবে।

রজনী উৎসাহের ঘোরে কথাগুলো বলে ফেলে।

ছোটবাবু জিজ্ঞেস করেন—তুমি কি করে বুঝলে ?

রজনী বলে—আপনি একবার গঙ্গা আদকের দোকানের সামনে গিয়ে দাঁড়ান

না, তাহলেই বুঝতে পারবেন। দু'পয়সার জিনিস কিনতে মানুষ দশবার দর-কষাকষি করে। ধার-বাকী নিয়ে সব সময় ত হাড়ি-কিচকিচি, ঝগড়া-ঝাঁটি লেগেই আছে।

রজনী একটু থেমে বিজ্ঞের মত প্রত্যয় নিয়ে বলে—অভাবের মধ্যে পড়ে আজকাল মানুষের মনটাও ভারী ছোট হয়ে যাচ্ছে ছোটবাবু।

চলতে চলতে গ্রামের মাঝখানে পৌঁছে রজনী বলে—ছোটবাবু, তাহলে কি ভূষণকাকাকে ডাকবো ?

ছোটবাবু একটু ভেবেই উত্তর দেন—আচ্ছা, ডাকো। শোনো, মিটিং-টিটিঙের কথা এখুনি ভেঙো না।

রজনী ভূষণের বাড়ীর কাছাকাছি পৌঁছতে গিয়ে একটা হল্লার মত শব্দ শোনে। একসঙ্গে অনেকগুলো মানুষের চীৎকার, ও চলাফেরার মিশ্রিত আওয়াজ উঠছে। ভিড়টা হয়েছে রসিক সাউএর পান-বরজের কাছে। রজনী ভিড়টার কাছে এগিয়ে গিয়ে ভূষণকেই দেখতে পায় প্রথম। ভূষণ খুব হাত-পা ছুঁড়ে আস্ফালন করছে।

কি হয়েছে ভূষণকা ?

ভূষণ রজনীর দিকে না তাকিয়ে ভিড়ের দিকে মুখ করেই বলে—কি হবে আবার। শালা রাত এক পহোর কাটল নি, আর ছিঁচকে চোর এসে পান বোরোজে ঢুকেছে। আমি উ-পথ দিয়ে না-এলে তো বোরোজ ফাঁকা হতো আজ।

রজনী ব্যাপারটা বুঝতে পারে। ভূষণ আন্দাজ করে চুরিটা ঠেকাতে পেরেছে বলেই এত আস্ফালন তার। আর চোরকে ধরা যায় নি বলেই এতগুলি মানুষের আফসোস ও আক্রোশ। অথচ চুরি হলে যার হতো সেই বয়স্ক রসিক সাউ একদম বোকা-হাবার মত ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে একসঙ্গে ভিড়ের প্রায় সবকটা মানুষের দিকে। রজনী চোখের দৃষ্টিকে সামান্য সঞ্চারিত করে দেখতে পায় গোয়ালের পাশে ঘরের দরজার মুখে কয়েকটি ঘোমটা টানা নারী-মূর্তি।

রজনী দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতেই নানা মুখের নানা কথায় বুঝতে পারে গ্রামে ছিঁচকে চোরের উপদ্রব শুরু হয়েছে। এর পুকুর থেকে ঘটি-বাটি, ওর উঠোন থেকে মাছ-ধরা জাল, কলার কাঁদি, বরজের পান এমনি সব চুরি দু-চার দিনের মধ্যে অনেক হয়েছে এখানে-ওখানে।

এই সব কথোপকথন শুনে ছোটবাবুর মিটিং ডাকার প্রস্তাবটাকে তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ বলে মনে হয়।

রজনী ভূষণের দিকে তাকিয়ে বলে—ভূষণকা একটা কথা ছিল যে গ তোমার সঙ্গে।

কি বল্।

একটু ইদিকে এস না।

ভূষণ ও রজনী ভিড়ের পাশ থেকে একটু সরে গিয়ে দাঁড়ায়। রজনী কি ভাবে কথাটা শুরু করবে বুঝতে পারে না। ভূষণের মনটা এখন উত্তেজিত। ঠিকমত বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ব্যাপারটা বলতে না পারলে যদি সে ছোটবাবুর ডাকে সাড়া না দেয়।

ছোটবাবু রজনীকে যে কথা ভাঙতে বারণ করেছিলেন রজনী তাই দিয়েই কথা শুরু করে। এবং বেশ বিচক্ষণভাবেই সে ভূষণকে বুঝিয়ে দেয় যে মানুষের দুঃখ-দুর্দশার পিছনে কিংবা এই চুরি-চামারি করার প্রবৃত্তির পিছনে কিংবা এই যে মারামারি-কাটাকাটি মন-কষাকষি, এই সবকিছু ব্যাপারের পিছনে রয়েছে অর্থাভাব। যতদিন এমনি অন্নকষ্ট, অর্থকষ্টের দুঃসময় চলবে, ততদিন ঐসব আনুসঙ্গিক ঘটনারও বিনাশ হবে না, বরং বৃদ্ধি পাবে।

রজনী যে এত ভারিক্কী চালে অভিজ্ঞ মানুষের মত আলাপ-আলোচনা করতে পারছিল—তার পিছনে একটা প্রেরণা আছে। ছোটবাবুর সঙ্গে এতটা পথ অন্তরঙ্গভাবে হেঁটে আসার সময় সেই প্রেরণা তাকে যুগিয়েছেন ছোটবাবুই। ছোটবাবু তাঁর দৃষ্টিশক্তির দূরবীন দিয়ে রজনীর চরিত্রটাকে ঠিক বুঝে নিতে পেরেছেন। নইলে ভূষণের মত উৎসাহী-উদ্যোগী মানুষ সম্পর্কেও যখন তাঁর সন্দেহ সম্পূর্ণ ঘোচে নি, রজনী সম্পর্কে তখন তাঁর মনোভাব পুরোপুরি নিঃসন্দিগ্ধ হয় কেমন করে।

ভূষণের সঙ্গে কথা বলার সময় ভিড়ের অন্য দু-একজনও স্বাভাবিক কৌতূহলের বশে রজনীর পিছনে দাঁড়িয়ে তার কথা শুনছিল। তারা এসেছিল চোরটাকে ধরে বেদম প্রহারে ধরাশায়ী করার একটা উত্তেজিত বাসনা নিয়ে। এখনও তাদের মুষ্টিবদ্ধ হাতের দিকে তাকালে সেটা বোঝা যায়। কিন্তু সে উন্মাদনা ব্যর্থ হওয়ার ফলে তাদের মনের মধ্যে কিংবা বলা যায় শরীরের মাংসপেশীর মধ্যে পাকিয়ে পাকিয়ে উঠছিল একটা বিরক্তিপূর্ণ অস্বস্তি। রজনীর মারফত ছোটবাবুর ভূষণকে ডেকে পাঠানোর সংবাদ পেয়ে তারাও এগিয়ে এসে বলে—

চল সবাই মিলেই যাওয়া যাক্। অনেকের উৎসাহ দেখে এবং রজনীর বক্তব্যের গুরুত্ব উপলব্ধি করে ভূষণ রাজী হয়।

রজনী আগে-আগে চলে নেতার মত। কিন্তু পিছনের লোকেরা এত হৈ-হল্লা করে হাঁটে যেন তারা চলেছে কোন রাজ্য-জয়ের অভিযানে।

ভূষণ বলে—ওরে বাবু, চেল্লা-চোকার থামা। জানু ত ই-গ্রামের অবস্থা। এক করতে আর হয়ে যাবে।

ঝড়ুও ছিল ভিড়ের পিছনে। সে আজ সাহস পেয়ে রজনীর পাশে গিয়ে হাঁটে। সে সব ব্যাপারটা পুরো বোঝে নি বলেই রজনীকে প্রশ্ন করে—কি হবে এখন ছোটবাবুর ওখানে?

রজনী ব্যাপারটার মধ্যে একটা রহস্যের ছোঁয়া লাগিয়ে বলে—চল না, কি হয় দেখা যাবে।

রজনীর জন্যে বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে ছোটবাবু খেতে বসেছিলেন। বৈঠকখানার দরজায় শিকল নাড়ার শব্দে ও অনেকগুলি মানুষের চাপা কলরব শুনে এঁটো হাতেই উঠে এসে দরজাটা খুলে দিয়ে বাঁ হাতে বড় চাটাইটা বিছিয়ে দেন।

তোমরা বসো একটু। হাতটা ধুয়ে আসি।

ভূষণ বলে—না না, আপনি খেয়েই আসুন না। আমরা বসছি।

ভূষণ, রজনী ও অন্য দু-একজন ছাড়া ছোটবাবুর এই ঘরে আর কেউ খুব একটা ঢোকে নি।

তাদের কেমন একটা ভয়-ভয় ভাব ছিল ঐ মানুষটা এবং তার এই ঘরটার সম্পর্কেও। মানুষটার এমন সহজ আন্তরিকতায় মুগ্ধ হয়ে তারা ছোটবাবুর মাঝারি ঘরখানাকে খুঁটিয়ে দেখে। কোথাও কোন জিনিসটি সাজানো-গুছনো নেই। সারা ঘরটাই ময়লা, অপরিষ্কার, এলোমেলো। দেয়ালে যে একটা-দুটো ছবি টাঙানো আছে তাদের কাঁচ গেছে ফেটে, ফ্রেমের গায়ে মাকড়সার জাল। কয়েকজন সেই ছবিগুলোর দিকে গভীর অপরিচয়ের দৃষ্টিতে তাকায়।

রজনী ঝড়ুর কানে কানে বলে,—উটা কার ছবি জানু ?

কার?

স্টালিনের ছবি উটা।

ঐ নাম শুনে ঝড়ুর মনে কি অনুভব সঞ্চারিত হয় তা বোঝা যায় না। কেবল একটি অস্ফুট শব্দ সে মুখে উচ্চারণ করে—বাঃব্বা।

সতেরো

রাত্রের এই সামান্য ঘটনাটাই পরের দিন অসামান্য মূর্তি নেয়। গিরীশ চক্রবর্তীর কানে যে লোকটা কালকের জমায়েতের আনুপূর্বিক বিবরণ শোনায়, জমায়েতে উপস্থিত ছিল সেও। শুধু উপস্থিত থাকা নয় অন্য অনেকের চেয়ে মিটিঙের ব্যাপারে সে উৎসাহও দেখিয়েছিল যথেষ্ট। কিন্তু রাত পোহানোর সঙ্গে সঙ্গে তার মনে কেমন একটা অস্বস্তি শুরু হয় এই ভেবে যে এতবড় একটা ঘটনা গিরীশ বাবুর অজানা থেকে যাচ্ছে। লোকটা গিরীশবাবুর হরিনাম সংকীর্তনের দলের লোক।

রমণীও তাই। গলাটা তার গানের পক্ষে আদৌ উপযুক্ত ও আরামদায়ক নয় বটে, কিন্তু হরিনামের প্রতি তার অন্তরের আকর্ষণ বড় নির্ভেজাল ও খাঁটি। জগাই-মাধাই নামক দুই পাষণ্ড যখন নিমাই-এর দেব-অঙ্গে কলসীর কানা ছুঁড়ে মারে, তখন রমণীর অন্তঃকরণ নিজেকে ঐ দুই পাষণ্ডের অন্যতম অনুমান করে আত্মগ্লানি ও অনুতাপে জর্জরিত হয়। আবার যখন নিমাই তাঁর অমলিন অবিচলিত হাস্যোজ্জ্বল মুখে সেই দুই পাষণ্ডকে হৃদয়ে আলিঙ্গন দেন, রমণী অনুভব করে প্রভুর বক্ষস্পর্শে তার জীবনও বুঝি ধন্য হল, এবং তার গাল ও গলা বেয়ে নীরব অশ্রুর একটি সূক্ষ্ম ধারা নেমে আসে।

অন্যান্য দিনের মত যথারীতি আজও রমণী এসেছিল গিরীশবাবুর কীর্তনের আসরে। প্রথম দর্শনের মুহূর্তেই গিরীশবাবু তীক্ষ্ণ কর্কশ ও গম্ভীর ভাষায় তাকে সম্ভাষণ জানালেন—সব ব্যাটা বেইমানের বাচ্চা।

রমণী স্তম্ভিত ও বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। প্রথমে তার বিশ্বাসই হয় নি যে গিরীশবাবুর কটু বাক্যটি তাকে উদ্দেশ্য করেই। কেন না গিরীশবাবুর সঙ্গে তার বেশ একটা ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ গড়ে উঠছিল ক্রমশ। এবং এটা প্রায় সুনিশ্চিত হয়ে গিছল যে ভূষণের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া জমিটা এবছর থেকে রমণীকেই চাষ করতে দেওয়া হবে।

রমণী বলে—আজ্ঞে বাবু, আপনি রাগ করছেন, কি হয়েছে বলুন ত?

গিরীশবাবু দ্বিতীয়বার মুখ খোলবার আগে তাঁর কয়েকজন সাঙ্গোপাঙ্গ ব্যাপারটাকে স্পষ্ট করে দেয় রমণীর কাছে।

রমণী সমস্ত বিবরণ শুনে স্তম্ভিত ও লজ্জিত হয় যতটা, তার চেয়ে বেশী আড়ষ্ট

হয়ে গিরীশবাবুর সিমেণ্টের দাওয়ার একটা থাম ধরে বসে পড়ে। তার কানে আসে ছোটবাবুর সম্পর্কে নানা রকম বিদ্রূপ ও অশ্রাব্য মন্তব্য। রমণীর একবার মনে হয় মিটিঙের ব্যাপারে রজনীর মাথা গলানোটা সত্যিই একটা ক্ষমাহীন অপরাধ। আবার পরমুহূর্তে সে ভেবে পায় না যে ছোটবাবুর মিটিঙের সঙ্গে গিরীশবাবুর সম্পর্কটা কি এবং ধান চাল ও জিনিসপত্রের ক্রমাগত বেড়ে-চলা দামটাকে যদি সত্যিই কমিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয় সেটাই বা দোষনীয় কিসে।

তবুও রজনীর ওপর জ্বালাময় ক্রোধে সমস্ত শরীরটা শিহরিত হয় রমণীর। তুই চাষার ছেলে। তোর এমন কাজে মাথা গলানোর কি দরকার যাতে গ্রামের মান্য-গণ্যদের সঙ্গে বিরোধ বাধবে। আর তোদের মত পাঁচজন দশজনেরই বা সাধ্য কি যে একটা রাজার এত বড় রাজত্বির নিয়ম-কানুন পাল্টে দিবি! মাঝখান থেকে বাড়া-ভাতে ছাই।

শরীরে ও মনে একটা চাপা উত্তেজনা নিয়ে রমণী বাড়ী ফেরে।

বীণাপাণি ও পদ্মর মধ্যে তখন তীব্র কলহ চলেছে। ঘটনাটা সংক্ষিপ্ত। পদ্মকে উনুনে চাপানো শাক-চচ্চড়িটা দেখতে বলে বীণাপাণি গিয়েছিল তার মেয়েকে ঘুম পাড়াতে। মেয়েকে ঘুম পাড়াতে গিয়ে শরীরের অভ্যন্তরে ভ্রূণের ভার এবং সংসারের শ্রম এই দুয়ের ক্লান্তিতে অনায়াসে তার নিজের চোখদুটোও ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে যায়। পদ্ম বীণাপাণির কথামত উনুনের পিঁড়িতে বসে শাক চচ্চড়ির দিকে তাকিয়ে ছিল সত্যিই। কয়েকবার খুন্তিও নেড়েছিল। তার পর রান্নাঘরের পিছন দিকের পেয়ারাতলায় পটলের আওয়াজ শুনে একবার বাইরে এসেছিল। বেড়ালটা মিঁউ মিঁউ করছিল এইজন্যে যে তার মুখের গ্রাস থেকে কোনরকমে ছাড়া পেয়ে একটা নেংটি ইঁদুর পেয়ারাতলার কোন গর্তের মধ্যে নিরাপদ আশ্রয় নিয়েছে। পদ্মর ডাকে পটল ম্লানমুখে তার পায়ের সামনে এসে দাঁড়ায়। ঘাড় উঁচু করে করুণ কান্নার ঢঙে তার সমবেদনা প্রার্থনা করে। পদ্ম তিরস্কার করলে সে অভিমানে পদ্মর দুই পায়ের ফাঁকে শাড়ীর আড়ালে মুখ লুকোয়।

পদ্ম আবার রান্নাঘরেই ফিরে আসছিল। আকস্মিকভাবে তার চোখটা রান্না-ঘরের সামনের পাঁচিল ও দূরের খড়-গাদার মাঝের ফাঁক দিয়ে আকাশকে স্পর্শ করে। আকাশ তখন আলোয় পরিপূর্ণ। পৃথিবীতে যা কিছু পরিপূর্ণ তার মধ্যে থেকে যে বেদনা ও বিষণ্ণতার আবেদন বিচ্ছুরিত হয়, আকাশের

দিকে তাকিয়ে পদ্মর প্রাণেও নিমেষে সংক্রামিত হল সেই বিষণ্ণতা। জ্যোৎস্না-প্লাবিত আকাশ যেন পদ্মর মুখের দিকে তাকিয়ে বলছিল—দেখ কত পরিপূর্ণ আমি। আর পদ্মর অন্তর ভরে উঠছিল এক নিবৃত্তিহীন বেদনায়—আমি কী শূন্য। পদ্ম এক ঠাঁয়ে স্থির দাঁড়িয়ে রইল।

এই সময়েই ঘুমটা ভেঙে গেল বীণাপাণির। তার পরই যথারীতি শুরু হয়ে গেল তুমুল বাক্-বিতণ্ডা।

দোষটা পদ্মরই। বীণাপাণির রণচণ্ডীর মত মূর্তি দেখে ভয়ে তার বুকের মধ্যে ঢেঁকির পাড়ের মত ঢিপ্‌ঢিপ শব্দটা সে নিজের কানেই শুনতে পেল। তবু কেমন একটা এক-রোখা জেদ পেয়ে বসল তাকে। যে কথা কোনদিন সে সঠিকভাবে ভাবে নি সে-রকম একটা কথাই আজ তার মুখ দিয়ে অনায়াসে বেরিয়ে এল বীণাপাণির গাল-মন্দের জবাবে।

আমার কিসের সংসার! আমার ছেলে নেই, পুলে নেই। যাদের ছেলেপুলে যাদের সংসার তারাই সব দেখুক-শুনুক। উঠতে-বসতে অত কথার খোঁচা সইতে হবে কেন? আমাকে দিয়ে সংসারের না পোষায়, বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দাও না আমাকে। ইখেনে ফেলে রেখে তিল তিল করে না মেরে বুঝি মনের আশ মিটতেছি নি।

পদ্মর এই অভিযোগ রমণীর কানে এল দরজায় মাথা গলাতে গিয়ে। সে নিঃশব্দে তার নিজের ঘরে ঢুকে গেল। পদ্ম বা বীণাপাণি রান্নাঘরের সামনের দাওয়ায় দাঁড়িয়ে নিজেদের সাধ্যমত গলার জোর ও যুক্তির জোরে ঝগড়া করায় এত তন্ময় হয়ে ছিল যে রমণীর প্রবেশ তাদের দৃষ্টিগোচর হয় নি।

এ রকম বাক্-বিতণ্ডা ঝগড়া-ঝাঁটি সব সংসারেই হয়। রমণীর তা অজানা নয়। তাই নিজের সংসারের ঝগড়া-ঝাঁটিকে সে খুব একটা আমল দেয় নি কখনো। বরং বীণাপাণির মুখে পদ্মর বিরুদ্ধে অভিযোগ শুনে পদ্মকেই দু-এক ঘা ঠেঙিয়ে এই জাতীয় কলহের সমাপ্তি ঘটিয়ে এসেছে সে।

কিন্তু মানসিক অবস্থার সামান্য অদল-বদল হয়ে যাওয়ার ফলে রমণীর মনে আজকের কলহটা অন্য রকম প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করল। তার অন্তরের নিভৃতে পদ্মর প্রতি সামান্য একটু সমবেদনার সন্ধান পাওয়া গেল।

আঠারো

মাত্র একটি রাত ও একটি দিনের অবকাশে রজনীর জীবনে যেন অফুরন্ত প্রাণ-চাঞ্চল্য ফিরে এসেছে। কোন বৃহৎ কর্তব্য বা দায়িত্বকে উপলক্ষ করে এবং তার মধ্যে নিজেকে সংযুক্ত করতে পারার অধিকারে তার জীবনের পরিধি যেন বিস্তৃত হয়ে গেছে বহুদূরব্যাপী।

ছোটবাবুর নির্দেশ মত ছোটখাট কাজে সে তৎপরতার সঙ্গে খাটছে। আগামী পরশুদিন বাখুরীর বাজারে ঢোল-সহরৎ করে মিটিঙের খবর ঘোষণা করা হবে। রজনী দূর গ্রামের ঢুলী পাড়ায় গিছল বাজনদার বায়না করতে। বাড়ী ফিরতে সন্ধ্যে উতরে বেশ খানিকটা রাত হয়ে গেল। ছোটবাবুকে খবরটা জানানোর জন্তে অনেকখানি সময় অপেক্ষা করতে হল তাকে।

রজনী বাড়ী ফিরছিল মনের মধ্যে খানিকটা পূর্ণতা বা প্রশান্তির উপলব্ধি নিয়ে। মিটিংটা যদি সার্থক হয় এবং গোটা দেশের সবখানেই যদি তা সার্থক হয় তার পরিণামে মানুষের জীবনে যে শান্তি বা স্বাচ্ছন্দ্যের আবির্ভাব ঘটবে রজনী যেন সেই আবির্ভাবকে কল্পনায় প্রত্যক্ষ করেই প্রশান্তিটা অনুভব করছিল।

এই সব ভাবতে গিয়ে তার চলার গতিটা হয়ে গিছল মন্থর। চলতে চলতেই দু-পাশের শূন্য রিক্ত রুক্ষ মাঠ ও দিগন্ত সীমার পরপারে ঊর্ধ্বমুখ আকাশের দিকে তাকিয়েছিল সে কিছুক্ষণ। আকাশেও যেন প্রশান্তির একটা ছবি টাঙানো। আকাশের অনন্তব্যাপী মহিমার নীচে দাঁড়িয়ে রজনীর মনে হল যেন ধরিত্রীমাতা তার মাথার ওপর আকাশ-জোড়া কোমল ধবল হাতখানি বরাভয়ের মুদ্রায় স্থাপন করে তাকে আশীর্বাদ করছেন।

রজনী শিকল নাড়া দিলে পদ্ম রোজ দরজার খিল খুলে দিয়ে যায়। আজ রজনীর শিকল নাড়ার শব্দ পেয়ে খিল খুলে দিল বীণাপাণি।

বাড়ীতে ঢুকেই রজনীর মনে হল বাড়ীটা নিঃঝুম থমথমে। ভাবলে—অনেক রাত হয়ে গেছে, সবাই খেয়ে-দেয়ে শুয়েছে, সেজন্তেই। কিন্তু পদ্ম আজ এখনো উঠোনে চাটা পেতে বিছানা করে নি দেখে অবাক হল সে। আরও অবাক হল যখন রান্নাঘরের দরজার কাছে ভাত খেতে বসে সে তাকিয়ে দেখল পদ্ম রান্নাঘরেও নেই।

রজনী বীণাপাণিকে জিজ্ঞেস করলে—মেজকী কই?

বীণাপাণি কোন উত্তর দিল না। সে রজনীর দিকে পিছন ফিরে ভাত বাড়তে লাগল।

রজনী বুঝল বীণাপাণির সঙ্গে আজ পদ্মর কিছু জোরালো বিবাদ-বচসা হয়েছে। বীণাপাণি যে পদ্মকে যথার্থ ভালবাসে না এটা কি রজনীর অজানা? রজনী আরও জানে পদ্ম যে অকালে তুখোড় গিন্নী হয়ে উঠতে পারে নি, সেটাই পদ্মর বিরুদ্ধে বীণাপাণির মস্ত বড় অভিযোগ।

রজনী বীণাপাণির ওপর নিজেরই মনগড়া বিরক্তি নিয়ে মুখ নীচু করে ভাত খেতে আরম্ভ করে। খেতে খেতে এক সময় সে বুঝতে পারে বীণাপাণি হাঁটুতে থুতনি রেখে মাটির দিকে নতমুখ হয়ে কাঁদছে। এমন দৃশ্য রজনীর চোখে আর কখনো পড়ে নি বলেই সে মাত্রাধিক বিস্মিত হল।

বীণাপাণি একাই সুভদ্রার বাতে শয্যা নেওয়ার পর থেকে সংসারে একাধিপত্য খাটিয়ে আসছে। পদ্মকে কারণে-অকারণে অনেকবার আঘাত হেনেছে, দুঃখ দিয়েছে সে। কিন্তু সেই বীণাপাণিও যে দুঃখ পেতে পারে, আঘাতে তার চোখ দুটো অশ্রুময় হতে পারে, এমন ভাবনা রজনী কখনো ভাবে নি। রজনী মুখের গ্রাস হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে বীণাপাণির দিকে।

বড়কী, কি হয়েছে গা?

সহানুভূতির স্বরেই প্রশ্ন করে রজনী। বীণাপাণির যেন এতক্ষণে খেয়াল হয় তার সম্মুখভাগে আর একটি দ্বিতীয় প্রাণীর অস্তিত্ব। সে বাঁ হাতের চেটোয় চোখ দুটো মুছে মুখটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে নেয়।

রজনী ব্যাকুলতা প্রকাশ করে—কি হয়েছে বড়কী, কি হয়েছে তোমাদের? আমাদের সংসারটা দিনকে দিন কেন এমন হয়ে চলেছে বলতো?

বীণাপাণি রজনীকে আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনাটি ব্যক্ত করে।

রজনীর অন্তঃকরণ অতীব কোমল পদার্থে গড়া। তাই কয়েক ফোঁটা অশ্রুই তাকে বীণাপাণির প্রতি সহানুভূতিশীল করে তুলল। সকলের অনাদর অবহেলা অবজ্ঞার অন্তরালে থেকে দিনের পর দিন বছরের পর বছর বীণাপাণি একাই যে সংসারের এতগুলো মানুষকে দু-বেলা রাঁধা ভাত যুগিয়ে এসেছে, সংসারকে নিখুঁত পরিচালনা করেছে, এটা রজনী কখনো খেয়াল করে নি ভেবে নিজেকেই ভারী অপ্রস্তুত ও অকৃতজ্ঞ মনে হল তার। বরং বীণাপাণি বড্ড বেশী গৃহিণী বলেই তাকে সে সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা থেকেও বঞ্চিত করে এসেছে। অথচ পদ্মর আয়েসী আর অন্যমনস্ক স্বভাবটি বড় হয়েছে ত তারই

প্রশ্রয়ে। আজ সে ভাবল বীণাপাণির অবর্তমানে যদি পদ্মর ওপর এই সংসারের পুরো দায়িত্বটা এসে পড়ে আর সেদিনও যদি আকাশে এমনি দ্বাদশী-ত্রয়োদশীর চাঁদ থাকে, তাহলে পদ্মর আজকের মত তরকারি পুড়িয়ে ফেলার অপরাধটাকে সে ক্ষমা করবে কোন্ যুক্তি দিয়ে।

সংসারের মানুষের প্রতি বীণাপাণির মমতার আরেকটি দৃষ্টান্ত দেখে রজনী স্তম্ভিত হয়ে গেল।

শাক-পাতার চচ্চড়িটা পুড়ে গেছে। পাছে পুরুষ মানুষদের খাওয়ার অসুবিধে হয় সেজন্যে গুড় ও তেঁতুল চটকে চমৎকার মুখরোচক একটা টক বানিয়ে দিয়েছে। টক রজনীর অতি লোভনীয় খাদ্য।

খেতে খেতে রজনী হঠাৎ প্রায় কান্নার মত আবেগে বলে ফেললে—বড়কী, তোমার পায়ে পড়ি বড়দার কানে আর ইসব কথা তুলো নি। উ-মানুষটা আর কত জ্বালা সইবে।

রজনী খেয়ে উঠলে বীণাপাণি বলে—তুমি এগবার যাও ঠাকুরপো, ওকে ডেকে তুলো। মোর ডাকে ত উঠবে নি।

মেজকী এখনো খায় নি?

পদ্ম শুয়েছে দরজায় খিল এঁটে। ঘরের ভেতর থেকে রমণীর নাক ডাকার শব্দ আসছে। কয়েকবার ডাক দিয়েও রজনী পদ্মর সাড়া পেল না। এই গরমের রাতে ঘরের ভেতরকার গুমটের মধ্যে শুয়ে পদ্মর চোখে যে এখুনি ঘুম নেমে আসবে এটা অবিশ্বাস্য ভেবেই রজনী আরও কয়েকবার ডাকে। শেষ পর্যন্ত বিরক্ত হয়ে বলে—বড়কী, তুমি খেয়ে নাও গে।

অন্যদিন পদ্ম উঠোনের যে জায়গাটায় শোয় রজনী আজ সেখানটাতেই বিছানা পেতে শুল। বিরাট আকাশখানা তার ঠিক মাথার ওপর। জ্যোৎস্নার রঙ অল্প ফিকে হয়ে এসেছে। তার ফলে নক্ষত্রগুলো হয়েছে আরও উজ্জ্বল। আকাশের ঐ লক্ষ কোটি চোখের দিকে তাকিয়ে থেকে রজনীর চোখেও এক বিন্দু অশ্রু গড়িয়ে এল।

পদ্ম আজ সারাটা রাত অনাহারে কাটাবে।

পরের দিন সকালে রজনী ভাল করে কথা কইতে পারল না পদ্মর সঙ্গে। একটা প্রচ্ছন্ন অভিমানের ব্যবধান রয়ে গেল দুজনের মধ্যে।

রজনী যথারীতি কাজ করতে যায়। কিন্তু মিটিংয়ের নেশাটা তাকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেছে যে পদ্মর সঙ্গে বিবাদ বা চারুর সঙ্গে সাময়িক

বিচ্ছেদের মত ঘটনাগুলোও তার মনে সামান্যতম বেদনা সৃষ্টি করার অবকাশ পায় না।

শুধু তাই নয়। ইতিমধ্যে উড়ো-উড়ো রজনীর কানে এসেছে যে রমণী নাকি আলাদা হয়ে যাওয়ার তোড়-জোড় করছে। এমন ভয়ংকর সংবাদেও সে বিচলিত হল না। রমণীর স্বভাবটা চিরকালই হুজ্জুতে। কোন কিছুর তল-অতল বুঝবার মত বুদ্ধি নেই তার। তার যত জোর মুখের জোর আর শরীরের জোর। একটু বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বললেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

ওদিকে গ্রামের কিছু মহাপ্রাণ ব্যক্তি রমণীকেও সব কিছু বুঝিয়ে-সুঝিয়ে তৈরি করে নিয়েছেন। তাঁরা সকলেই গিরীশবাবুর হরি-বাসরের নিত্য নাম-সুধা সেবী। জগৎ ঈশ্বরের সৃষ্টি বলেই ঈশ্বরের জগতে তাঁদের করুণা বিতরণের অন্ত নেই।

রমণী একদিন রজনীকে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে হঠাৎ বলে বসল—রজো, আমি আলাদা হয়ে যাব ঠিক করেছি।

রজনী বলে—আলাদা হয়ে যাবে কি গ মেজদা? আমাদের তিন ভায়ের সংসার। মা বেঁচে আছে। তুমি কি বলতেছ?

আমি যা বলি ঠিকই বলি। আমার পোষাবে নি আর এক সংসারে থাকা। গিরীশবাবুর পাঁচ বিঘে জমি ই-বছর থেকে আমাকে চাষ করতে দিবে বলতেছে।

কুন পাঁচ বিঘে? যেটা ভূষণকাকার কাছ থেকে ছাড়িয়ে নিয়েছে?

হ্যাঁ।

তাতে কি হয়েছে?

কিন্তু তুই যে-সব কাণ্ড-কারখানা করতেছু তাতে গিরীশবাবু রেগে খাপ্পা। ওঁদের মত লোকজনের মতামত না-নিয়ে এই সব মিটিং-টিটিং করাটা কি সত্যিই ভাল নাকি? পাঁচজনকে বিপদ-আপদে বাঁচান ত ওঁরাই। তোর কি দরকার উসব যত রাজ্যের ছেঁড়া ঝামেলায় মাথা গলাবার? রাজা-মন্ত্রীরা যা ভাল-বুঝে তাই করে। তোদের পাঁচজনের কথায় কি তারা রাজ্যের বিধান পাল্টাবে?

রজনীর গলাতেও রমণীর মত ঝাঁঝ ফোটে।

তোমাকে কে বলেছে আমাদের মত পাঁচজন লোকই কেবল আন্দোলন করছে। পেটের জ্বালা যেখানে মনের জ্বালাটাও সেখানে। গোটা দেশেই

এমনি আন্দোলন হচ্ছে, মিটিং হচ্ছে, প্রতিবাদ হচ্ছে। আমরা না-হয় চাষা-ভুষো, বোকা-সোকা মানুষ। কলকাতার মানুষগুলোর ত জ্ঞান-বুদ্ধি বিচার-বিবেচনা আছে। ঐ ত সেদিন সাধনবাবু বললেন—কলকাতায় হরতাল হয়ে গেল, দোকান-পাট, গাড়ী-ঘোড়া, আপিস-আদালত সব বন্ধ। সেও ত ঐ ছোটবাবুদের দলের লোকেরা করিয়েছে।

রজনী একটু থেমে আবার বলে—আর তুমি যে ঐ গিরীশবাবুর উপমাটা দিয়ে ফেললে, তা উনি ত শুনি খুব দানশীল লোক, তাহলে গাঁয়ের লোকজনকে সস্তা দরেই ধান-চাল দিন না দেখি কিছু।

রমণী বলে—দেয় নি নাকি? দিয়েছে কি না-দিয়েছে তুই জানিস? কুন লোকটা গিয়ে ফিরে এসেছে বলতো শুনি?

হ্যাঁগো হ্যাঁ, ছোটবাবু সেদিন ব্যাপারটা বুঝিয়ে না দিলে আমিও তোমার কথায় সায় দিতুম বটে। কথায় বলে নি যে মায়ের চেয়ে মাসীর দরদ, তাকে বলে ডাইনী। তোমার ঐ গিরীশবাবুর হয়েছে তাই।

ছোটবাবু তোকে কি বুঝিয়েছে শুনি?

কি আর বুঝোবে। মানুষের দায়-দফায় সাহায্য করাটাও যে ওঁর একটা বড় রকম ব্যবসা সেটাই বুঝিয়ে দিলেন। এই ধর, এখন ধানের দরটা চড়া। এখন যদি একমণ ধান কর্জ করি সেটা শুধবো ত সেই কার্তিক-অঘ্রাণে, নতুন ফসল ঘরে উঠলে। তখন ধানের দরটা পড়ে গেছে, সস্তা। তখন কি উনি ধানের বদলে ধান নিবেন? তা ত নিবেন নি। তখন হিসেব হবে টাকার মাপে। এক মণের বদলায় আমাকে ধান দিতে হবে দেড় মণ। সব সময়েই এমনি নিজের দিকে ঝোল-টানা হিসেব।

রমণী খানিকক্ষণ গুম খেয়ে পায়ের তলা থেকে হাতের কোদালখানা তুলে নিয়ে চলে যাওয়ার উদ্যোগ করে। যুক্তি-তর্কে রজনীর কাছে হার মেনে তার মেজাজটা আরও বিগড়ে যায়। রজনী যা বলে সেগুলো ত বেঠিক কথা নয়, অথচ গিরীশবাবুর বৈঠকখানায় যে জটলা জমে সেখানকার আলোচনাতেও ত মানুষের মঙ্গল সাধনের কথা বলা হয়।

চলে যাওয়ার মুখে রমণী বলে—যে যা পারে করুক, তোর আমার সঙ্গে ত কেউ কিছু করে নি। তা তুই যে ছোটবাবুর ঠ্যাং ধরে এত নেচে বেড়াচ্ছ, আর তিনি যদি গ্রামের মধ্যে একজন খাঁটি লোক, তবে তিনিই দিক্ না দেখি দু-বিঘে জমি চাষ করতে।

রজনীর মুখে হাসি ফোটে।

তুমি যেখানে কাজ করতে যাচ্ছ যাও ত। তোমার মাথাটা দিনকে দিন একদম ভোঁতা হয়ে যাচ্ছে পাঁচজনের কু-মংলবে পড়ে। ছোটবাবুর যদি জমি-জমা থাকত তাহলে বলবার আগেই দেখতে কি হয় না-হয়।

সেদিনকার মত দুজনেই দুজনের মনে বিরক্তি ও বেদনার ভার নিয়ে যে-যার কাজে চলে যায়।

সন্ধ্যায় রজনীকে ডেকে পাঠান ছোটবাবু। রজনীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেন তার চেয়ে দু-এক বছরের কম বয়সী একটি যুবকের সাথে।

নাম নিখিল চট্টোপাধ্যায়। ঢ্যাঙা গড়ন। গায়ের রঙ উজ্জ্বল ফর্সা। কিন্তু মুখ আর হাতের অনাবৃত অর্ধেক অংশটুকু রোদে ঝলসানো। চশমার কাঁচের ভেতর দিয়ে চোখের দৃষ্টিটাকে ভীষণ শানিত মনে হয়। নাকের ডগা আর চিবুক ছুঁচলো ও তীক্ষ্ণ। পরনে একটা তালি-দেওয়া মোটা কাপড়ের ময়লা প্যান্ট। জামাটার সর্বাঙ্গেও অযত্ন ও অপরিচ্ছন্নতার মালিন্য।

ছোটবাবু নিখিলকে অন্য এলাকা থেকে সরিয়ে এখানে নিয়ে এসেছেন যাতে মিটিঙের প্রস্তুতি পর্বটা পাকা হয়। নিখিলের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থার দায়িত্ব দেওয়ার জন্যেই রজনীকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন তিনি।

সুরেন সদরে বসে ঢেরা ঘুরিয়ে সনের দড়ি কাটছিল। আর খুব অস্পষ্ট সুরে গান গেয়ে ঈশ্বরের নাম ভজনা করছিল। রজনীর সঙ্গে আরেকজন অপরিচিত লোককে দেখে সুরেন বলে—বাবুটি কে রজো?

ছোটবাবু পাঠালেন। মোদের বাড়ী থাকবে দু-একদিন।

সুরেন হাতের ঢেরা থামিয়ে ব্যস্ত হয়ে বলে—ত দাঁড়ি রইলি কেন? বাবুকে বসতে একটা জায়গা দে।

সদরের চালার পাটাতন থেকে একটা মাদুরী নামিয়ে পেতে দেয় রজনী।

নিখিল জুতো খুলে বসে। পাশে রাখে তার কাঁধের ব্যাগটা। রজনী বাড়ীর ভেতরে যায়। সুরেন কথোপকথন করে নিখিলের সঙ্গে।

আজ্ঞে আপনার বাড়ীটা কোথায়?

ভদ্রকল্যাণপুরে।

ভদ্রকল্যাণপুরে? উখেনে ত সব ভদ্রলোকের বাস। খুব সভ্য-ভব্য দেশ। আমি গেছলুম বাবু কয়েকবার। আমার বড় মেয়েটার বিয়ে দিয়েছিলুম কি না ওরই আশপাশের গাঁয়ে।

কোন্ গ্রামে বলুন ত ?

চকোর বেড়েয়।

চক্রবেড়েয় ? আমি চিনি ওখানকার সবাইকে। ওটা ত আমাদের ঘাঁটি। কি নাম বলুন ত আপনার জামায়ের ?

মহেন্দ্র সাঁতের বাড়ী আছে না ওখানে গ্রামের আটচালার বাঁ দিকে। ওঁনারই বড় ছেলে কেশবের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলাম। তা বাবু, মেয়ে ত মারা গেছে। আর সব সম্পর্কও চলে গেছে।

বহুকাল বাদে আজ মেয়ের স্মৃতি মনে আসায় সুরেন বোধ হয় দীর্ঘশ্বাস ফেললে একটা। কিন্তু চলমান সময়ের রূঢ় ও কঠোর হাতের ঘষা-মাজা খেয়ে সেই পুরনো শোক বা স্মৃতির অস্তিত্ব আজ এত ক্ষীণ হয়ে গেছে যে একটু বাদেই সুরেন আবার স্বাভাবিক কথোপকথনে ফিরে আসে।

আপনার নামটি ত জানতে পারলুম নি।

আমার নাম নিখিল চট্টোপাধ্যায়।

নাম শুনেই সুরেনের চোখের দৃষ্টি তীব্র হয়ে ওঠে। সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ বংশের সন্তান এসেছে তার মত দরিদ্র চাষীর সংসারে অন্নগ্রহণ করতে। উপমাটা এক স্তরের না হলেও মহাভারত-জানা সুরেনের মনে হল এ যেন সেই বিদুরের গৃহে শ্রীকৃষ্ণের খুদ ভক্ষণ। সুরেন উঠে দাঁড়িয়ে বলে—আপনি বসুন বাবু। আমি রজনীকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

সুরেন বাড়ীর ভেতরে গিয়ে রজনীকে তিরস্কার করে। এমন নামজাদা বংশের ছেলেকে সে কোন্ সাহসে এই দুঃখকষ্টের সংসারে ডেকে আনতে সাহস পেল ?

রজনীর মনেও খুঁতখুঁতুনির অন্ত ছিল না। তবু ছোটবাবুর নির্দেশ বলেই সে দ্বিরুক্তি করে নি। রজনী দাদার তিরস্কারে লজ্জিত হয়েই নিজের স্বপক্ষে জবাব দেবার মত একটা যুক্তি খুঁজে পায়।

তুমি অত ঘাবড়াচ্ছ কেন ? ওঁনারা সব পার্টির লোক। ইসব ওদের সহ্য করা আছে। গরীব-দুঃখী মানুষের সংসারটা কি রকম হয় সেটা জেনেছেন বলেই ত ওঁরা গরীব-দুঃখীর মঙ্গলের জন্যে আন্দোলনে নেমেছেন।

রান্না হয়েছিল থোড় ভাজা। আর থোড়েরই লঙ্কা-হলুদ-পেঁয়াজ দিয়ে রগরগে ঝাল-চচ্চড়ি। সুরেন তরকারির ঘাটতিটা পূরণ করে দেয় একবাটি ঘরের গাই-এর দুধ দিয়ে। খেতে খেতেই সে অভ্যর্থনার ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করে।

নিখিল এমনিতে অত্যন্ত সাহসী ও চতুর। ভীরুতা বা জড়তা জাতীয় উপসর্গ তার চরিত্রে আদৌ প্রশ্রয় পায় নি। তা সত্ত্বেও সুরেনের অকৃত্রিম ও অকপট সৌজন্যের প্রত্যুত্তরে সে বলবার মত ভাষা খুঁজে পেলে না। কেবল গভীর পরিতৃপ্তির সঙ্গে এক বাটি দুধ এক নিঃশ্বাসে নিঃশেষ করলে।

তার শোয়ার জন্যে রজনীকে সে ব্যস্ত হতে দিলে না। শুধু একটা বালিশ চেয়ে নিয়ে মাদুরের ওপরেই নিজের শয্যা বানিয়ে নিলে।

বাড়ীতে একজন অপরিচিত অভ্যাগতের আগমনকে কেন্দ্র করে পদ্মর সঙ্গে রজনীর কথাবার্তা বিনিময় হল। নিখিলের সম্পর্কে জানবার আগ্রহে পদ্মই কথা কইল বেশী। রজনী কথার জবাবে কথাই কইল কেবল। পদ্মর ওপর মনের বিরূপ মনোভাবটা কাটিয়ে খুব অন্তরঙ্গ হতে পারল না।

অতি প্রত্যুষে ঘুম থেকে উঠে সদরে গিয়ে রজনী দেখলে নিখিলের বিছানাটা শূন্য। ভাবলে মাঠের দিকে পায়খানায় গেছে। দু-পাঁচ মিনিটের মধ্যে ফিরবে। তার চেয়ে বেশী দেরি হতে ছোটবাবুর বাড়ীর দিকে রওনা দিলে উদ্বিগ্ন চিত্তে। একটু এগিয়ে চোখে পড়ল মাঠ পেরিয়ে নিখিল হেঁটে আসছে।

কোথায় গেছলেন? আমি চাদ্দিক খুঁজছি।

গ্রামের চারপাশটা ঘুরে এলুম।

রজনী বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করে—এত তাড়াতাড়ি চাদ্দিক ঘুরে দেখলেন কি করে?

নিখিল গলায় গাম্ভীর্য বজায় রেখে বলে—আমি ঘণ্টায় পাঁচ মাইল হাঁটি।

বাড়ীর কাছাকাছি এসে রজনী জিজ্ঞেস করে—আপনাকে ভেরাণ্ডা ডাল ভেঙে দুবো নিখিলবাবু? দাঁতন করবেন?

নিখিল বললে—আমাকে আপনি কমরেড বলে ডাকবেন। আমি দাঁত মেজেছি। রাস্তায় একটা নিম গাছের ডাল ভেঙে। আপনাকে কিন্তু একটা কাজ করতে হবে এবার।

কি বলুন।

একটা এ্যালুমিনিয়মের বড় বাটিতে বা মাটির সরায় এক বাটি আটার কাই তৈরি করে দিতে হবে।

কি হবে?

পোস্টার মারতে হবে। বাড়ীতে যদি আটা না থাকে ত চারটে পয়সা নিন। দোকান থেকে আনিয়ে নেবেন।

রজনী এতক্ষণে বুঝতে পারে নিখিলের ব্যাগের ভেতর খবরের কাগজের মোড়কটা কিসের। এসব অঞ্চলে পোস্টার মারার রেওয়াজ নেই। বেশীরকম রাজনৈতিক এলাকাতেই চোখে পড়ে এগুলোর প্রাচুর্য। রজনীর মনের মধ্যে পোস্টার মারার কথায় বেশ উষ্ণ উৎসাহের সঞ্চার হয়। বাখুরী গাঁয়ে এবার যে একটা অভিনব ধরনের মিটিং হবে সে বিষয়ে তার সন্দেহ নেই।

পদ্ম উঠোন ঝাট-দেওয়া ময়লাগুলো ঝোড়ায় তুলছিল। রজনী তাকে পিছন থেকে এত জোর গলায় ডেকে বসল যে চমকে উঠল পদ্ম।

তাড়াতাড়ি হাত ধুয়ে নাও দিকি। একটা বড় জামবাটিতে করে মুড়ি আর গুড় দাও। নিখিলবাবুকে খেতে দি।

পদ্ম বলে—ভাসুর ওদিকে গাছের নারকেল পাড়াতে গেল যে।

সুভদ্রা তার ঘর থেকে রজনীকে ডাকে—হ্যাঁরে ও রজনী, যে বাবুটি এসেছেন কে উনি?

রজনী এক কথায় জবাব দেয়—ও তুমি চিনবে নি।

বলেই বীণাপাণির ছিচকাঁদুনে রোগা মেয়েটাকে কোলে তুলে নিয়ে সে সদরে চলে যায়।

উনিশ

ভুতুর মাথায় একটা নতুন পরিকল্পনা এসেছে। নিজের গ্রামে সে 'রবীন্দ্র-জয়ন্তী' উৎসব করবে। এখানে এ-উৎসব কখনো হয় নি। কিন্তু ভুতু নিজের গ্রাম ছাড়া অন্যান্য যে-সব জায়গায় যাতায়াত ও মেলামেশা করে, সেইসব শিক্ষিত আধা-শিক্ষিত এলাকায় এ-উৎসব বৎসরে নিয়মিত হয়ে থাকে। ভুতু নিজেও সে-সব উৎসবানুষ্ঠানে যোগ দেয়। কোন কোন জায়গায় সার্বজনীন দুর্গোৎসব বা সরস্বতী পূজোর চেয়ে 'রবীন্দ্রজয়ন্তী' উৎসব যথেষ্ট ঘটা ও প্রচুর অর্থব্যয় করেই হয়ে থাকে। গত বৎসর এক জায়গার অনুষ্ঠানে অভিনীত হয়েছিল 'সিরাজদ্দৌলা'। ভুতু সেজেছিল গোলাম হোসেন। কলকাতা থেকে আনানো হয়েছিল কনসার্ট পার্টি ও ইলেকট্রিক লাইট। আরও উল্লেখযোগ্য যে স্ত্রী-ভূমিকায় অভিনয় করেছিল মেয়েরাই। ভুতুর মাথায় পরিকল্পনাটা ঢোকার পর থেকে সেও মেয়েদের দিয়ে মেয়েদের ভূমিকা অভিনয় করিয়ে একটা থিয়েটার করার কথা ভেবেছে। কিন্তু শুদ্ধ

উচ্চারণে দশ লাইন কথা বলতে পারে এবং ঘরের লোকের বাইরে দশজনের সঙ্গে কথা বললে চরিত্র অশুদ্ধ হয় না এমন মেয়ের কথা ভাবতে গিয়ে সে বুঝতে পারে তার উদ্যম কতখানি অসম্ভব রকমের অবাস্তব।

অবশেষে স্ত্রী-ভূমিকা বর্জিত একখানি নাটকের কথাই বাধ্য হয়ে ভাবতে হয় তাকে। কিন্তু মন তৃপ্ত হয় না। ছেলেমানুষদের জন্যে লেখা নাটকে ছেলেমানুষী অভিনয়ে তার শিল্পী আত্মা তৃপ্ত হবারও কথা নয়। মাঝে মাঝে কলকাতায় গিয়ে থিয়েটারে স্বনামধন্য অভিনেতাদের অভিনয় সে দেখে এসেছে। সিনেমাতেও নিত্য দেখে থাকে। এবং যা সে একবার দেখে তা পরমুহূর্তে কার্বন-কপির মত নকল করতে পারে। 'রবীন্দ্র-জয়ন্তীতে' 'সিরাজদ্দৌলা' বা 'দেবলাদেবী' কিংবা 'সাজাহান' জাতীয় কোন নাটক অভিনয় করতে পারলে সে গ্রামের লোককে দেখিয়ে দিতে পারত দু-বার ম্যাট্রিক ফেল করা ছেলে হিসেবে তাকে যতই অবজ্ঞা ও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা হোক, আগামী কালের কী বিরাট প্রতিভাধরের সম্ভাবনা তার মধ্যে সঞ্চিত ও সুপ্ত হয়ে আছে।

তুতু আক্ষেপের সঙ্গে ভাবে এটা ঘটাতে পারলে গ্রামে একটা 'রেভলিউশন' হয়ে যেত।

সে শিবুকে বলে—জানিস, ঐ গোমড়া-মুখো পাকা-মাথাগুলো তাহলে দেখতিস মনের জ্বালায় টিকটিকির কাটা লেজের মত ছটফট করত। অথচ করবেটাই বা কী! হেঁজী-পেঁজী অন্য কেউ হলে দাবড়ী-দাবড়া দিয়ে শাসন করা যেত। এখন খোদ গিরীশ চক্রবর্তীর ছেলেকে কে কোন্ সাহসে ঘাঁটাবে?

শিবু বলে—পাবলিকলি কিছু না করলেও চাঁইরা কিন্তু নিজেদের মধ্যে নিন্দে-সমালোচনা করতই।

তাতে কাঁচকলা, ওরা যত খেপবে, ততই ত আমার মজা। সেবার কি করলাম জানিস না? মেজদিকে শ্বশুরবাড়ী থেকে আনছি। বাজারে গাড়ী থেকে নেমেই দেখি ঘোষাল-কাকা। ওঁকে দেখেই তখুনি মাথায় একটা মতলব খাটিয়ে নিলাম। মেজদিকে নিয়ে গট্‌গট্ করে ঢুকে পড়লুম নরেন সাউ-এর দোকানে। মেজদির আদৌ খিদে পায় নি। জোর করে চারটে রসগোল্লা খাওয়ালাম। আমি চা খেতে খেতে এমন কায়দা করে আড়াল থেকে সিগারেট ধরালাম যে ধোঁয়াটা চোখে পড়বে কিন্তু মুখ দেখা যাবে না। এই হচ্ছে ঐ-রকম সব কুনো লোকদের সাঁচ্চা ওষুধ।

তুতুদের নিজস্ব কোন ক্লাব নেই। বাজারে চায়ের দোকানেই তাদের নিয়মিত

আড্ডা। 'রবীন্দ্র-জয়ন্তী'র প্রস্তুতি-পর্বটাও চলে সেখানে। নাটকের সমস্যা সমাধানের পর তাদের কাছে আরেকটি নতুন সমস্যা দেখা দিয়েছে রবীন্দ্র-সংগীত গাইবার লোকের অভাবে। গৌরাঙ্গ বলেছিল তার চেনা-জানা একজন ডাক্তার তাঁর মেয়েকে রবীন্দ্র-সংগীত শেখান। ডাক্তারটির বাড়ী বেশ কিছু দূরে হলেও তিনি মাঝে মাঝে বাখুরীর বাজারে আসেন। গৌরাঙ্গ বাজারের ভেতর সেই ডাক্তারের সন্ধানে বেরিয়েছিল। ভুতু শিবু নিতাই বাদল এরা জনচারেক নরেন সাউ-এর চায়ের দোকানে বসে চা খেতে খেতে চাঁদার লিষ্ট তৈরি করছিল।

এমন সময় সাইকেলে চেপে নৃপেন এল সেখানে। নৃপেনের বাড়ী অনেকটা দূরে। এই থানার একেবারে শেষ প্রান্তে। পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের মধ্যে ঐ জায়গাটি বেশ শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত এলাকা হিসেবে খ্যাত। ছেলেদের জন্যে ছাড়াও মেয়েদের জন্যে সেখানে স্বতন্ত্র উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় আছে, জমকালো লাইব্রেরী আছে, অসংখ্য ক্লাব প্রতিষ্ঠান আছে। অধিকাংশ লোকই ভাল চাকুরে। অনেকে বড় অফিসার। নৃপেনের বাবাও বড় অফিসার।

নৃপেনকে দেখেই ভুতু বলে—এই নৃপেন, একটা মেয়ে যোগাড় করে দিবি?

নৃপেন সাইকেলের হ্যাণ্ডেল থেকে রেশন ব্যাগটা খুলে চায়ের টেবিলে ভুতুর মুখোমুখি বসে বলে—কেন, বিয়ে করবি?

বিয়ের কথায় ভুতু গম্ভীর হয়ে যায়। এই ব্যাপারে তার মনে একরকম প্রচ্ছন্ন অহঙ্কার আছে। নিজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বিপুল উচ্চাশার ফলে এবং সাধারণ জীবনযাত্রা থেকে তার জীবনের লক্ষ্য উদ্দেশ্য ও আদর্শ স্বতন্ত্র হওয়ার ফলে ভুতু তার অন্তরের গভীর কেন্দ্রে এমন একটি গৌরবোজ্জ্বল ক্ষেত্র প্রস্তুত করে নিয়েছে যেখানে সহজেই যে কোন রকম একটি মেয়ের জন্যে ভালবাসার বেদী রচনা করা সম্ভব নয়। সে চায় শিক্ষিতা, সুরুচি-সম্পন্না, আধুনিক স্মার্ট মেয়ে। নাচ-গান সম্পর্কেও জ্ঞান থাকবে। এমন কি মোটর ড্রাইভিং-এও। অর্থাৎ যে সব গুণাবলী সে সিনেমার নায়িকাদের মধ্যে দেখে থাকে। স্বামীর শ্রীচরণের সেবাদাসী, শ্বশুরের জন্যে তামাক সাজবে, শাশুড়ীর পা টিপবে, আর বংশরক্ষার জন্যে বাৎসরিক হিসেবে গর্ভে সন্তান ধারণ করবে, তেমন কোন সাত হাত ঘোমটা টানা কাপড়ের পুঁটলিকে স্পর্শ করার দুর্ভাগ্য তার জীবনে যেন না ঘটে।

ভুতু নৃপেনের জবাবে বাঁকা কটাক্ষের সঙ্গে বলে—তেমন মেয়ে আছে না কি রে তোদের ওখানে?

একজন ছিল। পরশু পালিয়েছে।

তার মানে?

ভুতু ও তার বন্ধুরা টেবিলে ঝুঁকে আসে।

তুই ত মনোরঞ্জনকে চিনতিস। মনোরঞ্জন ঘোষচৌধুরী। ওর মেজ বোন মনোরমাটা দেখতে শুনতে বেশ ভাল মেয়ে। বেশ শান্তশিষ্ট। ক্লাস নাইনে পড়ছিল। গান শেখার ইচ্ছে ছিল। পাড়াতেই শিখতে যেত একজনের কাছে। গান শেখে এইটুকুই আমরা জানতুম। কয়েকটা অনুষ্ঠানে শুনেওছি। ভালই গাইত। গতকাল শুনি সে নাকি এক ছোঁড়ার সঙ্গে পালিয়েছে। গ্রামে হৈ-চৈ। বাড়ীতে কান্নাকাটি। কেলেঙ্কারী।

শিবু মেয়েটির বাড়ীর লোকের কান্নাকাটিকে নিবৃত্ত করার একটা মহৌষধ বাতলে দেওয়ার মত ভঙ্গীতে বলে—থানায় গিয়ে পুলিসে খবর দেয় নি?

নৃপেন মাথা নেড়ে 'না' জানায়।

ভুতু কিছুক্ষণ গম্ভীর থেকে বলে—আচ্ছা, ছেলেটাও গান শিখত কি?

আরে না। ছেলেটা একেবারে অজ মূর্খ। তবে টাকা-পয়সা হাতে ছিল প্রচুর। মনোরঞ্জনের বাড়ীতে ছোঁড়ার যাতায়াতও নাকি ছিল। মাসী বলে ডাকতো। বিপদে-আপদে টাকা পয়সা দিয়ে কবে-কবে সাহায্যও করেছে। ফেরত চায় নি কোনদিন। এখন সুদের সুদ তস্য সুদ আদায় হয়ে গেল।

শিবু আবার প্রশ্ন করে—কেন, থানায় খবর দিল না কেন?

নৃপেন বিরক্তিসূচক মুখভঙ্গী করে জবাব দেয়—ঘোষচৌধুরী বংশের একটা সুনাম আছে বলে। তা ছাড়া আরও কারণ নেই কিছু কি? চোখের জল মানুষের চোখে কদ্দিন গড়াবে? আজ বাদে কাল থামবেই। কিন্তু ইতিমধ্যে যে মস্ত বড় একটা দায় থেকে অব্যাহতি পাওয়া গেল। মেয়েটার বিয়ের ঝামেলা চুকে গেল। সংসারে উপায় ত ঐ একজনের, মনোরঞ্জনের। আগে ওর বাবার পেনসনের টাকাটা আসত। সেটা বন্ধ হয়ে গেছে। সুতরাং ঈশ্বর যা করেন—

সব কিছু বলার পিছনে ভুতুকে উপলক্ষ্য করে নৃপেনের একটু সূক্ষ্ম ব্যঙ্গ ছিল। কারণ মেয়েদের সম্পর্কে কথা উঠলে ভুতু সব সময় স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রী-স্বাধীনতার স্বপক্ষে সাধ্যমত বহু ইংরেজী-বাংলা কোটেশান লাগিয়ে তর্ক করে।

ভুতু সেটা বুঝতে পেরে যথেষ্ট দৃঢ়তার সঙ্গে বলে—বেশ হয়েছে। তোর-আমার মত নাড়ুগোপালের দেশে ঐ রকম দু-একটা পৃথ্বীরাজ জন্মানো দরকার

নৃপেন হেসে বলে—তোর খুশী হবার মত আরও কয়েকটা ইনফরমেশান দিতে পারি। তোর সঙ্গে সিনেমা হাউসে দেখা হবার কদিন পরে ঐ সিনেমা হাউসের কাছেই একটা ভ্রূণ পাওয়া গিছল। আজকাল অন্যান্য জায়গাতেও পাওয়া যাচ্ছে হরদম। এই হল এক নম্বর। দু-নম্বর হল আমাদের স্কুলের সেক্রেটারী অক্ষয়বাবুর যে মেয়েটা গত বৎসর ডাক্তারী পাস করল, নাম হল সুমিত্রা, সে ইণ্টারকাষ্ট বিয়ে করছে কলকাতায়। সব ঠিকঠাক। ওহো, দেখেছিস, সব থেকে জবর খবরটাই ভুলে যাচ্ছিলাম। একটা প্রকাণ্ড জাল নোটের কারবার ধরা পড়তে পড়তে—

নৃপেন হঠাৎ মুখের সমস্ত উজ্জ্বলতাকে নিভিয়ে ম্লান হয়ে গেল।

শিবু বললে—কি হল ধরা পড়তে পড়তে ?

ইস, অনেক দেরি হয়ে গেল। আমি এসেছিলাম মোরগ কিনতে। সব হয়তো খতম হয়ে গেল এতক্ষণে।

বাখুরীর বাজারে মোরগের দর সস্তা। তার কারণ আশে-পাশেই মুসলমান পল্লীর প্রাচুর্য।

নৃপেনকে তখুনি উঠতে দেখে ভুতু বলে—আরে বোস একটু। চায়ের অর্ডার দিলাম যে। নরেন্দা, একটু হাত চালিয়ে—

চা খেয়ে নৃপেন চলে গেলে গৌরাঙ্গ দোকানে ঢোকে। তার মুখ দেখেই ভুতু বুঝতে পারে ডাক্তারের দেখা মেলে নি।

কি ব্যাপার, হোপলেস ত ?

হ্যাঁ, এখনও আসে নি। তবে আসবেই একবার। সময় আছে এখনও।

তুই তাহলে চলে এলি কেন ?

বাঃ রে, একটু চা খাই। তখন ঠাণ্ডা চা-টা খেয়ে মৌজ হল না।

গৌরাঙ্গ একটা চারমিনার সিগারেট ধরায়। প্রথম ধোঁয়াটা ছেড়ে বলে—বাজারে বক্তৃতা হচ্ছে জানিস ? বেশ গরম গরম বক্তৃতা রে। ভদ্রকল্যাণপুরের সেই নিখিল এসেছে বক্তৃতা দিতে। বাজারে কবে নাকি মিটিং হবে শুনলাম।

ভুতু বলে—নিখিল চাটুয্যে ? বলিস কি ? ওরে বাবা, ওযে সাংঘাতিক ছেলে। এখানে এসেছে নাকি ? জ্বালিয়ে দেবে তাহলে গ্রামটাকে। একটা ঘটনা বলি শোন, আমি তখন ক্লাস এইটে পড়ি। স্কুলের গ্রাউণ্ডে পনেরোই আগষ্টের মিটিং হচ্ছে। স্থানীয় বড় বড় নেতারা একেবারে পাট-ভাঙা সাদা ধবধবে খদ্দর পরে সারবন্দী চেয়ার টেবিলে বসেছেন। পতাকা উত্তোলন হল। গান হল বন্দেমাতরম।

জুটো একটা বক্তৃতা শুরু হয়েছে। এমন সময় প্রায় জন ষাটেক ছেলেকে নিয়ে নিখিল নতুন করে মিটিং শুরু করে দিলে গ্রাউণ্ডের সামনের রাস্তার ওপর। আমাদের মিটিং ভেঙে যাবার মত অবস্থা। একটা টুল যোগাড় করে তার ওপর দাঁড়িয়ে নিখিল একাই বক্তৃতার আগুন ছুটিয়ে দিলে। সত্যিকারের আগুন জ্বালানো হল তার পরে। পোড়ানো হল ন্যাশনাল ফ্লাগ। একেবারে কংগ্রেসী নেতাদের চোখের সামনে। কী দুর্দান্ত সাহস! এই-বয়সে যে কতবার জেল খেটেছে তার ঠিক কী আছে। আরও একটা মস্ত গুণ ছিল ছেলেটার। খুব ভাল লিখতে জানতো। তখন ঐখান থেকে একটা ছাপানো কাগজ বেরত। নাম ছিল 'অগ্নিকোণ'। তাতে একবার একটা প্রবন্ধ পড়েছি ওর। রবীন্দ্রনাথকে প্রতিক্রিয়াশীল-ফ্রতিক্রিয়াশীল বলে সমালোচনা করেছে। আজকাল লেখে কি না কে জানে!

শিবু জিজ্ঞেস করে—আলাপ আছে তোর সঙ্গে?

আলাপ? না, আলাপ নেই, তবে মুখ-চেনা আছে।

আলাপ করতে পারিস?

কেন?

আমাদের এত ভাবনা চুকে যায় তাহলে।

ব্যাপারটা কি বলত শুনি।

ওদের যে-সব নাচ-গান-অভিনয়ের স্কোয়াড আছে না, তারা দেখবি প্রায়ই এখানে ওখানে অনুষ্ঠান করতে যায়। নিখিলের সঙ্গে আলাপ করে ওদের স্কোয়াড থেকে গোটা কতক ছেলেমেয়েকে আনাতে পারলেই ত কেল্লা ফতে।

বাদল জিজ্ঞেস করে—রবীন্দ্র সংগীত গাইবার লোক আছে ত?

হ্যাঁ হ্যাঁ আছে। আজকাল ওরা আর আগের মত জঙ্গী নেই।

মঞ্জুলা বলে একটা মেয়ে গান গায়, মেয়েটার চেহারা সর্বহারার মত হলে কি হবে, গায় কিন্তু দুর্দান্ত।

গৌরাঙ্গ ঠাট্টা করে শিবুকে—তুই রবীন্দ্র সংগীত কাকে বলে বুঝিস ত? যা নাকি সুরে গাওয়া হয় তাকেই রবীন্দ্র সংগীত বলে না কিন্তু।

শিবু মুখ বিকৃত করে জবাব দেয়—আরে যা যা, বেশী ফুট কাটিস নি। আমার সেজ পিসেমশায়ের বড় মেয়ে শান্তিনিকেতনের ছাত্রী, বুঝলি। রেডিও থেকে তাকে কতবার চান্স দিতে চেয়েছে, নেয় নি। রেডিও-তে যারা রবীন্দ্র সংগীত

গায়, তাদের ওপর সে হাড়ে-চটা। ওদের বংশটাই গান-পাগল। পিসেমশায়ের মেজ মেয়েটা আবার—

উৎসাহের ঝোঁকে শিবু তার পিসেমশায়ের বংশ-পরিচয় দিতে উদ্যত হলে বাদল বলে—থাম্ বাবা, সেজ পিসেমশায়ের মেজ মেয়ে, মেজ পিসেমশায়ের সেজ মেয়ের গল্প শুনে কাজ নেই। তুই যে গান বুঝিস তার ত প্রমাণ পাওয়া গেল, আর কেন?

শিবু চটে গিয়ে কিছু একটা জবাব দিতে যাচ্ছিল। ভুতু নেতার মত দৃঢ়ভাবে ওদের দাবড়ি দিয়ে থামায়। সে গৌরাঙ্গকে জিজ্ঞেস করে—মিটিং করেই কি নিখিল চলে যাবে না থাকবে কোথাও?

গৌরাঙ্গ বলে—এই দুপুরে যাবে কি? কি করে যাবে? আচ্ছা, আমি জেনে এসে বলতে পারি। রজনীকে জিজ্ঞেস করলেই জানা যাবে।

রজনী? ওহো, হ্যাঁ, রজনী ত এখন মিটিং নিয়ে মেতেছে খুব।

ভুতু বাড়ী ফেরার মুখে জানতে পারে নিখিল রজনীর বাড়ীতে থাকবে মিটিং না হওয়া পর্যন্ত। যে ঠিক করে যত শীঘ্র পারে নিখিলের সঙ্গে আলাপ করবে।

কুড়ি

বিকেলে ভুতু মাধুরীর কাছে সঞ্চয়িতাখানা চাইতে এসেছিল।

ঘরে ঢোকার মুখে আগে দেখা হয়ে গেল বড় গোসাঁই-এর সঙ্গে। বেগুন গাছের গোড়ায় ঘাস মারছিলেন দাউলি চালিয়ে। ভুতুকে দেখেই হেসে বললেন—কি হে ভুতনাথ, কবে হচ্ছে তাহলে?

অবিনাশবাবু ভুতুর দাদামশাই। পরস্পর দেখা হলেই বড় গোসাঁই ভুতুকে এই সম্ভাষণ জানান। বাক্যটির তাৎপর্য হচ্ছে ভুতু কবে বিয়ে করছে। করলে জীবনের শেষ কটা দিন নাতবৌকে নিয়ে রসোপভোগ করবেন তিনি।

ভুতুও সমান রসিকতা করে বলে—ইংরেজীটা শিখুন দেখি আগে। মেম বিয়ে করবো, তার সঙ্গে কথা বলতে পারলে হয়।

বড় গোসাঁই বলেন—হুস্, ভারী রে তোর ইংরেজী। বলবো দেখবি? হ্যাট-ম্যাট—ক্যাট—হলো? তাতেও যদি না বুঝতে পারে জোরসে এক দাবড়ি দুবো—ক্যাট্।

ভুতু হাসতে হাসতে ওপরে উঠে লক্ষ্য করলে মাধুরীর মুখটা অপ্রসন্ন। যদিও ভুতুর সঙ্গে ব্যবহারে তেমন কোন অসংগতি ধরা পড়ল না।

ভুতু সঞ্চয়িতাখানা চেয়ে নিয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে একটা কবিতা পড়তে শুরু করে দিলে। পড়া শেষ করেই মাধুরীকে প্রশ্ন করলে—আচ্ছা, মামী আপনি এতকাল কলকাতায় থাকলেন, আর রবীন্দ্র সংগীতটা শিখতে পারলেন না ?

মাধুরী শুকনো কাপড়গুলো পাট করতে করতে বললে—কলকাতায় থাকলেই বুঝি রবীন্দ্র সংগীত শিখতে হয় ?

না, তা নয়। তবু শিখলে বেশ হতো। গান শেখাটা ত খারাপ নয়।

জেরা করার ভঙ্গীতেই মাধুরী বলে—কি হতো শিখলে ?

কি আর হতো। আমরা গান শুনতাম। আপনারও কি আর গাইতে ভাল লাগতো না ? খুব ভাল গাইতে পারলে আর একটি জিনিস হতো। নাম হতো, খ্যাতি হতো, পয়সা হতো।

মাধুরী আবার বাঁকা প্রশ্ন করে—তুমি কি করে বুঝলে গান শেখার ইচ্ছা আমার ছিল না।

ভুতুর হাস্যোজ্জ্বল মুখখানা মাধুরীর নিরাবেগ দৃষ্টিপাতে মলিন হয়ে যায়। ভুতু স্তব্ধ থাকে কোন উত্তর না দিয়ে।

মাধুরী ভুতুর দিকে পিছন ফিরে দেয়ালের কোণের আলনায় কাপড়গুলো গুছতে গুছতে অস্পষ্ট স্বগতোক্তির মত বলে—জীবনে যে যা চায়, তার সবই কি পায় নাকি ?

ভুতু বিমূঢ় হয়ে যায়। মাধুরীর সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা খুব গাঢ় নয়। বিয়ের পর ভুতু প্রথম দিকে অনেকবার চেষ্টা করেছিল মাধুরীর চরিত্রের খুঁত বা ত্রুটিগুলো খুঁজে বার করতে। গ্রামের বয়স্ক সংস্কারাচ্ছন্ন মানুষের মতই ভুতুর মনেও প্রথম দিকে একটা অকারণ ঈর্ষা ও বিদ্বেষ পোষণের মনোভাব উগ্র হয়ে উঠেছিল। কিন্তু মাধুরীর কপটতাহীন সরল ব্যবহার, অনাড়ম্বর বেশভূষা ও গুরুজনের প্রতি অবাধ আনুগত্য আত্মীয়-পরিজন নির্বিশেষে সকলকেই মুগ্ধ করে তুললে। তা সত্ত্বেও ভুতুর মনে কয়েকটি প্রশ্ন জবাবের প্রত্যাশায় চঞ্চল হয়েছে বহুবার। মাধুরীর জীবনের সার্থকতাটা কোনখানে ? শিক্ষিতা হয়েও সে এই অশিক্ষিত গ্রামাঞ্চলের কুসংস্কারাচ্ছন্ন সংসারের সঙ্গে এমন বিরোধহীন সংঘাতহীন সামঞ্জস্যে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারছে কি করে ? এসব প্রশ্নের কোন সমাধান ঘটে নি এ পর্যন্ত।

ফলে মাধুরীর চরিত্র ভুতুর কাছে এযাবৎ রহস্যময় ও দুর্ভ্রময় হয়ে থেকেছে।
মাধুরীর এখনকার কণ্ঠস্বরে ভুতু অনুভব করল যে তার অন্তরের কোন একটি সুপ্ত বেদনা বা অবরুদ্ধ আক্ষেপ আত্মপ্রকাশ করতে চাইছে। মাধুরীর সঙ্গে অন্তরঙ্গ হওয়ার ইচ্ছায় ভুতু প্রস্তুত করল নিজেকে।
মামী, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব?
কি কথা?
আমাদের এই গ্রাম আপনার ভাল লাগে?
হ্যাঁ।
ওটা ত দায় সারা উত্তর হল। সত্যি বলুন না। এখানকার আচার-ব্যবহার, মানুষ-জন, কথা-বার্তা, আর যেটা সবচেয়ে মারাত্মক, গ্রামের এই প্রাণহীন নির্জনতা আপনার ভাল লাগে?
তুমি প্রাণহীন বললে কেন?
প্রাণহীন নয় কি সত্যিই? সন্ধ্যে সাতটার পর থেকে মানুষ ঘুমোয় আর কুকুর শেয়ালেরা জাগে। উৎসব নেই, পার্বণ নেই। মানুষের সঙ্গে মানুষের স্বার্থ ছাড়া কোন সম্পর্ক নেই, স্বার্থপরতা ছাড়া উদ্দেশ্য নেই। শিক্ষা-দীক্ষা-সংস্কৃতির চর্চা নেই। শুধু খাচ্ছে-দাচ্ছে-ঘুমোচ্ছে আর বংশ বৃদ্ধি করছে। প্রাণহীন নয় বলছেন? আমারই খারাপ লাগে। আপনার ত বেশি লাগার কথা। শহরে মানুষ হয়েছেন।
মাধুরী প্রতিবাদ করে—না ভুতু, আমি শহরের মেয়ে নই। শহরে কিছুকাল মানুষ হয়েছি এইটুকু বলতে পার।
তার মানে?
আমার দাদারাই কলকাতায় মানুষ হয়েছেন। বড় দিদিও। বাড়ীর মধ্যে সবচে ছোট ছিলাম বলেই মায়ের মৃত্যুর আগে পর্যন্ত বাবার সঙ্গে আমি জলপাইগুড়িতে থেকেছি। কলকাতায় এসেছি কত বছর আর। ছ-সাত বছর হবে মাত্র।
ভুতু হেসে বলে—মাত্র হল ছ' সাত বছর?
আমি জন্মেছিলাম আমাদের দেশের গ্রামে। নদীয়ায়। ছেলেবেলা থেকেই গ্রামের সঙ্গে আমার মনের যোগাযোগটা বেশ নিবিড়। শহরকে বরং এখনও আমার ভয় করে। প্রতিমুহূর্তে মনে হতে থাকে যেন মৃত্যু পিছনে পিছনে হেঁটে আসছে। আমাদের পাড়ার একটা সুন্দর ব্রিলিয়ান্ট ছেলে গতবছর হেদোয়

সাঁতার কাটতে গিয়ে ডুবে মরে গেল। বাসে ট্রামে চাপা পড়ে কত লোককেই ত কতদিন মরতে দেখেছি। অথচ গ্রামে কি কম দৌরাত্ম্য করে দিন কাটাতাম? ছেলেবেলার অধেকটা কেটেছে পেয়ারা গাছের ডালে, আর পুকুরে সাঁতার কেটে। তবে গ্রামের দুটো জিনিষকে কেবল আমার ভয় করে। আগুনকে আর বজ্রাঘাতকে।

আর গ্রামের তেড়েল-মাতাল মানুষগুলোকে ভয় করে না? চোর-ডাকাতের ভয় নেই?

সে ভয় ত শহরেও আছে। শহরের চোর-ডাকাতেরা মানুষকে একদম প্রাণে মারে। এখানে নিশ্চয়ই মানুষ এতখানি পাশবিক হয়ে ওঠে নি। তার কারণ শহরের শিক্ষিত চোর-ডাকাত গুণ্ডারা ইংরেজী ফিল্ম দেখে, ক্রাইম উপন্যাস পড়ে মনের কুৎসিত আদিম প্রবৃত্তিগুলোকে চরিতার্থ করার জন্যেই ঐ সব দুস্কার্য করে। কিন্তু যতটুকু আমার মনে হয় এখানকার চোর-ডাকাত গুণ্ডা বদমাইস যারা, তারা নিছক পেটের দায়েই বছরের কয়েকটা মাস ঐসব দুষ্কর্ম করে কিন্তু বাকী সময়টা তারা সকলেই স্নেহশীল বাপ, দায়িত্বশীল স্বামী, পরিশ্রমী মজুর, মাঠের একনিষ্ঠ কৃষক। তাই না?

মাধুরী থামলে ভুতু ভাবে, যুক্তি দেখানোর মত কিছু জ্ঞান জাহির করার ঝোঁকেই মাধুরী এসব বলছে। আর এসব যদি তার মনের খাঁটি কথাই হয়ে থাকে, তাহলে একটু থামো বাপধন, বর্ষাকালটা আসুক, ধুলো মাটি আর রাস্তার ধারের গু-গোবর-নোংরা এসব বৃষ্টির জলে একাকার হয়ে যখন এক হাঁটু দই হয়ে উঠবে, তখন তোমাকে একদিন সেই রাস্তায় হাঁটিয়ে নিয়ে আসবো। তার পর দেখবো তোমার গ্রামকে ভালবাসার দৌড়টা কোথায় গিয়ে থামে।

মাধুরী প্রশ্ন করে—তোমায় বুঝি শহর ভাল লাগে খুব?

ভুতুর মনে হল সত্যি কথাটা প্রকাশ করলে মাধুরী হয়তো তাকে নিতান্ত গেঁয়ো ভাববে। সে তাই ভেবে-চিন্তে উত্তর দিলে—ভাল-লাগার কথা যদি বলেন, তাহলে বলবো গ্রামের মত এমন জায়গা নেই। তবে শহরের অনেকগুলো সুবিধেও রয়েছে কিনা। সংস্কৃতির প্রয়োজনেই শহরটা বড়। এই ধরুন, আমার বহুকালের ইচ্ছে সেতার শিখবো, রবীন্দ্র সংগীত শিখবো, অভিনয় শিখবো কিন্তু ইচ্ছে করলেই কি এখানে সে-সবের সুবিধে-সুযোগ ঘটবে? শহরে এ-সবের কত সুবিধে। আসলে কি জানেন, একটু

বড় হওয়ার কথা ভাবতে গেলেই শহরের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া উপায় নেই। কেননা শিক্ষা-সংস্কৃতি এসব ব্যাপারের বড় মানুষগুলো, বড় প্রতিষ্ঠানগুলো সবই শহরে কিনা।

ভুতু থামলে মাধুরী তীক্ষ্ণ মন্তব্য করে—তবুতো গান গাইবার সময় গ্রামকে 'সোনার বাংলা' বলতে গদ্‌গদ হয়ে ওঠ সবাই।

ভুতু ভাবতে থাকে কথাটার কি জবাব হতে পারে। জবাব পাওয়ার আগেই মাধুরী আবার বলে—তুমি নিশ্চয়ই পুতুল নাচ দেখেছ। পুতুল নাচে মাথাটাই কেবল আসল মাথার মত দেখতে হয়। বাকী সবটাই দড়ি কাঠ আর সাজ-পোষাক। পুতুল নাচে পুতুলরা নাচে না। তারা নড়ে। নাচে তারাই, যারা নাচায়। সমস্ত ইলিউশানটা তৈরি হয় কেবল সাজ-পোষাক আর ঐ নিখুঁত রঙ-করা মাথাটা দিয়ে। আমার ছোড়দা, ছোড়দা হলেন পাঁড় কমিউনিষ্ট, বলতেন এই হল আমাদের দেশটার প্রতীক। মাথার চাকচিক্য দেখিয়ে পা-কাটা, গর্দানহীন, কাঠের হাতওয়ালা একটা দেশকে স্বাধীন স্বাধীন বলে খুব ঢাক-ঢোল কাঁসর-ঘণ্টা পিটিয়ে নাচানো হচ্ছে।

শুনতে শুনতে ভুতু আচ্ছন্নের মত তাকিয়ে থাকে মাধুরীর মুখের দিকে। ভুতুর কেবলই মনে হতে থাকে মাধুরীকে তার এ-পর্যন্ত যত সাদাসিধে গড়পড়তা মেয়ের মত মনে হয়েছিল, মাধুরী তা নয়। তার সামনের মূর্তিটা যতই অনাড়ম্বর হোক, মূর্তির পিছনের পটভূমিতে রয়েছে সত্যিকারের শিক্ষা-দীক্ষার বুদ্ধি-বৃত্তির অনুশীলন।

ভুতুর এমনি স্তম্ভিত হয়ে বসে থাকার মুহূর্তেই আঙুর নীচে থেকে দৌড়তে দৌড়তে উপরে এসে বললে—বৌদি বৌদি, সর্বনাশ—

সঙ্গে সঙ্গে ভুতুকেও দেখতে পেয়ে বললে—এই ভুতু, সর্বনাশ, আগুন লেগেছে, দাউদাউ করে ঘর পুড়ছে, কী আগুন ওরে বাস—

মাধুরী চমকে ওঠে আর ভুতু সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করে—কোথায়? কার বাড়ীতে?

আঙুর হাঁফাতে হাঁফাতে বলে—কার বাড়ীতে তা ত বোঝা যাচ্ছে না। তবে মনে হচ্ছে নারাণ ঘোষেদের বাড়ী। কত লোক ছুটছে।

নারাণ ঘোষের বাড়ী ভুতুদের বাড়ীর থেকে দু তিনটে বাড়ীর পরে। ভুতু সঞ্চয়িতাখানা মাধুরীর ড্রেসিং-টেবিলে ফেলে রেখেই দ্রুতগতিতে নীচে নেমে যায়। মাধুরী ও আঙুর তাদের বাড়ীর বারান্দায় দাঁড়িয়ে অগ্নিকাণ্ডের দিকে

তাকিয়ে থাকে। কিছুক্ষণ পরে সত্যবতী ও আঙুরের কাকীমাও ছুটে আসেন বারান্দায়।

সন্ধ্যার ছোঁয়া লেগে দিগন্তের সবুজ গাঢ় হয়েছে। বাতাসে মত্ত বেগ আর এলোমেলো গতি। মাধুরী ও আঙুরেরা বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখতে পেলে আগুনের হল্‌কা উঠছে শূন্যে। সেই রক্তাভ শিখাগুলোকে মাধুরীর মনে হল কোন বন্য মাংসাশী জন্তুর লালসাতুর জিহ্বার মত। ভয়ে ও আতঙ্কে সে এমন আড়ষ্ট হয়ে গেল যে ইচ্ছা সত্ত্বেও ঐ ভয়ঙ্কর দৃশ্য থেকে চোখ দুটো সরিয়ে নিতে পারলে না।

বারান্দার নীচের রাস্তা দিয়ে কয়েকজন লোককে ছুটতে দেখে সত্যবতী বললেন—একটু পা-চালিয়ে যারে বাবা। কুন অভাগার যে সর্বনাশটা হচ্ছে।

আঙুরের কাকীমা কেবল দাঁড়িয়ে থেকে হায় হায় করছিলেন আর কোলের ছেলেটার মুখ থেকে স্তনটা ছাড়িয়ে নিয়ে সেটা কাপড়ের আড়ালে ঢাকা দেবার চেষ্টায় ব্যর্থ হচ্ছিলেন বার বার।

দেখতে দেখতে কিছুক্ষণ পরে আগুনের তেজ পড়ে এল।

আঙুর আন্দাজ করেছিল বাড়ীটা নারাণ ঘোষের। তা নয়। বাড়ীটা তারও পিছনের সতীশ বেরার। খনখনে বাতাসকে সঙ্গী পেয়ে আগুনের চেহারাটা অল্পেই প্রবল ও উন্মত্ত হয়ে ওঠার ফলেই মনে হয়েছিল যে অগ্নিকাণ্ডটা কাছাকাছি কোথাও ঘটছে।

গ্রামের প্রায় অর্ধেক লোক জড়ো হয়েছিল ঘটনাস্থলে। এতগুলো মানুষ কে কোথায় ছিল, কোথা থেকে ছুটে এসে যে যেখানে বালতি কলসী হাঁড়ি গামলা যা পেয়েছে তাই নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সর্বভুখ অগ্নির ক্রুদ্ধ আক্রোশকে শান্ত করার সমবেত প্রচেষ্টায়। সতীশের বাড়ীর উঠোন দালান মেঝে জলে ভিজে কাদা হয়ে উঠেছে।

সতীশ খুব শক্ত মনের মানুষ। সে একই সঙ্গে আগুনে জল ঢেলেছে, বাড়ীর মেয়েদের কান্নাকাটি সোরগোল থামিয়েছে, আর অবিচলিত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে ঘরের দামী জিনিষপত্রগুলোকে সবার আগে সরিয়ে উঠোনে জমা করেছে। তার ক্ষতি যেটুকু হওয়ার হয়েছে গোয়ালঘরের। দু-একটা দুধের গাইয়ের গা পুড়ে ঝলসে গেছে। বসবাসের বড় ঘরের চাল গোয়ালের চালের সঙ্গে যুক্ত হওয়া সত্ত্বেও বড় ঘরের কোন ক্ষতি হল না। আগুন গোয়ালটাকে ভস্মসাৎ করেই নিভে গেল।

যে যাই করুক, যত জল ঢালুক, যতই তৎপরতা দেখাক সতীশ যে আজ ভয়ঙ্কর রকমের ধ্বংসের হাত থেকে সহজে উদ্ধার পেয়ে গেল তার কৃতিত্ব একমাত্র নিখিলের। নিখিল যথাসময়ে এসে না পড়লে এবং নিজের জীবনকে বিপন্ন করে আগুন নেভানোর কাজে ঝাঁপিয়ে না-পড়লে সর্বনাশ সতীশকে গাছতলার ভিখারী করে ছাড়তো। অন্য লোকেরা কাজ করছিল যত, অনর্থক হট্টগোল করছিল তার চেয়ে বেশী। নিখিল অগ্নিকাণ্ডের সামনে ছুটে এসেই দু-তিনজন লোককে সঙ্গে নিয়ে গোয়ালঘরের চাল আর বড় ঘরের চালের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করা পাঁচিলের চালটাকে কেটে উড়িয়ে দিলে। ব্যাপারটার তাৎপর্য প্রথম দিকে কেউ বুঝতে পারে নি। গোয়ালের চালটা সম্পূর্ণ পুড়ে যাওয়ার পরও আগুন যখন আর বড় ঘরের চালের দিকে এগিয়ে আসার অবলম্বন না পেয়ে গোয়ালের পোড়া বাঁশ কাঠের কাঠামোতেই নিষ্ফল মাথা কুটতে লাগল, তখন গ্রামের মানুষ বুঝল নিখিলের উপস্থিত বুদ্ধির উপকারিতাটুকু। সতীশ গদ্‌গদ কণ্ঠে বললে—আপনি আমার যা-করলেন সে আর মুখে কি বলব বাবু। ভগবান আপনাকে আশীর্বাদ করবেন।

একা সতীশ নয়, গ্রামের অন্যান্য লোকেরাও ধন্য ধন্য করল নিখিলকে। এই ঘটনায় বাখুরীর অধিকাংশ লোকের সঙ্গে নিখিলের অন্তরঙ্গ আত্মীয়তা ঘটে গেল। সকলের চেয়ে গর্বিত হল রজনী। আর নিখিলকে জানার গৌরব নিয়ে এই সুযোগে তার সম্পর্কে নানা চাঞ্চল্যকর তথ্য পরিবেশন করল নানাজনের কাছে।

খবরটা গিরীশবাবুর কানে গেল। ভদ্রকল্যাণপুরের একজন চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল। নিখিল কি সেই বাড়ীরই কেউ? নিখিলের সঙ্গে পরিচিত হবার কৌতূহল হল তাঁর।

সুযোগটাও ঘটে গেল আকস্মিকভাবে।

নিখিল বেরিয়েছিল পোষ্টার মারতে। সরকারের খাদ্যনীতির ওপর নিন্দাবাদ লেখা পোষ্টার। সে রাস্তার ধারের বাড়ীর দেওয়ালে পোষ্টারগুলো মারছিল, যাতে সহজেই সেটা পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে। এইভাবে এগোতে এগোতে সামনে এসে গেল একটা পুকুর। পাশ দিয়ে রাস্তা। পুকুরের পাড়ে গিরীশবাবুর পাকা বৈঠকখানা। নিখিলকে সেদিকে এগোতে দেখে রজনী বলল—শুনুন, ওদিকে আর যাবেন না।

কেন ?

ওটা গিরিশবাবুর বৈঠকখানা।

তাতে কি হয়েছে ?

ওঁর চোখে পড়লে এখুনি একটা সাংঘাতিক কাণ্ড ঘটে যাবে।

নিখিল তা সত্ত্বেও এগোয়।

রজনী বলে—আমি তবে এইখানে দাঁড়িয়ে রইলাম।

রজনী ছাড়াও গ্রামের আরও দু-একজন দেওয়ালে পোষ্টার মারার এই বিচিত্র কাণ্ডটিকে উপভোগ করার জন্যেই নিখিলের সঙ্গে হাঁটছিল। নিখিলকে গিরীশবাবুর বাড়ীর দিকে এগোতে দেখে রজনীর মত তারাও রাস্তার বাঁকে আসন্ন বিপর্যয়ের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইল। নিখিলের পিছু পিছু চলল কেবল কয়েকটি ন্যাংটো আধ-ন্যাংটো কচি-কাঁচা ছেলেমেয়ের দল।

ছেলেমেয়েদের কলরব শুনে বৈঠকখানা থেকে বেরিয়ে এসে গিরীশবাবু দেখতে পেলেন নিখিলকে। অপরিচিত মুখ দেখেই তিনি বুঝলেন, এই হল নিখিল।

তোমার নামই কি নিখিল ?

হ্যাঁ।

দ্যাখ, মুখ দেখেই চিনেছি তোমায়। হাতে ওগুলো কি ?

পোষ্টার।

পোষ্টার ? তোমাদের মিটিঙের পোষ্টার বুঝি ? দ্যাখ হে, খবর রাখি ঠিক। কালকেই কাকে যেন বলছিলুম তোমার কথা। এস, বৈঠকখানায় এস। আরে ও পোষ্টার তুমি পরেই না হয় মারবে। গোটা দেওয়াল পড়ে আছে। কত মারবে মারই না।

নিখিল গিরীশবাবুর বৈঠকখানার ভেতরে গেল। নিখিলকে ইজিচেয়ারে বসতে দিয়ে গিরীশবাবু পাশেই অন্য একটা চেয়ারে বসলেন।

তোমার বাড়ী ভদ্রকল্যাণপুরে, না হে ?

হ্যাঁ।

আচ্ছা। তারকনাথ চাটুয্যে কে হয় তোমার ?

আমার বাবা হন।

দ্যাখ, ধরেছি ঠিক। মুখের গড়ন দেখেই ধরেছি।

তারক আমার এক সময়ের বিশিষ্ট বন্ধু, বুঝলে। কি রকম আছে এখন সব ?

ছ' মাস আগের খবর আপনাকে বলতে পারি।

সে কি? তুমি বাড়ীতে থাক না নাকি?
না। ছ' মাস আগে একবার গেছলাম।
না, তোমরা দেখছি সত্যিই দেশটাকে তৈরি করে ছাড়বে। এই বয়সে এমন সর্বত্যাগী হতে পারলে কি করে হে? নিমাই হয়েছিল বটে। তোমরা সব এ-যুগের নিমাই। আমাদের ইহকাল-পরকাল দু-কালেই কালি। তোমাদের মত ছেলেদের দেখলে তবু মনে খানিকটা আনন্দ হয়। দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবনা থাকে না। আমার ছেলের সঙ্গে তোমার আলাপ আছে নাকি?
কি নাম বলুন ত?
ডাকে ভুতু বলে। নাম হল বিমান।
না বোধ হয়।
তাই কখনো থাকে? ঐ একটি মাত্র ছেলে আমার। তোমার বয়সে তুমি করছো দেশসেবা, আর সে বাপের পয়সা উড়িয়ে ফুর্তি করছে। পাড়ার যত বখাটে ছেলে তার এক গলার ইয়ার। তোমরা শুধু চাষা-ভুষোদেরই মঙ্গল করছো। তা এই সব ভদ্রঘরের অপোগণ্ডগুলোকেও মানুষ কর না একটু।
এই সব কথোপকথনের সময়ে ঘোষাল এসে গেল। গিরীশবাবু ঘোষালের সঙ্গে নিখিলের পরিচয় করিয়ে দিলেন। নিখিলের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলেন তিনি। সতীশের বাড়ীর অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাটা স্মরণ করে ঘোষালও নিখিলের তারিফ করলেন বিস্তর।
নিখিল উঠতে চাইলে গিরীশবাবু বললেন—উঠবে? কিন্তু বাবাজী আমার একটা অনুরোধ রাখতে হবে তোমাকে। তুমি তারকের ছেলে। আমার নিজের ছেলের মতই বলা যায়। তুমি আমারই গ্রামে এসে কদিন ধরে আছ তা ত জানতুম না। সেদিন সতীশের মুখেই তোমার কথা শুনলুম। যত কাজই থাক একবেলা অন্তত আমার বাড়ীতে অন্নগ্রহণ করতে হবে তোমাকে। একটু বোসো। চা-টা আসছে। খেয়ে যাও।
গিরীশবাবু নিখিলকে চা খাইয়ে নিজে রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন। গিরীশবাবুর বৈঠকখানার দেওয়ালে আর পোষ্টার মারা হল না নিখিলের।
নিখিল রমণীর বাড়ীতে কদিন ধরে থাকলেও রমণী নিখিলের সঙ্গে ক'দিন একটিও বাক্যালাপ করে নি। গিরীশ বাবু বৈঠকখানায় নিয়ে গিয়ে নিখিলকে আপ্যায়ন করেছেন শুনে নিখিল সম্পর্কে রমণীর মনে শ্রদ্ধা জন্মাল। সতীশের

বাড়ীর অগ্নিকাণ্ডের দিন থেকেই অন্তরে এই শ্রদ্ধার সূত্রপাত ঘটেছিল। সেদিন রাত্রে রমণী গায়ে পড়ে নিখিলের সঙ্গে আলাপ করতে এগিয়ে এল।

ভুতুর সঙ্গে নিখিলের অগ্নিকাণ্ডের দিন আলাপ হয় নি। ভুতু দূর থেকেই নিখিলের কার্যকলাপ লক্ষ্য করেছিল। আলাপ করার ইচ্ছা সত্ত্বেও সে এগোতে পারে নি। নিখিলের ব্যক্তিত্বের কাছে নিজেকে বড় ক্ষুদ্র মনে হচ্ছিল। গ্রামের লোকের মুখে নিখিলের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা তার মনে সামান্য ঈর্ষাও জাগিয়েছিল।

আলাপ হল কদিন পরে। ভুতু বললে—কাল আপনি আমাদের বাড়ীতে গেছলেন শুনলাম। বাবার সঙ্গে কথা হল বোধ হয়। জানেন, আমার বাবা হলেন একটা চরিত্র। মুখে দিনরাত রাধেকৃষ্ণ, রাধেকৃষ্ণ করছেন বটে, এদিকে কিন্তু এক পয়সার মা-বাপ। আমাদের এই চাষী-ভুষি মানুষগুলো কী গরীব, এক-বেলা জোটে তো আরেক বেলা জোটে না। তাদের কাছ থেকে পাওনা টাকা-পয়সা আদায় করার সময় ঠিক যেন জীবন্ত শাইলক। পিঁপড়ের পেট টিপে গুড় বার করার মত উনি এই গরীব মানুষের গলা টিপে টাকা আদায় করেন। এক এক সময় আমার কী মনে হয় জানেন—

নিখিলের মানব-চরিত্র কিছু কিছু জানা আছে। ভুতুর মানবপ্রেম যে কতটা খাঁটি আর কতটা খাদ মেশানো তা সে তাকে দেখা মাত্রই বুঝেছে। তাই তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ভুতুর মুখের দিকে তাকিয়ে নিখিল প্রশ্ন করে—কী মনে হয়?

ভুতু একটু হাসে। বড় বেদনার্ত দেখায় তার মুখখানা। যেন এতদিন এই সব নিপীড়িত মানুষের একটুও উপকার করতে না-পারার অনুতাপকে অনুভব করছে আজ।

না, থাক যা করতে পারি নি তা নিয়ে বড় বড় কথা বলে কি হবে বলুন। চলুন, বাজারে যাই। চা খাওয়া যাবে। আপনার সঙ্গে অন্য কথা আছে।

যেতে যেতে ভুতু নিখিলকে তার অভিনেতা হওয়ার বাসনায় কথা জানালে। কেন, কিভাবে এই বাসনা তার মাথায় এল, কতবার সে অভিনয় করে প্রাইজ পেয়েছে, গ্রামের এই গণ্ডীবদ্ধ পরিবেশে তার ক্ষমতার যথোচিত বিকাশ কী ভাবে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে, গ্রামের কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষগুলোর বিরুদ্ধে এক এক সময় কী রকম বিদ্রোহ ঘোষণা করতে ইচ্ছে করে তার, এই সব কথা বলতে বলতেই বাজারে এসে গেল তারা।

নিখিল মাঝে অল্প দু-একটা কথা বলেছিল। যেমন—সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখের কথা নিয়ে লেখা নাটকে অভিনয় করেন না কেন? জনগণের জীবনকে উন্নত

করাই ত শিল্পের কাজ। সত্যিকারের শিল্প ত দেশের অধিকাংশ জনসাধারণের জন্যে অর্থাৎ কৃষক-মজুরদের জন্যে গড়ে তুলতে হবে। সুতরাং এই সব সংগ্রামী মানুষের জীবন থেকে দূরে সরে থেকে তাদের জীবন থেকে শিল্পের উপাদান ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় না করেই কি সাধারণ মানুষের শিল্পী হবেন। আপনি আমাদের কোন নাটক দেখেছেন? কেমন লাগে? কেন ভাল লাগে ভেবে দেখেছেন। তার কারণ আমাদের শিল্পীরা নিছক ভাববাদী শিল্পী নন। এই বুর্জোয়া সভ্যতার নিষ্ঠুর পীড়ন-যন্ত্রকে ভেঙে শ্রমিক শ্রেণীর হাতে রাষ্ট্র ক্ষমতা তুলে দেওয়ার শপথে তারাও শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রামে সামিল হতে পেরেছেন।

চায়ের দোকানে ভুতু চা খেতে খেতে বললে—আমি এ বছর আমাদের গ্রামে রবীন্দ্র-জয়ন্তী করছি। আপনাকে তার বক্তা হতে হবে। তা ছাড়া আর একটা ব্যাপারেও সাহায্য করতে হবে আপনাকে। আমাদের এখানে রবীন্দ্র-সংগীত গাইবার লোক নেই। আপনাদের গণনাট্য গ্রুপ থেকে কয়েকজন গাইয়ে সংগ্রহ করে দিতে হবে।

নিখিল বললে—গাইয়ে যোগাড় করে দেওয়া খুব মুশকিল হবে। আমি ঠিক এখুনি কথা দিতে পারছি না। কেননা ঐ সময়ে প্রায় রোজই কোথাও না কোথাও অনুষ্ঠান থাকে। তবে আমি চেষ্টা করবো। রবীন্দ্র-জয়ন্তী করছেন, এটা একটা ভাল কাজ। আমরা যে সব জায়গায় রবীন্দ্র জয়ন্তী করি সেখানে এক কথাই জোর দিয়ে বলি যে রবীন্দ্রনাথ শান্তির কবি। আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ এই যে আরেকটা নতুন মহাযুদ্ধের প্রস্তুতি চালাচ্ছে এর আসল উদ্দেশ্যটা কি সেটা সাধারণ মানুষকে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার। আসল উদ্দেশ্য হল সোবিয়েত সমাজতন্ত্রের বিপুল সাফল্যকে ধ্বংস করা। পৃথিবীতে সমাজতন্ত্রের দুর্নিবার অগ্রগতিকে ব্যাহত করা। পৃথিবীর কোটি কোটি মেহনতী মানুষ তাই এই যুদ্ধের বিরুদ্ধে। তারা শান্তির স্বপক্ষে। বিশেষ করে ভারতবর্ষের মানুষ রাশিয়ার ওপর সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণকে কোনদিনই বরদাস্ত করবে না। কারণ ভারতবর্ষের মানুষ চিরকালই শান্তিকামী। তাই পৃথিবীর অন্যান্য শান্তিকামী দেশ অর্থাৎ সোবিয়েত ও চীনের সঙ্গে ভারতবর্ষের বন্ধুত্ব আজ এত দৃঢ় হয়ে উঠেছে।

নিখিল থামলে ভুতু বলে—নিখিলবাবু, আসুন আমাদের ক্লাবের মেম্বারদের সঙ্গে আপনার আলাপ করিয়ে দি।

একুশ

এতদিন ধরে বাখুরীতে যে মিটিঙের প্রস্তুতি চলেছিল আকস্মিকভাবে সেটার তারিখ পিছিয়ে গেল। শুনে বিমর্ষ হল রজনী।

ছোটবাবু বললেন—হ্যাঁ, রজনী, মিটিংটা পিছিয়ে দিতে হল। ঐদিন বাংলা-দেশের কৃষকেরা খাদ্যের দাবীতে কলকাতা অভিযান করবে। সমস্ত রাজনৈতিক দল এক হয়ে এই অভিযান আহ্বান করেছে। আমাদের গ্রাম থেকেও লোকজন যাতে যায়, তার ব্যবস্থা করতে হবে।

রজনী ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে না পেরে বলে—কলকাতা অত দূরে, লোকজন কি যেতে রাজী হবে?

কেন রাজী না-হওয়ার কি আছে?

রজনী আমতা-আমতা করে উত্তর দিতে গিয়ে।

আজ্ঞে, সে কথা নয়, যাওয়া ত উচিত। আমি বলছিলুম সময়টা খুব খারাপ যাচ্ছে কিনা মানুষের। নুন-তেলের পয়সা জুটে নি, লোকে কি অত পয়সা খরচ করে কলকাতায় যেতে পারবে?

ছোটবাবু বলেন—না-না পয়সা লাগবে না কারো। হাজার হাজার কৃষক যাবে ঐদিন। যারা খেতে-পরতে পায় না তারাই যাচ্ছে নিজেদের খাওয়া-পরার সুব্যবস্থার দাবী জানাতে। ভাড়া দেওয়ার পয়সা কোথায় পাবে তারা?

ছোটবাবুর এমন প্রবল যুক্তি ও উৎসাহ সত্ত্বেও রজনী তার মনের সন্দেহটা প্রকাশ না করে পারে না।

ধর-পাকড়, এরেষ্ট করবে না ত?

ছোটবাবু রজনীর অনভিজ্ঞতায় হাসেন।

করুক না। এ্যারেষ্ট করলেও ত ঐ কয়েক হাজার মানুষের খাওয়া-থাকার ব্যবস্থা করতে হবে সরকারকে। সেটা করলেও ত বেশ কিছু লোক না-খেয়ে মরার হাত থেকে বাঁচে। সারা জীবনই জেলখানায় পুরে রাখুক না তাদের। তুমি জান রজনী, চব্বিশপরগনার মায়েরা পেটের ছেলেকে পাঁচ সিকে দেড় টাকায় বিক্রি করছে। একে অন্নকষ্ট, তার ওপর পুকুরে-খানায় এক ফোঁটা জল নেই। মাঠ-মাটি ফেটে চৌচির। জল জল করে দু-বেলা গলা-ফাটিয়ে চীৎকার করছে মানুষ। গ্রাম ছেড়ে ভিটেমাটি ছেড়ে শহরের ফুটপাতে হাজার হাজার

কৃষক পরিবার ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে দাঁড়িয়েছে। মন্ত্রীদের কাছে এই সব অত্যাচার-অবিচারের কৈফিয়ত চাইলে তাঁদের মাথা হেঁট হয় না, গদি কেঁপে ওঠে না, তাঁদের অহিংসার বাণী তখন দুঃস্থ-দরিদ্র দেশবাসীর জীর্ণ-পঞ্জরাস্থির ভেতরে বন্দুকের গুলি হয়ে গর্জন করে ওঠে। এই হল আমাদের স্বাধীনদেশ।

রজনীর পঞ্জরাস্থি জীর্ণ নয়। সে শক্ত শরীরের যুবক। তবু ছোটবাবুর কথায় তার বিস্তৃত বক্ষপটের ভিতরে এক অসহ্য জ্বালাবোধের উদ্রেক হল। বন্দুকের গুলির শব্দ যেন তারই বুকের মধ্যে বেজেছে। যেন তৃষ্ণার্ত হয়ে জল জল চীৎকারে কতদিন সেই-ই আর্তনাদ করে বেড়িয়েছে মাঠে-প্রান্তরে লোকালয়ে। বন্দুকের গুলীর শব্দ তার খুব বেশী শোনা নেই। জমিদার বাড়ীর বন্দুকটা কদাচিৎ গ্রামে হনুমানের উৎপাত হলে কিংবা গড়খাই-এর পাড়ে পাতিহাঁসের জটলা জমলে গর্জন করে থাকে। সে শব্দে চমকে উঠলেও কোন আতঙ্কের কারণ ঘটে নি। তবুও বন্দুকের গুলী কিংবা হত্যা, রক্তপাত, খুন-জখমের প্রতি রজনীর অন্তরে গভীর আতঙ্ক।

নিখিল যে এলাকার কর্মী—বাখুরীর মিটিং আপাতত না-হওয়ার ফলে, তাকে সেখানেই ফিরে যেতে হয়েছে ছোটবাবুর নির্দেশে, কলকাতা অভিযানের সংগঠন-মূলক কাজের দায়িত্ব নিয়ে। রজনী একাই মিটিঙের বদলে এই অভিযানের কথা প্রচার করার কাজে লাগল বাখুরীতে।

ভূষণ সব শুনে নিরাসক্তভাবে বললে—পাঁচজনে যদি যায় ত যাব।

ভূষণের মা বললে—আরে তোরা যদি কলকাতায় যাউ ত মোকেও নিয়ে চল্‌না বাবু একবার। গঙ্গার চানটা করে এসি জীবনের শেষ।

ভূষণের মা একাই নয় এরকম ইচ্ছা আরও অনেক বৃদ্ধার মুখ থেকেই প্রকাশ পেল। কিন্তু কলকাতা অভিযানের প্রস্তাবে রজনী বয়স্কদের কাছ থেকে যেমন সাড়া পাবে প্রত্যাশা করেছিল তেমন পেল না। লোকে বলে—রোজ কামাই করে কোথাকে যাব। আমরা বাবু শহর-ফহরে যাই নি কখনো। এগবারে দেশসুদ্ধ সকলকেই কি আর যেতে হবে নাকি? সব গাঁ থেকে একজন-দুজন করে গেলেই ত কত লোক হয়ে যাবে।

কেউ কেউ ছেলের অসুখ, বৌ-এর পেটের যন্ত্রণা, নিজের শরীর খারাপ, সংসারের ঝামেলার নানাবিধ অজুহাত দেখায়।

সুরেনের কাছে সরাসরি কথাটা পাড়তে না পেরে সে ঝড়ুকে দিয়ে বলিয়েছিল। সুরেন সব শুনে কেবল একটি কথা বলেই চুপ করে গেল।

রজোর কি মাথাটা খারাপ হয়েছে ?

নিখিলের প্রতি রমণীর মনে সামান্য শ্রদ্ধা ও সম্মানের উদ্রেক হয়েছিল বটে, কিন্তু গিরীশবাবুর জমিটার প্রতি তীব্র আকর্ষণের ফলেই সে রজনীর প্রস্তাবে এলাকাড়ি দিল।

পোড়া বাড়ীটা মেরামত করার জন্যে সতীশকে সাহায্য চাইতে হয়েছিল গ্রামের অবস্থাপন্ন ব্যক্তিদের কাছে। গিরীশবাবু পাঁচ টাকা সাহায্য করেছিলেন। সতীশ রজনীর প্রস্তাব শুনে বললে—আমার ত কিছু অমত নেই। তবে গিরীশবাবু কি সব বলতেছিল যেন।

কি বলতেছিল ?

বলতেছিল কি সব। অতশত বুঝি কি আর। তবে ওঁনার মত নেই।

শ্রীপতির মত মেরুদণ্ডহীন চরিত্রের কাছে খাদ্য অভিযানের এই প্রস্তাব নিয়ে দাঁড়ালে সে কী আচরণ করবে রজনীর তা আন্দাজ করার ক্ষমতা আছে। তবু ঝড়ুকে সে বলে রাখে ইশারা-ইঙ্গিতে শ্রীপতির মনোভাবের হদিস নেওয়ার জন্যে।

ছোটবাবুর কাছে অসঙ্কোচে রজনী জানায়—আজ্ঞে মিটিঙের ব্যাপারে যেমন উৎসাহ দেখা গিয়েছিল, এটাতে তেমন নেই।

দখিন পাড়ার লোকেরা কি বলে ?

তাদের এখন কাঁচা-টাকার গরম। ট্যাঁক-খর কথা শোনায়। এ-পাড়ার যেমন একটি মাতব্বর রয়েছেন গিরীশবাবু, উ-পাড়ারও তেমনি হয়েছেন শশী রাউত। ইচ্ছা থাকলেও সব হাত-পা বাঁধা। শশী রাউত সকলকে ভয় দেখিয়ে বেড়াচ্ছে—ওরে কেউ যাস নি, এ্যারেষ্ট করবে।

রজনী এইখানে একটা বিষয় ছোটবাবুর কাছে গোপন করলে। সেটা তার নিজের সম্পর্কে লোকাপবাদ। এক শেয়ালের একবার ফাঁদে পড়ে লেজ কাটা গেছল। সে অন্য শেয়ালদের সদুপদেশ দিয়েছিল তাদের লেজগুলোও কেটে শরীরটাকে নির্ঝঞ্ঝাট করে নিতে। রজনীর কয়েকদিনের জেল-খাটার সংবাদ গ্রামের লোক জেনে গেছে। তার সম্পর্কে নিন্দাবাদটা হল এই যে নিজের মত আর সবাইকেও সে জেলে ঢোকাতে চাইছে।

রজনী আশা করেছিল ছোটবাবু ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামাবেন। কিন্তু সে রকম কোন লক্ষণ অথবা উৎসাহ তাঁর মধ্যে প্রকাশ পেল না। নিখিলবাবুকে গ্রামের লোক রাতারাতি ভালবেসে ফেলেছিল। তাঁকে এখানে রাখলেও

অনেক কাজ হত। ছোটবাবুই সরিয়ে দিলেন। ছোটবাবু নিজে যদি গ্রামের দু-চার জায়গায় ঘুরতেন, মানুষজনের সঙ্গে কথা বলতেন, নানা রকম মিথ্যা প্রচারের প্রভাবে তাদের মনের মধ্যে গড়ে-ওঠা অহেতুক আতঙ্ক ও সন্দেহের ঝোঁকটা কাটিয়ে দিতেন জ্ঞানের কথা দিয়ে, তাহলে নিশ্চয়ই মানুষ এতটা নিস্তেজ হতে পারত না। অথচ খাদ্য অভিযানের এই সঙ্কল্প রজনীর কাছে দিন-রাত্রির ধ্যান হয়ে উঠেছে। মাঝে মাঝে তার চোখের সামনে সহস্র সহস্র মানুষের ছবি অরণ্যের মত আন্দোলিত হয়ে সমুদ্রের মত গর্জন করে ওঠে। রজনী ভাবতে গিয়ে বিষণ্ণ হয় প্রাণধারণের দাবীতে এমন প্রাণময় সমাবেশের মধ্যে তাদের গ্রামের মানুষেরা যোগ দিচ্ছে না কেন?

রজনী দু-একবার মৃদুস্বরে ছোটবাবুকে অনুরোধ জানিয়েছে—আপনি একটু বেরুন না। তাহলে চাকা ঘুরে যাবে। মানুষের মাথায় যে-সব মিথ্যে ভয়-ভাবনা ঢুকিয়ে দিয়েছে, সেটা কেটে গেলেই অনেকে রাজী হবে। আপনি হলে যে-ভাবে বোঝাতে পারবেন, আমি কী তা পারি?

ছোটবাবু জবাবে বলেছেন—হ্যাঁ, একবার গেলে ত হয়, কিন্তু সময় পাচ্ছি কোথায়? এখুনি বেরুতে হবে যে একবার। আজ সোনাপুরের আটচালায় গ্রাম্য বৈঠক আছে।

সোনাপুর আর সোনাপুরের পাশাপাশি গ্রামগুলো ছোটবাবুদের দলের এলাকা। সে-সব জায়গায় অনেক আন্দোলন হয়েছে। সেখানকার মানুষ-গুলো জ্যান্ত, এখানকার মত মরা নয়। তবু সেখানে এত মিটিং-বৈঠকের কি দরকার? রজনী একটা গ্রাম্য প্রবাদ বাক্য দিয়ে ছোটবাবু ও নিখিলের এই কার্যপদ্ধতিকে সমালোচনা করে—এ যেন তেলো মাথায় তেল দেওয়া। নিজের গ্রামের দিকে লক্ষ্য নেই কারো।

ছোটবাবু একদিন রজনীকে একটা পেন্সিলে আঁকা ম্যাপ দেখালেন। ম্যাপে জায়গার নামগুলোর পাশে সময় লেখা। কোন্ জায়গার মিছিল কখন কোথা থেকে যাত্রা শুরু করবে এবং কোনখানে এসে অন্য মিছিলের সঙ্গে মিশে আবার কোনদিকে যাবে ম্যাপটাতে তারই নির্দেশ রয়েছে। রজনী ব্যগ্রভাবে চতুর্দিকে তাকিয়েও ম্যাপের কোনখানে বাখুরীর নাম খুঁজে পেল না। বাখুরী এখনও ছোটবাবুর দলের এলাকা হয়ে যায় নি বলেই কি? ছোটবাবুর সঙ্গে নিজের বেশ একটা দূরত্ব অনুভব করে সেদিনটা ভারী নিঃসঙ্গ ঠেকল রজনীর।

পদ্ম এখন একটা নতুন জেদ ধরেছে। বাপের বাড়ী যাবে। পর পর কদিন

সে নাকি স্বপ্ন দেখেছে তার মাকে। রমণীর সঙ্গে শ্বশুরবাড়ীর বিরোধ। বিয়ের পর আর কোনদিন শ্বশুরবাড়ী যায় নি সে। পদ্ম এতকাল ধরে যাতায়াত করেছে হয় রজনীর সঙ্গে, নয় পাড়ার কোন বিশ্বস্ত ছেলের সঙ্গে কিংবা তার বাপের বাড়ী থেকে পাঠানো লোকের সঙ্গে।

রমণী যতই গোঁয়ার হোক পদ্মর এই বিবেকহীন আব্দারে সে সম্মতি দেয় নি। বীণাপাণি ভারী-মাসের পোয়াতী। তার একার কাঁধে সংসারের সব দায়িত্ব চাপিয়ে এ-সময় পদ্মর চলে যাওয়াটা আদৌ যুক্তিসঙ্গত নয়।

পদ্মর যুক্তিটাও কম ন্যায়সঙ্গত নয়। সে বলে—বড়দির খালাস হতে এখনও দু-তিন মাস বাকী। এই সময় একবার না-গেলে আর কি যাওয়া হবে আমার? মাস-খানেক থেকে চলে আসবো। বড়দির খালাস হবার ঠিক আগে এসে পড়বো। তখন চাষ-বাসও শুরু হয়ে যাবে।

পদ্মর যুক্তি যাই হোক রমণী বা রজনী কেউ তার আবেদনে সাড়া দেয় না। বীণাপাণির ওপর প্রতিশোধ নেওয়ার ঝোঁকে সে যদি আর না ফিরতে চায় ঠিক সময়ে? পদ্মর পক্ষে এমন অবুঝ খামখেয়ালীপনা-করা আদৌ অসম্ভব নয়। শ্বশুরবাড়ীর সংসার এখনও তার কাছে ছেলেবেলার ধুলো-বালির ঘরকন্নার মত। সন্তানবতী না হলে মেয়েরা সংসারী হয় না।

ছোটবাবুর ওখান থেকে বেরিয়ে রজনী কোথায় যাবে ঠিক করতে পারে না। বাড়ীতে গেলে পদ্ম কানের কাছে নাকে কাঁদবে। চারুর বাড়ীতে দীর্ঘকাল যাওয়া হয় নি। কিন্তু চারুও স্ত্রীলোক। নিজের ঘর-সংসারের কেন্দ্রটুকু ছাড়া তাদের জীবনের পরিধি আর কতদূর? রজনী এখন চায় উত্তপ্ত হৃদয়ের মানুষ। যার সঙ্গ তাকে উৎসাহ যোগাবে, কর্মে উদ্দীপ্ত করবে, অন্তরকে লোকাপবাদে ভীত, হতাশায় দুর্বল হতে দেবে না। কিন্তু সারা গ্রামে তেমন একটা মানুষ কই? কুরুক্ষেত্রে শোকে মুহ্যমান রণক্লান্ত অর্জুনকে উজ্জীবিত করেছিলেন যে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর মত একটা মানুষ।

আগে ভূষণের সঙ্গে রজনীর গভীর ভক্তি-শ্রদ্ধা দিয়ে তৈরি একটা নিকট সম্পর্ক ছিল। মনের যে-কোন উত্তেজনায় ও সঙ্কটে সে সবার আগে ভূষণের কাছেই ছুটে যেত। কদিন আগে বাথুরীতে মিটিং করার আলোচনাতেও ভূষণ রক্ত-মাংসের মানুষের মত সমর্থন জানিয়েছে। কিন্তু কলকাতায় খাদ্য অভিযানের প্রস্তাবে সে প্রাণ খুলে সাড়া দিলে না। ভূষণ তার সত্যিকারের মনোভাবটা গোপন করে রজনীকে দ্বিধান্বিত করে তুলেছে।

ভূষণ কি রজনীকে এড়িয়ে যেতে চায় আরও অনেকের মত? হ্যাঁ, অনেকের কাছে সে ইতিমধ্যে বিষাক্ত মুস ফলের মত অস্পৃশ্য হয়ে উঠেছে। মানুষের দুঃখ-বেদনা-বন্ধনের প্রতি সহানুভূতিশীল হতে গেলে মানুষের সঙ্গে সহজ সরল স্বাভাবিক ভালবাসার সম্পর্কের বিলোপ ঘটে নাকি?

রজনী ঠিক করল কিছুটা রাত পর্যন্ত সে ভুতুদের থিয়েটারের রিহার্সাল শুনবে। আজ এই মুহূর্তে রজনী অনুভব করল, ভুতুর প্রাণ আছে। সে গ্রামের আর পাঁচটা ছেলের মত নয়।

গ্রামের প্রাইমারী ইস্কুলের একটা ঘরে ভুতুদের রিহার্সাল হয়। রজনী দেখলে রিহার্সাল চলেছে কিন্তু ভুতু অনুপস্থিত।

শিবু তার কূট ভূমিকাকে যথাযথ করার জন্যে চোখে শয়তানির সূক্ষ্ম দৃষ্টি ফুটিয়ে ঘাড় নীচু করে পিঠে হাত রেখে পায়চারি করতে গিয়ে রজনীকে দেখতে পেয়ে ঘরের ভেতরে বসতে ডাকলে।

কী ব্যাপার?

এই আপনাদের রিহার্সাল শুনতে এলুম। কী বই হচ্ছে আপনাদের?

মোহনলাল।

আপনি তবে কী সেজেছেন?

আমি? আমি মীরজাফর।

ভুতুবাবুকে দেখছি না যে।

কানাই বললে—কে ভুতু? সে এখন আকাশে উড়ছে।

কানাই-এর জবাবে ঘরসুদ্ধ সবাই হেসে উঠল। রজনীও বোকার মত হাসল একটু। ভুতু সম্পর্কে আর কোন কৌতুহল প্রকাশ করল না সে।

শিবু আবার মীরজাফরের ভূমিকায় অবতীর্ণ হল হাসির রেশ থামলে।

ভুতুর আকাশে ওড়ার কথাটা নিছক হাসির ছলে পরিহাস নয়।

রবীন্দ্র-জয়ন্তী নিয়ে মশগুল হয়ে থাকতে থাকতে আজ বিকেলে ভুতুর জীবনে সুদূরের আহ্বান এসে গেল একেবারে অপ্রত্যাশিতভাবে।

ভুতু তার দলবল নিয়ে আড্ডায় মেতেছিল নরেন সাউ-এর চায়ের দোকানে। এমন সময় নৃপেন এল সাইকেলে চেপে। হাতে তার সিনেমা পত্রিকার নতুন সংখ্যা। নৃপেন দোকানে ঢুকেই বললে—এ্যাই ভুতু, একটা ডবল ডিমের মামলেটের অর্ডার দে।

বিশুদ্ধ ইয়ার্কি ভেবে ভুতু নৃপেনকে আমল দেয় নি প্রথমে। নৃপেন ভুতুকে

অনেকক্ষণ নানা কল্পিত হেঁয়ালীর মধ্যে ঘুরপাক খাইয়ে অবশেষে রহস্যের গ্রন্থিমোচন করলে। মাস চারেক আগে ভুতু ঐ সিনেমা পত্রিকাটিতে কয়েকটি প্রশ্ন পাঠিয়েছিল। পত্রিকার বর্তমান সংখ্যায় তার উত্তর দেওয়া হয়েছে। নৃপেন চীৎকার করে পড়ে শোনালে।

বিমান চক্রবর্তী, বাখুরী, হাওড়া। শুক্লারাণীর ঠিকানা, ১৬।এ বালিগঞ্জ প্লেস, কলিকাতা—১৯। না, তিনি বিবাহিতা নন। বয়স জানতে চেয়েছেন। কিন্তু যৌবনের কি বয়স থাকে? আপনি জীবনে কী হতে চান তা স্পষ্ট করে না জানালে আপনাকে সাহায্য করা আমাদের পক্ষে কিছুটা কষ্টকর হবে বৈকি।

শেষ উত্তরটা শুনে ভুতু খানিকটা লজ্জা পেলেও উত্তরের প্রথমাংশে তার হৃৎস্পন্দন শুরু হয়ে গেল।

নৃপেনের জন্যে ডবল ডিমের মামলেটের অর্ডার দিলে সে। অন্যরা চা পেল কেবল।

সন্ধ্যার দিকে ভুতু ঘোষণা করলে আজ সে রিহার্সালে বসবে না।

সন্ধ্যার পর আঙুরদের বাড়ীর দরজায় পা দিয়ে ভুতু বুঝল কী রকম বিহ্বল হয়ে গেছে সে। আঙুরকে যা দেখাবে বলে সে এখানে এল সেই কাগজখানাই নৃপেনের কাছ থেকে চেয়ে নিতে ভুল হয়ে গেছে তার। অবশ্য আঙুরের চেয়ে মাধুরীর কাছাকাছি বসে কিছুক্ষণ কথা বলার অদম্য ইচ্ছাই সে বেশী অনুভব করছিল মনে। মাধুরী ফুল তুলছিল বালিশের ঢাকনির ওপর। ভুতুকে দেখে মুখ তুলে বললে—কি খবর।

ভুতু মাধুরীর খাটের ওপর ধবধবে বিছানায় বসে বললে—এলুম আপনার সঙ্গে ঝগড়া করতে।

ঝগড়া করতে? কেন কি করেছি আমি?

সেদিন কি সব বলেছিলেন। সতীশ কাকার বাড়ীতে আগুন লাগায় চলে গেলাম। বলুন, আজ শুনবো। শুধু শুনবো না, আজ আমি তর্ক করবো আপনার সঙ্গে।

মাধুরী মধুর হেসে তাকাল ভুতুর দিকে। ভুতু মাধুরীর দৃষ্টির নীলাভ বিদ্যুৎ চমকটুকু স্পর্শ করল শরীরে।

হঠাৎ তোমাকে তর্ক করার নেশায় পেল কেন?

আপনি আমাকে ভুল বোঝাবেন আর আমি বোকার মত সেটা মেনে নেব এই চান নাকি?

কি ভুল বোঝালাম তোমাকে ?

সেই যে সেদিন বললেন, জীবনে যে যা চায় তা পায় না।

মাধুরী তার হাসির সঙ্গে এবার একটু ঠাট্টা মেশাল।

পায় বুঝি ? তুমি পেয়েছ নাকি ?

ভুতু বেপরোয়া ভঙ্গীতে উত্তর দিলে—নিশ্চয় পেয়েছি বৈকি। আমরা পুরুষ মানুষ। যা চাই তা এত প্রচণ্ডভাবে চাই যে সেটা পেতেই হয়। আপনাদের মত দোমনা করে চাই নাকি ?

মাধুরী সেলাই থেকে মুখ তুললে না-হেসে। ভুতুর মুখে এমন অভিজ্ঞ বচন শুনবে সে ঠিক আন্দাজ করতে পারে নি। মাধুরী ভাবলে ছেলেটা কোথায় তীব্র আঘাত খেয়ে এখানে এসেছে নিষ্ফল আক্রোশ প্রকাশ করতে। প্রচণ্ড ব্যর্থ হলে ছেলেরা এমনি ভয়ংকর রকমের বাচাল হয়ে থাকে, লঘু প্রয়োজনে গুরু বাক্য ব্যবহার করে। একটু রূঢ় ব্যবহার করেই ওকে থামিয়ে দেওয়া যায় এখুনি। কিন্তু মাধুরী তা পারল না। উল্টে শান্ত নিস্পৃহ গলায় বললে—প্রচণ্ডভাবে চেয়ে কি পেয়েছ বল শুনি।

ভুতু আজ তর্কে মাধুরীর কাছে পরাজিত হতে আসে নি। বরং মাধুরীকে নিজের চরিত্র সম্পর্কে এইটুকু আভাসই সে দিতে এসেছে যে তাকে যা দেখা যায় সে সেইটুকু নয়।

কিছুক্ষণ আগে মাধুরীর চোখের মাধুর্যপূর্ণ দৃষ্টিপাতটুকু শিহরিত করেছিল ভুতুকে। মাধুরীর সুপুষ্ট শরীরটার দিকেও মাঝে মাঝে দৃষ্টিপাত করে ভাল লেগেছে দেখতে। যেমন কখনো কখনো মাঝারী গড়নের মাঝারী রঙের আঙুরের প্রতিও সে তীব্র আকর্ষণ অনুভব করে থাকে। এসব সাময়িক বিলাস কিংবা বিভ্রান্তি ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু ভুতুর ধ্যানের বিষয়, সাধনার ধন এরা নয়। জীবনব্যাপী আরাধনা দিয়ে চাইবার মত কি ঐশ্বর্য আছে এইসব ছা-পোষা মেয়েদের জীবনে ? শুক্লারাণীর মুখখানা ভেসে উঠল ভুতুর চোখে। তার সেই নিখুঁত নিখাদ নিষ্পাপ সৌন্দর্যের পাশে মাধুরী বা আঙুরকে ভাবতে যাওয়া হাস্যকর মনে হল ভুতুর।

ভুতু বললে—আপনি আগে বলুন কি চেয়ে কি পান নি।

মাধুরী বললে—নিতান্ত বলতেই হবে ? ভাসুর পাই নি।

ঠাট্টা করছেন কেন ? সত্যি কথাটাই বলুন।

সত্যিই ত। তোমার মামা বাড়ীর বড় ছেলে। ভাসুর কোথায় পাব বল।

ওসব কথা শুনতে চাইছি নাকি? অন্য কথা বলুন। সেদিন যে-ভাবে কথাটা বললেন, মনে হল জীবনে যেন অন্য একটা বড় কিছু পাওয়ার সাধনা ছিল।

মাধুরী বললে—আমাদের জীবন কী এতই তুচ্ছ যে বড় কিছু পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করতে পারি না?

আচ্ছা, আপনি ভারী আশ্চর্য মেয়ে ত। আমি বলছি সূর্য পূব দিকে ওঠে। আপনি সেটাকে ঘুরিয়ে আমার ওপরই অভিযোগ করছেন সূর্য কি পূব দিকে উঠতে পারে না। বলুন।

সত্যিই শুনবে?

হ্যাঁ।

তাহলে একটা গল্প শোন। শুনতে শুনতে কিন্তু কোন প্রশ্ন করতে পারবে না। তাহলে গল্প আর এগোবে না।

আমাকে ছোট ছেলে পেয়ে বেশ বোকা বানাচ্ছেন? আচ্ছা বলুন।

এক ছিল মেয়ে। মেয়েটির নাম ধর নন্দিতা। বাপের খুব আদুরে মেয়ে। তার বাবা সেকেলে ধরনের মানুষ হলেও নন্দিতার ইচ্ছা-অনিচ্ছায় কোনদিন তিনি বাধা দেন নি। নন্দিতার ইচ্ছে ছিল অনেক দূর পর্যন্ত লেখাপড়া শেখার। অনিচ্ছা ছিল বিয়েতে। কিন্তু হঠাৎ মারা গেল তার বাবা। সমস্ত সংসার চাপল বড় দাদার ঘাড়ে। নন্দিতার ছোট ভাই রোজগার করতো না। দিনরাত রাজনীতি নিয়েই হোহো-টোটো করে দিন কাটাতো। নন্দিতার যিনি বড় দাদা তিনি কিন্তু খুব উদার বা উন্নত প্রকৃতির মানুষ ছিলেন না। মেয়েদের আধুনিক শিক্ষা-দীক্ষাটা বেশী দূর পর্যন্ত বরদাস্ত করতে পারতেন না তিনি। আবার ছোড়দা ছিল ঠিক তার উল্টো। আমাদের দেশের হাজার হাজার মেয়ে রান্নাঘরের হাঁড়ি-খুন্তির আড়ালে, আঁতুড়ঘরের অন্ধকারে প্রাণের যে প্রকাণ্ড রকম অপব্যয় ঘটিয়ে চলেছে, তার ছোড়দা বলতো, এই লোকসান দেশকে একদিন-না-একদিন মেটাতে হবে অনেক কাঠ-খড় জ্বালানো আগুনের যজ্ঞে। তার ছোড়দাই নন্দিতাকে ঘর থেকে মাঝে মাঝে হ্যাঁচকা টান মেরে বাইরে নিয়ে যেত। কিন্তু তাই বলে নন্দিতা তার ছোড়দার জগৎটাকেও ভালবাসতে পারে নি। সেটা তার কাছে বড় কঠোর, কঠিন, অস্বাভাবিক ঠেকত। সেখানে গিয়ে জীবনের কোন সুস্থির পরিণতির সন্ধান পাওয়া যেত না। কিন্তু সেখানে গিয়ে নন্দিতা অন্তরে ভালবেসে ফেলেছিল একজন মানুষকে। ছোড়দাদের দলের লোক হয়েও সে ছিল সব

দিক থেকে আলাদা। সে মানুষটি একজন কবি। ছোড়দাদের দলের আর যারা লিখত তাদেরও কিছু কিছু লেখা চোখে পড়তো নন্দিতার। সেগুলো সব যেন রেডি-মেড জিনিসের মত এক ধাঁচে, এক ছাঁচে গড়া। এত স্বাতন্ত্র্যহীন যে মনে হতো এগুলো মানুষের লেখা নয়, যন্ত্রের বানানো। নন্দিতার ভাল-লাগার মানুষটিও রাজনীতি করতো, মাঠে-ময়দানে ঘুরতো, এ-ছাড়াও সে ছিল ছোড়দাদের দলের কাগজের রিপোর্টার। সেজন্যে শ্রমিক এলাকাতেই তাকে কাটাতে হতো বেশীর ভাগ সময়। কিন্তু তার কবিতার ভাষায় বাইরের সেই আটপৌরে মানুষকে চেনা যেত না। সেখানে অন্য এক অনির্বচনীয় আবেগ ও বেদনার জগৎ। বিশাল পৃথিবীর আকাশ-জল-আলো-অন্ধকার-আনন্দ-ঐশ্বর্যের জগতে সে যেন ভীষণ একা। আসল মানুষটাকে ভালবাসার আগে মেয়েটি ভালবেসে ফেলেছিল তার কবিতাকে। ক্রমে ক্রমে আসল মানুষটির সঙ্গেও পরিচয় নিবিড় হতে চলেছিল। মাঝে মাঝে তার ছোড়দার কাছে সে আসতো, তখন মেয়েটি তাদের কথার টুকরো শুনতো। অল্প-অল্প কথাও বলতো কোন কোনদিন। কিছুদিন এইভাবেই চলছিল। হঠাৎ শহরের একটা বড় রকম আন্দোলনের সময় জখম হল সেই মানুষটি। সেই সময়ে নন্দিতার লুকনো মনটা ধরা পড়ে গেল সকলের কাছে। নন্দিতার বড়-বৌদিই ব্যাপারটাকে তার বড়দার কাছে ফেনিয়ে-ফুলিয়ে তুলে ধরল। জাতে ব্রাহ্মণ নয় জেনেও নন্দিতা কী করে একজন বয়স্ক যুবকের সঙ্গে এভাবে ঘনিষ্ঠতা করতে সাহস পেল, কিছুদিন ধরে সেই অপরাধের সাড়ম্বর বিচার বিশ্লেষণ চলল দিনে-রাতে। ছোড়দা প্রতিবাদ করতে চেয়েছিল। কিন্তু বড়দা সরাসরি তাকে মুখের ওপর জানিয়ে দিলেন যে নন্দিতাকে নিয়ে সংসার থেকে আলাদা হয়ে গিয়ে এসব বংশ বিরোধী কেলেঙ্কারী তারা যত খুশি করতে পারে।

মাধুরী হঠাৎ থেমে গেল। ভুতু উদগ্রীব হয়ে প্রশ্ন করলে—তার পর? শুনতে শুনতে সে এত তন্ময় হয়ে গিছল যে আঙুর কখন ঘরের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে তার খেয়াল হয় নি।

আঙুর বললে—বৌদি, মা ডাকছে নীচে। তুমি লাউ-ছেঁচকি রাঁধবে যে?

সেদিন রাত্রে ভুতুর ভাবনা-চিন্তাগুলো তালগোল পাকিয়ে গেল সব।

বাইশ

কিছুদিন যাবৎ বাথুরীর ওপর দিয়ে নানারকম চাঞ্চল্যকর ঘটনার উত্থান পতন ঘটে চলেছে। গঙ্গা আদকের দোকানে খাঁকী-সন্ন্যাসীর আবির্ভাব ও অন্তর্ধান, তারকেশ্বরগামী গাজন-সন্ন্যাসীদের মৃত্যু, শ্রীপতি ও ভূষণের জমি থেকে উচ্ছেদ, রজনীর জেল-খাটা, দখিন পাড়ার প্রান্তে জেলেদের কাছ থেকে জাল নোট আবিষ্কার, যা নিয়ে গাজনের প্রহসন লেখা হয়েছিল, ছোটবাবুর মিটিং-ডাকা ইত্যাদি পরম্পর ঘটনাগুলি বাথুরীর নিস্রোত জীবনধারায় অনেকখানি আবর্ত তুলেছে বলা যায়। অবশেষে যোগ হয়েছে আরও দুটি ঘটনা। তার একটি হল রজনীর কলকাতা অভিযানের আহ্বান। দ্বিতীয়টি ভুতুর রবীন্দ্র-জয়ন্তীর উদ্যোগ। আজকাল গ্রামের কিছু কিছু লোক ঠাট্টা করে রজনীকে ডাকে—লীডর। তাদের মধ্যে গঙ্গা আদক অন্যতম। যাওয়া-আসার পথে রজনীর সঙ্গে দেখা হলে গঙ্গা আদক তাকে দোকানে ডাকে। ফতুয়ার পকেট থেকে চ্যাপটা টিনের বাক্স বার করে 'দিশী সিগারেট' বলে বিড়ি বাড়িয়ে দেয়। রজনী বিড়িতে একটা-দুটো টান দিতে-না-দিতেই গঙ্গা আদক বলে—দ্যাখ বাবু লীডর, তোমাকে দুটো-চারটে কথা বলি, রাগ কোরো নি।

রজনী বলে—না না, রাগ করব নি বল না।

গঙ্গা আদক নিজেও একটা বিড়ি ধরায়। তার পর চোখ বুজিয়ে যেন কোন কিছু ধ্যান করার ভঙ্গীতে কথা বলে।

দ্যাখ লীডর, বয়সে ছোট হলে কি হবে তোমার কিন্তু পায়ের ধুলো নিতে ইচ্ছে হয় আমার। আমরা তোমার পায়ের নখের যুগ্যি নই, ধূলিকণার যুগ্যি। কথাটা কেন বলনু বল দিকৃনি ? কেন বল ?

গঙ্গা আদক একটু থেমে চোখ খুলে দু-বার কেশে নেয়। কথা বলার সময় আবার চোখ দুটো বুজে যায়।

আমি বাবু মুখ্যু-সুখ্যু মানুষ। বোধ-জ্ঞান কম। তবু যা জানি তাই বলি, তাতে রাগই কর আর গোসাই কর। কথাটা কেন বলনু জান ? তোমাকে দেখলে বাবু আমার ভগমান শ্রীকৃষ্টোর কথা মনে পড়ে যায়। তার লীলাটা ভেবে দেখ একবার। বৃন্দাবনে শ্রীরাধাকে বাঁশীর আকুল সুরে কুলছাড়া করছেন, গোপিনীদের বস্ত্রহরণ করছেন, অভিমানিনী রাই-এর পায়ে ধরে মান

ভাঙাচ্ছেন। আবার সেই তিনিই দেখ কুরুক্ষেত্রে পাণ্ডবদের সহায় হয়ে অর্জুনের রথের সারথি হয়েছেন, দ্রৌপদীকে বস্ত্রহরণের লজ্জা থেকে মুক্তি দিচ্ছেন, সুদর্শন-চক্রে সূর্যকে আড়াল করে জয়দ্রথ বধের কৌশল যুগিয়ে দিচ্ছেন অর্জুনকে। দ্যাখ দিকি লীলাময়ের কেমন লীলা। তা তোমারও বাবু অনেকটা হয়েছে সেই রকম। চাক্কুর সঙ্গে বৃন্দাবন-লীলাটা শেষ হয়েছে, এখন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে নেমেছ। যাই বল, তোমার মধ্যে অবতারের অংশ আছে। তবে ইটাও জেনো লীডর, মৃত্যুটা তোমার হবে ঐ শ্রীকৃষ্ণের মতই অপঘাত মৃত্যু।

রজনী হেসে বলে—তা পাঁচজনের উপকার করতে গিয়ে যদি অপঘাতে মরি ত মরব।

গঙ্গা আদক বলে—তা ভাল। এমনি ত রোগে-নাড়ায় ভুগে মরতে হবে। সেই যে মাইকেলী ছন্দে আছে না 'জন্মিলে মরিতে হবে অমর কে কোথা কবে' সেই রকম আর কি। তা পরের উপকার করতে গিয়ে মরাটা ভাল, ক্ষুদিরামের মত মরা আর কি!

তার বিড়িটা নিভে গিছল। নিভন্ত বিড়িটাকে কানে গুঁজে রেখে মগ্ন তপস্বীর মত আবার সে চোখ বুজিয়ে মন্ত্রপাঠের মত কথা বলতে থাকে।

দ্যাখ লীডর, তোমার বয়সটা ত এখনো পাকালো হয় নি। খানিকটা ছেলেমানুষ আছ। রক্তটা গরম এখন। আর বিয়ে-থা কর নি। সংসারের কুসুরকম মায়া-বন্ধন নেই। তাই এখন পরকালের কথা ছেড়ে ইহকালের কথা, নিজের কথা ছেড়ে পরের কথা ভাবতে খুব ভাল লাগতেছে। কিন্তু যখন বয়সটা বাড়বে, রক্তে তেজ-মন্দা আসবে, সংসারের মায়া-বন্ধনে মোটা মোটা গিরো পড়বে, তখন দেখবে নিজের কথা ভাবতে বসে চোখে আর জল রাখবার, বুকে আর অনুতাপ রাখবার জায়গা নেই।

আসলে কি জান লীডর, ভগমান লোকটার বিচারটা হল অন্যরকম। তুমি পরের জন্যে করেছ কি নিজের জন্যে করেছ সেদিকে তিনি নজর দিবেন নি। তিনি দেখবেন তুমি যা করেছ তা ন্যায়পথে করেছ, না চুরি-চামারী রাহাজানি করে কাউকে ফাঁকি দিয়ে ঠকিয়ে, দশজনের চোখে জল ফেলিয়ে অন্যায় পথে করেছ সেইটে।

দস্যু রত্নাকরের গল্পটা তো জানা আছে। দস্যুগিরি ছেড়ে তিনি যখন ভগমানের ভক্ত হতে চাইলেন, মুখে আর রাম নাম উচ্চারণ হয় না। কেন হয় না? না

পাপের ফলে? রত্নাকর নারদকে জিজ্ঞেস করলেন—আমার পাপ কিসের? নারদ বললেন—তুমি অসংখ্য প্রাণীহত্যা করেছ, অসংখ্য মানুষকে সর্বস্বান্ত করেছ, তাদের রক্তপাত আর অশ্রুপাতে তোমার জীবন পাপে কানায় কানায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। রত্নাকর বললেন—কেন আমি ত নিজের জন্যে পাপ করি নি। করেছি আমার পরিবারবর্গকে প্রতিপালনের জন্যে। নারদ বললেন—তাদের জিজ্ঞেস করে দেখো, তারা তোমার পাপের ভাগ নেবে কিনা। রত্নাকর তাঁর বাপ ভাই মা বোন সকলের কাছে জানতে চাইলেন, তার পাপের অংশ কেউ নেবে কিনা? তারা কেউ নিতে চায় না। বাপ বল্লে—তুমি ছেলে, তোমার উচিত বৃদ্ধ বাপ-মাকে প্রিতিপালন করা। তুমি কিভাবে অন্নবস্ত্রের সংস্থান করেছ সে কথা আমরা কেন জানতে যাব? তোমার পাপের দায় তোমার একারই। মস্ত বড় জ্ঞানের কথা ইটা। তাই না বাবাজী?

গঙ্গা আদক এসব কথা নানা দিনে রজনীর কাছে প্রকাশ করেছে। অন্য কেউ তাকে ভগবানের নামে এই সব উপদেশাত্মক বাক্য শোনাবার চেষ্টা করলে রজনী যতটা উত্তেজিত হতো, গঙ্গা আদকের বেলায় তা হয় না। তার কারণ গঙ্গা আদকের ভগবান এক অন্যরকমের বস্তু। সে গিরীশবাবুর হরিবাসরে গিয়ে উর্ধ্ববাহু হয়ে কীর্তন গায় না, গলায় তুলসীর মালা পরে না, কপালে বুকে চন্দনের তিলক আঁকে না। গাঁজার কলকে দেখিয়ে সে বলে—ঐ হল আমার শালগ্রাম। সে দিনরাত নেশায় মৌজ হয়ে থাকে আর দোকান চালায়। তার স্ত্রী-পুত্র কেউ নেই। পুষ্যি বলতে গোটা দুই ছাগল।

গঙ্গা আদকের আধ্যাত্মিক কথোপকথন সাময়িকভাবে রজনীকে বিভ্রান্ত করে বটে কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী হয় না। রজনীর অন্তর ঈশ্বরকে পাওয়ার চেয়ে অভিযানের জন্যে দু-চার জন লোক সংগ্রহ করতে পারলেই বর্তমানে বেশী পরিতৃপ্ত হয়। নইলে নিখিলবাবু ও ছোটবাবুর কাছে প্রমাণ করা যাবে না দেশের মানুষের দুঃখ-দুর্দশার প্রতি তার অন্তরের সমবেদনা সহানুভূতি কতখানি তীব্র। অভিযানের আর মাত্র দুদিন বাকী। এ পর্যন্ত রজনী যাদের কাছ থেকে অভিযানে যাত্রী হওয়ার আশ্বাস পেয়েছে তাদের মোট সংখ্যা হল ছয়।

ঝড়ু, ভূষণ, শ্রীপতি, দখিন পাড়ার দুজন পান-চাষী ও রজনী নিজে। ভূষণ ও শ্রীপতি যেতে রাজী হয়েছে ছোটবাবুর চেষ্টায় যদি জমিটা উদ্ধার হয় এই ভেবে। ঝড়ু চলেছে নিছক উত্তেজনার বশে। বিনা পয়সায় কলকাতাটা দেখে আসা যাবে, মন্দ লাভ কি সেটা। দখিন পাড়ার পান-চাষী দুজন ঐ দিন

সকালে স্টেশনের বাজারে পানের মোট বিক্রি করতে যাবে। তারা যে রজনীর সঙ্গে মিছিল করে যাবে না সেটা আগেই জানিয়ে দিয়েছে। তাদের মনোগত ইচ্ছেটা এই রকম যে যদি অনেক লোকজন জোটে একটা তেমন-তেমন কাণ্ড কিছু হয় তাহলে ট্রেনে চেপে একবার না হয় ঘুরেই আসবে কলকাতা শহর থেকে। অবস্থাটা সে রকম জমকালো কিছু না হলে ফাঁক কেটে পালিয়ে দুপুরের শোতে সিনেমা দেখে বাড়ী ফিরবে।

অভিযানের পক্ষে যে-রকম সাড়া পাওয়া যাবে রজনী প্রত্যাশা করেছিল তার প্রায় কিছুই হল না। এ ব্যাপারে তার সবচেয়ে রাগ হল ছোটবাবুর ওপর। এবং ছোটবাবুর ওপর অভিমান বশতই সে অভিযানের শেষের দিনগুলোয় ঐ নিয়ে আর লোকজনের সঙ্গে আলোচনা করছিল না।

অভিযানের আগের দিনে আরও দুটো অপ্রত্যাশিত ঘটনার আলোড়ন উঠল বাথুরীতে।

সকালে ঘুম থেকে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে রজনীর কানে এল ভূতু বাড়ী থেকে নিরুদ্দেশ হয়েছে। কথাটা রজনীর খুব অবিশ্বাস্য ঠেকল প্রথম দিকে। ভূতুর প্রতি তার মনোভাবের মধ্যে খানিকটা ভালবাসা ও সম্মান মেশানো ছিল। তাই ভূতুর নিরুদ্দেশ হওয়ার সংবাদটা যত দ্রুতগতিতে চতুর্দিকে রাষ্ট্র হওয়া সম্ভব হল, রজনীর মনে ভূতুর প্রতি সম্মানের নেশাটা কাটতে সময় লাগল তার চেয়ে বেশি। ভূতুকে আর দশটা সন্তাদরের ছেলের মত ভাবতে কষ্ট হল রজনীর।

এর চেয়ে আরও বড় আঘাত এল সেইদিনই দুপুরের দিকে।

ভূষণ গোপনে গোপনে অন্য লোকের মারফত গিরীশবাবুর সঙ্গে কথা চালিয়ে জমিটা আবার আদায় করেছে। রমণীর সঙ্গে কথাবার্তা প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল। একটু আটকে ছিল বাবুদি নিয়ে। গিরীশবাবুর ঐ পাঁচ বিঘের বন্দ-টায় ফসল ভাল ফলে বলেই বাবুদি-র দাবীটাও পরিমাণে বেশি। রমণী গিরীশবাবুর চাহিদা থেকে আধ মণ কমাতে চেয়েছিল। ভূষণ গোপনে দেড় মণ বাবুদি-তেই রাজী হয়ে বেদখলি জমিটাকে হস্তগত করেছে।

ভূষণ কি বর্ণচোরা? স্বার্থসিদ্ধির প্রয়োজনে এতদিন সে মুখের ওপর একটা মুখোশ এঁটেছিল? হ্যাঁ, ছোটবাবুর দৃষ্টি আছে বটে, মানুষের অন্তর পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ করার মত দৃষ্টি। তিনি ভূষণ প্রসঙ্গে একদিন বলেছিলেন—নিজের ভাল-মন্দের প্রয়োজনে ঝোঁকের বশে অনেকেই ত অনেক কিছু করে। কিন্তু নিজের ভাল-মন্দের সঙ্গে আর দশজন মানুষের ভাল-মন্দটাও ভাবা দরকার।

ভূষণকে রজনী অত্যন্ত আপনার লোক হিসেবে গ্রহণ করেছিল বলেই ভূষণের এই স্বার্থপরতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ইচ্ছাটা তার গলা পর্যন্ত উঠে এল। ভূষণ জমি ফিরে পেল এর জন্যে বিন্দুমাত্র আনন্দ পেল না রজনী। তার কাছে আজ ভূষণের চরিত্রের যে হীনতার স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয়েছে, সেটাই তাকে বিক্ষুব্ধ ও বিদ্ধ করল সর্বক্ষণ। তার মনে পড়ল কারখানা এলাকায় গিয়ে মানুষের মধ্যে অভাবকে মেনেও অপমানকে না-মানার কী দুরন্ত ঐক্যবদ্ধতা সে নিজের চোখে প্রত্যক্ষ করেছে। আর এখানে ঠিক তার উল্টো। প্রবলের কাছে দুর্বলের সর্তহীন নতি স্বীকার।

রমণী এই নিয়ে ভীষণ রকম চীৎকার হৈচৈ বাধিয়ে তুললে। সে লোকের কাছে গর্জন করে ঘোষণা করলে যে ভূষণের ঘরে আগুন লাগিয়ে এই শয়তানির শোধ তুলবে সে।

রমণীর চরিত্রে নির্বুদ্ধিতা ও শক্তিমদমত্ততা এই দুই বস্তুর প্রাবল্য সম্পর্কে যাদের সম্যক অভিজ্ঞতা আছে তারা রমণীকে মাথা ঠাণ্ডা করার পরামর্শ দিতে এগিয়ে এল। সত্যিকারের দোষটা কার রমণীকে সেটা ভাবতে বললে তারা। জমিটা ভূষণই বহুকাল ধরে চাষ করছিল। তার জমি সেইই আবার হাতে পেয়েছে আধমণ বাবুদি বেশি দিয়ে। এতে ভূষণের দোষটা কোথায়? দোষটা বরং যদি কেউ করে থাকে ত সেটা গিরীশবাবুই। সেই যখন ভূষণকেই জমিটা দেবার মনস্থ আছে আধমণ বাবুদি বেশী দিলে, তাহলে রমণীকে মাঝখান থেকে জমির লোভ দেখিয়ে নাচানো কেন?

যুক্তি-তর্ক যাই বলুক, রমণী গিরীশবাবুর দোষটা কিছুতেই বুঝতে পারে না। সে তো গিরীশবাবুর পায়ে গড়িয়ে জমিটা ভিক্ষে করতে যায় নি। গিরীশবাবু নিজের থেকেই তাকে জমিটা দিতে চাইলেন। দেবার আগ্রহ না থাকলে তিনি কেনই বা এমন করবেন?

রমণীর উত্তেজনা ও আস্ফালনের মাত্রাধিক্য দেখে রজনী সুরেনকে বলে—মেজদাকে একটু বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ঠাণ্ডা কর দেখি।

সুরেন সমস্ত ঘটনাটা আগেই শুনেছিল। রজনীর মুখ থেকে আরেকবার শোনে। রজনী ভূষণের ওপর দোষারোপ করলে সুরেন অবাক হয়ে প্রশ্ন করে—কেন, ভূষণের কি দোষ শুনি?

দোষ নয়? ছোটবাবু তাকে আশ্বাস দিলেন আইনের জোরে জমিটা ফিরিয়ে দেবেন। ছোটবাবুর কথার মর্যাদা না-রেখে সে ঘাড় নীচু করে আধমণ বাবুদি

বেশী করে দিয়ে গোপনে গোপনে জমিটা হাত করলে? এটা দোষের নয়।

সুরেনের কপালে অনেকগুলো কুঞ্চিত রেখা ফুটে ওঠে। সে যেন রজনীর কথার অর্থ কিছুই উপলব্ধি করে উঠতে পারে নি।

এটাতে আবার দোষ কী আছে রে। তার জমি, সে যদি আধমণ বাবুদি বেশী দিয়ে জমি নিতে চায় নিক না। তাতে তোর আমার কি পাড়ার লোকের মাথা ঘামাবার কি আছে?

রজনী সুরেনের প্রশ্নে সঙ্কটে পড়ে। সুরেনের মত একটা সাদাসিধে সেকেলে মনের মানুষের কাছে আধুনিক কালের আইন-কানুন, নিয়ম-নীতিকে স্পষ্ট ব্যাখ্যা করে বোঝানো ভারী দুঃসাধ্য ব্যাপার। মনের উত্তেজনায় ছটফট করলেও সুরেনের কাছে বেশ শান্তভাবেই এবং অনেক ভেবে-চিন্তে উপমা-দৃষ্টান্তের সাহায্যে সে নিজের বক্তব্যটা ব্যক্ত করে।

নিজের বৌ বলে লোকে কি বৌ-এর ওপর যেমন খুশি নির্যাতন করতে পারে? পারে না। সমাজের আইনে বাধে। সমাজ তার শাসন করে। নিজের শরীর আর নিজের কাপড় বলে কেউ কাপড়টা না-পরে মাথায় পাগড়ী বেঁধে পথে বেরোয় কি? বেরোলে লোকে হয় বলবে উন্মাদ, নয় তাকে ঠেঙিয়ে কাপড় পরাবে। এখানে খাটছে দুটো আইন। সমাজের আইন আর রুচির আইন। তেমনি নিজের জমি বলে আমি বছর বছর খুশি মত চাষী পাল্টাব, এটা সরকারী আইনে গ্রাহ্য করবে কি? করবে না। ঠিক তেমনি আমার জমিটাই আমি চিরকাল চাষ করার অধিকার পাব বলে বেশী করে জমির মালিককে ঘুষ দেবো এটাও একটা আইনে বাধে। সে আইনটা মনুষ্যত্বের। সেখানে শাসন করে বিবেক। এমনটা হলে শেষ পর্যন্ত হবে কি? মালিকরা চাইবে কেবলই উচ্ছেদ করতে আর চাষীরা মাথা নীচু করে কেবল ঘুষ বাড়াবে। মালিকরা যে-পায়ে ঠেলবে সেই পায়ের ধুলো চাটাটাই তাদের নেশা হয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু একা একা এমনি অপমান লাঞ্ছনার পথে না গিয়ে সকলে এক হয়ে আইন যা বলে তার চেয়ে বেশি দিতে যদি নারাজ হয় তাহলেই কি এর সম্মানযোগ্য সমাধান হয় না? ছোটবাবু সেই উপায়টাই বুঝিয়ে ছিলেন।

রজনী একটু থেমে সুরেনের মুখের দিকে তাকিয়ে লক্ষ্য করে তার কথাগুলোকে বুঝতে পেরে সুরেনের মুখাবয়বে কোন পরিবর্তন ঘটেছে কিনা। রজনী সুরেনকে নিজের যুক্তির স্বপক্ষে আনার জন্যে গলার স্বরটাকে গাঢ় ও করুণ করে বলে—

তুমি ভেবে দেখ দেখি, এবার শ্রীপতিকা'র অবস্থাটা কি হবে। সে কি আর আইনের দিকে এগোতে চাইবে একা একা? এমনিতেই তো মামলা-মোকদ্দমার নাম শুনলে তার জ্বর আসে।

সুরেন সমস্ত কথা নির্বিকারভাবে শুনে কিছুক্ষণ গুম্ হয়ে থাকে। বোঝা যায় তার মনের মধ্যে দুটো বিরুদ্ধ চিন্তার সংঘাত চলেছে। কিছুক্ষণ পরে সুরেন যখন কথা বললে মনে হল যেন ভূষণের হয়েই সে রজনীর কাছে বিনীতভাবে কৈফিয়ত দিচ্ছে।

লোকটারই বা দোষ কি রজো? অতগুলো পেট চালাতে হয় ত ঐ একটা মানুষকে। এখন বৈশেখ মাস। আর মাস খানেক বাদে আকাশ নামবে। চাষ-বাস শুরু হবে। এমন অবস্থায় কবে ছোটবাবু আইনের লড়াই করে তার জমির সুরাহা করে দেবেন সে সেই ভরসায় চুপচাপ বসে থাকবে। চাষ-বাস না করতে পেলে পেট চালাবে কিসে। কেউ কি কাউকে একবেলা এক সন্ধ্যের খোরাক দিয়ে সাহায্য করবে?

রজনী বুঝলে সুরেনের শেষ খোঁচাটা ছোটবাবুকে লক্ষ্য করে। সে সুরেনের কথার জবাব দিলে না। কেবল সুরেনকে অনুরোধ করলে রমণী:কে মাথা ঠাণ্ডা করানোর জন্যে। সুরেনও রজনীকে অনুরোধ করলে যাতে রজনী এই নিয়ে ভূষণ কি আর কারও সাথে বাক্-বিতণ্ডা না করে। কেন না রজনী যেদিক থেকে ভূষণের দোষ ভাবছে সবাই ত আর সে-ভাবে ভাববে না। লোকে রটাবে, নিজেরা জমিটা চাষ করতে পায় নি বলেই এখন গাত্রজ্বালার বশে ভূষণকে দোষী সাব্যস্ত করছে। রজনী আর রমণী ত আলাদা সংসারের লোক নয়। ঘটনাটার যে এমন বিকৃত একটা দিক থাকতে পারে সুরেনের বলার আগে সেটা খেয়াল হয় নি রজনীর।

এদিকে পদ্ম আরেক কাণ্ড শুরু করেছে বাড়ীতে। রমণীর হম্বি-তম্বি দেখে তার মনে হয়েছে সে বুঝি একটা রক্তারক্তি কাণ্ড বাধিয়ে বসবেই। কিছুদিন যাবৎ বাপের বাড়ী যাওয়ার জন্যে সে গোঁ ধরে বসেছিল। এখন সেই গোঁ-টাই প্রবল রূপ নিয়েছে কান্নার সঙ্গে।

রজনী সন্ধ্যের সময় বাড়ীতে ঢুকে পদ্মর একঘেয়ে বাপের বাড়ী যাওয়ার বায়নাক্কায় বিরক্ত হয়ে মুড়ি খাওয়া শেষ করেই বাড়ীর বাইরে বেরিয়ে পড়ে। কোন খানেই যেন শান্তি নেই। মানুষ ন্যায় কাকে বলে জানে না। সত্যকে সন্ধান করার কোন চেষ্টা নেই। এঁদো পুকুরের পোকার মত একপাল মানুষ যেন

পরস্পর পরস্পরের পিছনে কেবল কলহ-বিদ্বেষের, স্বার্থ ও সর্বনাশের প্রবৃত্তি নিয়ে তাড়া করে চলেছে।

রজনী নিজেকে প্রশ্ন করল—ছোটবাবু ও নিখিলবাবুদের ত্যাগ তপস্যা কি এই সব মানুষদের দিয়ে সফলকাম হবে কোনদিন ?

রজনী যে কোথাও গিয়ে একটু নিশ্চিন্তে বসবে তার জায়গা খুঁজে পেল না। ভুতু পালিয়ে যাওয়ার পর নিশ্চয়ই থিয়েটারের রিহার্সাল বন্ধ হয়ে গেছে। রজনী ভাবলে চারুর ওখানে যাবে। অনেকদিন যাওয়া হয় নি তার ওখানে। তাকে বলা হয়ে ওঠে নি যে তার পোষা ময়নাকে সেইই খাঁচা থেকে উড়িয়ে দিয়েছে একদিন নেশার ঘোরে। কতদিন সে তার বাড়ীর কাছাকাছি পথ দিয়েই দখিন পাড়ায় যাতায়াত করেছে। কিন্তু মিটিং বা অভিযানের ব্যাপারটা এমনভাবে তার ঘাড়ে চেপে বসেছিল যে চারুর সঙ্গে সময় কাটানো তখন তার কাছে সময়ের অপব্যয় বলেই মনে হতো।

রজনী চারুর বাড়ীর দিকে পা বাড়াচ্ছিল। এমন সময় পিছন থেকে একজন অপরিচিত লোক ডাকল তাকে। রজনী থমকে দাঁড়াল।

আচ্ছা, গিরীশ চক্রবর্তীর বাড়ীটা কোনদিকে বলতে পারেন ?

গিরীশ চক্রবর্তীর বাড়ী ? কোথা থেকে আসছেন আপনি ?

আমি আসছি ঠাকুরপুকুর থেকে।

ঠাকুরপুকুর স্টেশনের গায়ের গ্রাম। ঠাকুরপুকুরের নাম করলেই আগে লোকের মনে পড়ে শশধর সাঁতরার কথা। অগাধ বড়লোক। স্টেশনের সিনেমায় শেয়ার আছে। দোকানপাট আছে বড় বড়। জমি-জমা বিস্তর। লোকে বলে যুদ্ধের আগে লোকটার টিকি-বন্ধক দেবার মত অবস্থা ছিল। যুদ্ধের সময় নাকি রেলের ওয়াগন ভেঙে মাল চুরি আর সেই মালের চোরাকারবার করে রাতারাতি আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়ে উঠেছে। আবার কেউ কেউ বলে সেই সঙ্গে ব্যবসা আছে জাল নোটেরও। তবে লোকটার সুনামও আছে প্রচুর। অনাথ-আতুরের ছেলেকে লেখাপড়ার বই কিনে দেয়, কন্যাদায়গ্রস্তের সংকটে সাহায্য করে, জন-কল্যাণমূলক কাজে উৎসাহ যোগায়।

রজনী ঠাকুরপুকুরের নাম শুনে ভাবলে লোকটি বুঝি শশধরবাবুর কাছ থেকেই আসছে। কেন না শশধরবাবুর সঙ্গে গিরীশবাবুর বন্ধুত্ব বহুদিনের।

রজনী লোকটিকে জিজ্ঞেস করলে—আপনি বুঝি শশধরবাবুর কাছ থেকে আসছেন ?

লোকটি রজনীর দিকে তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে কিছুক্ষণ পরে কথার জবাব দিলে—হ্যাঁ।

আমার সঙ্গে আসুন, দেখিয়ে দিচ্ছি।

রজনী গিরীশবাবুর বাড়ীর সামনে পর্যন্ত গেল না। পুকুর পাড়ে দাঁড়িয়ে বাড়ীটা দেখিয়ে দিলে।

ঐ যে লম্বা দেবদারু গাছটা দেখছেন, ওর সামনের গেটটা দিয়ে ঢুকে যাবেন। সামনে চাতাল উঠোন। ঢুকলেই ডান দিকে সদরের ঘর।

রজনীর সেদিন আর চারুর কাছে যাওয়া হল না। যখন বাধা পড়ল, তখন থাক। তার চেয়ে ঝড়ুর কাছে গিয়ে কালকের বেরোবার সময়টা ঠিক করে আসা যাক। চলতে চলতে রজনী ট্যাঁক থেকে একটা বিড়ি বার করে ধরালে।

ঠাকুরপুকুরের অপরিচিত লোকটি ততক্ষণে গিরীশবাবুর সদরে পৌঁছে গেছে। হরিবাসরের লোকজনও আসতে শুরু করেছে একে-দুয়ে। গিরীশবাবু একটা ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে গড়গড়া টানছিলেন। অপরিচিত লোকটি গিরীশ-বাবুর পায়ের তলায় করজোড়ে প্রণাম ঠুকে বললে—নমস্কার বাবু, এই আপনার কাছে এলুম।

গিরীশবাবু গড়গড়ার নল বাড়িয়ে তাকে বসবার জায়গাটা দেখিয়ে দিয়ে বললেন—বোস।

লোকটি সিমেণ্টের মেঝেয় বিছনো 'সপের' ওপর বসল। গিরীশবাবু গড়গড়া টানতে লাগলেন। আজকের আসরে অন্য দিনের মত চাঞ্চল্য ছিল না। ভুতুর নিরুদ্দেশ হওয়ার ব্যাপারটা গিরীশবাবুর মনে কি ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে, সেটা সম্যক উপলব্ধি করতে না পারার জন্যেই আসরের লোকজন খুব বেশী কথাবার্তা বলতে সাহস করছিল না। এবং নিজেদের আড়ষ্টতা কাটিয়ে ওঠার জন্যে মাঝে মাঝেই তারা ইচ্ছাকৃত জোরে কাশির শব্দ তুলছিল। লোকটি ভাবলে গড়গড়া টানা শেষ না-করে বাবু হয়তো তার সঙ্গে কথা বলবেন না। নইলে 'বোস' কথাটা এমন জোর দিয়ে উচ্চারণ করবেন কেন? কিন্তু মিনিটের পর মিনিট পার হবার পরও যখন গিরীশবাবুর গড়গড়া-টানা থামল না লোকটি প্রথমে কয়েকবার শুকনো গলা-খাঁকারি দিলে। তাতেও কোন কাজ হল না দেখে শেষে বললে—আজ্ঞে বাবু, আপনার খবর ছিল একটু।

খবর কথাটা শুনে গিরীশবাবু নল মুখে দিয়েই পাশ ফিরে তাকালেন। অপরি-চিত লোকটির মুখের ওপর ঘুরতে ঘুরতে তার চোখ দুটি প্রশ্নের ভঙ্গীতে

বিস্ফারিত হয়ে উঠল। লোকটি বললে—আজ্ঞে বাবু আমি ঠাকুরপুকুর থেকে আসছি।

এঁ্যা, ঠাকুরপুকুর থেকে? শশধর পাঠিয়েছে নাকি? কিছু খবর আছে?

আজ্ঞে হ্যাঁ, একটু মকরশালে আসতে হবে।

গিরীশবাবু ইজিচেয়ার থেকে উঠতে উঠতে ভাবলেন নিজের ভুলটা। ঠাকুরপুকুরের অপরিচিত লোকটির কালো রঙ, রোগা গড়ন, মুখে কাঁচা-পাকা দাড়ি ইত্যাদি মিলিয়ে সমস্ত আকৃতির সঙ্গে বাখুরীর পাশের গাঁয়ের একজন চাষীর ভীষণ সাদৃশ্য। সেই চাষীটি দিন দুই আগে তাঁর কাছে মাতৃশ্রাদ্ধের জন্যে কিছু সাহায্য চাইতে এসেছিল।

গিরীশবাবু সদরের বাইরে বেরিয়ে এলেন অপরিচিত লোকটির সঙ্গে। লোকটি তার ফতুয়ার পকেটের মধ্যে সাবধানে মুড়ে রাখা একটা চিরকুট বার করে গিরীশ বাবুর হাতে দিলে। গিরীশবাবু চিরকুটটা পড়লেন। পড়তে পড়তেই তাঁর মুখাবয়বে দ্রুত পরিবর্তন ঘটে গেল। একটা প্রকাণ্ড পাথর যেন ঠেলা দিয়ে উঠল বুকে। নিজের খাড়াই শক্ত সমর্থ শরীরটাকে নিজেরই বড় দুর্বল অনুভূত হল। কিন্তু এসব লক্ষণ অন্যদের চোখে ধরা পড়ল না।

তিনি অন্দরমহলের ভেতরে গিয়ে বললেন—একজন লোক এসেছে বাইরে থেকে, রাত্রে খাবে।

শোভা দেবী অর্থাৎ ভুতুর মা জিজ্ঞেস করলেন—কে এসেছে গা? ভুতুর খবর এনেছে কিছু?

না, না।

এই না না উত্তরটি কিন্তু গিরীশবাবুর মুখে স্বাভাবিকভাবে উচ্চারিত হল না। তার মধ্যে ফুটে উঠল খানিকটা কৃত্রিমতার ছাপ। মায়ের প্রাণে মুহূর্তে সজাগ উঠল মনের নিভৃত আশংকাগুলো। একটু পরেই দেখা গেল রান্নাঘরে বসে শোভা দেবী কাঁদছেন। মেয়েরা এসে তাঁকে ধমকের সঙ্গে সান্ত্বনা দিলে—তুমি কি পাগল হয়েছ নাকি? তেমন কিছু হলে বাবাই কি চুপ করে থাকতেন?

শোভা দেবী সেটুকু বোঝেন। তাঁদের অনেক মেয়ে। ছেলে বলতে ঐ একটিই। ভুতু শেষ বয়সের ছেলে বলেই তার প্রতি গিরীশবাবুর স্নেহ-ভালবাসা একটু বেশী পরিমাণে দুর্বল।

গিরীশবাবু তাঁর সংকীর্তনের লোকজনকে বললেন—তোমরা নাম শুরু করে দাও। আমি আসছি এখুনি।

একজন ভক্ত গিরীশবাবুকে একা বাইরে বেরোতে দেখে বললে—বাবু, একটা 'হারকিন' নিয়ে সঙ্গে যাবো ?

না, আলোর দরকার নেই।

অন্ধকারেই দ্রুত পায়ে তিনি হেঁটে চললেন জমিদার বাড়ীর দিকে। প্রকাণ্ড বাড়ীটার ফাঁকা নিশ্চুপ দিউড়ীর হাঁ-মুখ দরজার মধ্যে ঢুকে অনেকখানি সোজা গিয়ে, ডাইনে বেঁকে, সিঁড়ি দিয়ে একটা চাতালে উঠে, বিভিন্ন শরীকের সীমানা পার হয়ে অন্ধকারে বার বার হোঁচট খেতে খেতে একটা বন্ধ ঘরের দরজায় টোকা দিলেন। এই ঘরটি জমিদার বংশের সান শরীকের। সান শরীকের অংশীদারদের অন্যেরা সবাই মারা গিয়ে এখন মাত্র একজনে ঠেকেছে, নলিনীবাবু। নলিনীবাবুর সঙ্গে থাকেন তাঁর ছোট ভায়ের বিধবা বৌ। এই নলিনীবাবুকে নিয়েই এ-বছর গাজনের সময় গ্রামবাসীরা প্রহসন রচনা করেছিল।

একটু বাদেই দরজাটা খুলে গেল। নলিনীবাবু বেরিয়ে এসে গিরীশবাবুকে দেখে অবাক হয়ে বললেন—গিরীশকাকা, আপনি এ-সময়ে ?

হ্যাঁ, দরকার পড়ল। একটু বাইরে এসো দেখি।

নলিনীবাবু তখুনিই আন্দাজ করলেন একটা সাংঘাতিক কিছু ঘটেছে।

কি হয়েছে বলুন।

ভুতুকে থানায় আটকে রেখেছে।

থানায় ? সে কি ? থানায় আটকাল কেন ?

পাঁচটা জাল নোট ধরা পড়েছে ওর কাছ থেকে। কি করে যে নোটগুলো ওর হাতে গেল, আমি ত বুঝতে পারছি না। সে ত কারো ঘুর্ণাক্ষরেও জানবার কথা নয়।

কে খবর দিলে ?

শশধর লোক পাঠিয়েছে। ব্যাপারটা নাকি খুব জানাজানি হয়ে গেছে ঐ অঞ্চলে। তাই শশধর নিজে জামিনের চেষ্টা করছে। কি করা যায় এখন বল ?

ঠিক আছে। আপনি ভাববেন না। আমি সব ব্যবস্থা ঠিক করে দিচ্ছি। ওখানকার এম-এল-এ আমার হাতের লোক।

টাকা লাগবে নাকি কিছু ?

তা ত লাগবেই। পুলিস-দারোগা এদের খাঁই ত জানেন। শ'খানেক ত চাই এখন।

আমি এগোচ্ছি। খেয়ে-দেয়ে তুমি তাহলে আমার বাড়ীতে এসো।

আচ্ছা, আচ্ছা।

গিরীশবাবু আবার অন্ধকারে দ্রুতপায়ে বাড়ীর দিকে রওনা হলেন। নলিনী-বাবু কিন্তু সেইখানে দাঁড়িয়েই মাথার মধ্যে কি-একটা হিসেব করলেন কিছুক্ষণ। তার পর ঘরের ভেতরে গিয়ে দরজা বন্ধ করলেন। বিছানায় বসলেন। তখনো হিসেবটা চলছে মাথার মধ্যে।

একশো টাকার মধ্যে নিজের জন্যে প্রথমেই কতটা সরিয়ে রাখা হবে, হিসেবটা তারই।

তেইশ

আজ কলকাতা অভিযানের দিন।

ঘুম থেকে উঠে রজনী যে-পৃথিবীর দিকে চোখ মেলে তাকাল, সেখানে কোথাও কোন রকম রূপান্তর ঘটে নি। সবই সেই আগের দিনের মতই ধরা-বাঁধা, ছক-কাটা। রজনী নিজের মনের মধ্যে একটা গতির উত্তেজনা নিয়ে চারপাশের ঢিলে-ঢালা মন্থর পরিবেশের মধ্যে হাঁফিয়ে উঠল। বারোটার সময় তার অভিযানে বেরোবার কথা। কিন্তু সময় কিছুতেই এগোতে চায় না। বড় তালগাছের ছায়াটা কোন দিকে কতটা বাঁকলে বারোটার সময় হয়, রজনী তা জানে। কিন্তু সে-ছায়াটাও কিছুতেই যথাস্থানে এসে পৌঁছচ্ছে না। রজনী উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরতে ঘুরতে গিয়ে পৌঁছল সাধনদের বাড়ীর সামনে। সাধনের বাবা বড় গোসাঁই আর ভুবন ঘোষাল তামাক খেতে খেতে কি যেন গোপন বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিলেন। রজনীকে দেখে তাঁদের আলোচনাটা থেমে গেল। বড় গোসাঁই ডাকলেন—আরে রজনী, শুনে যা।

রজনী কাছে এলে বললেন—খবর শুনেছিস?

কিসের?

আমাদের ভুতোর। ভূতনাথ যে জেলখানায়।

রজনীর কান দুটো ঝাঁ-ঝাঁ করে উঠল নিমেষে।

জেলখানায়?

হ্যাঁ হে, জেলখানায়। জাল নোট ধরা পড়েছে তার কাছ থেকে। জাল নোটগুলো কোঁথা থেকে এল বলতো? বাইরে থেকে লোকে হাতে গুঁজে

দিয়ে যাবে, তা সম্ভব নয়। আর ভুতোও কি তেমন ছেলে যে জাল নোট চেনে না? তা নয়, অন্য কোথাও রহস্য আছে এর।

রহস্য আছে নিশ্চয়ই, এটা রজনীও বুঝল। বড় গোসাঁই-এর সঙ্গে গিরীশবাবুর বহুকালের বিরোধ। বিরোধ অর্থে লাঠালাঠি-ফাটাফাটি নয়। দু-বাড়ীতে দু-বাড়ীর ছেলে-মেয়ে সকলেই যাতায়াত করে। কিন্তু দুই কর্তা কেউ কারুর বাড়ীর ধুলো মাড়ান না। রজনী বুঝল, গিরীশবাবুর ওপরই সন্দেহ প্রকাশ করছেন বড় গোসাঁই।

রজনীর মনটা ভরে উঠল বিস্বাদে। আর দাঁড়িয়ে থাকতে ইচ্ছা করল না তার সেখানে। সে চলে যাওয়ার উদ্যোগ করলে বড় গোসাঁই বললেন—তুমি ত স্টেশনের দিকে যাচ্ছ, আজ তোমাদের কি যেন অভিযান না কি সব আছে। ঐদিকে যখন যাচ্ছ, একটু খোঁজ-খবর নিও তো ব্যাপারটার।

ঘোষাল বললেন—আর দেখ বাবা, এ-সব কথা আর কাউকে শুনিও নি যেন। বা আমরাও যে বলা-বলি করেছি কাউকে জানিও নি।

রজনী সাদামাঠা জবাব দিলে—আজ্ঞে না।

স্নান-খাওয়া সেরে বারোটার সময় ঝড়ুকে ডাকতে গিয়ে রজনী শুনলে, ঝড়ু এখনও ফেরে নি। রজনী ঝড়ুর বৌকে বললে—আমি এগিয়ে যাচ্ছি। ঝড়ুকে বলো সে যেন আসার পথে শ্রীপতিকাকাকে ডেকে নেয়।

বিরক্তিতে রজনী আর ঝড়ুর জন্যে অপেক্ষা করলে না। যে-দিকেই সে চোখ তুলে তাকায় কেমন একটা উৎসাহহীন নৈরাশ্য তাকে পীড়িত করে সকল সময়ে। সময় সময় তাই নিজেকেই তার মনে হয় ভীষণ খাপছাড়া। অন্যদের সঙ্গে তার ব্যক্তিত্বের এই ব্যতিক্রমকে সে নিজেই সন্দেহের চোখে দেখে।

বৈশাখের উত্তপ্ত রোদ আকাশ জ্বালিয়ে মাটি পুড়িয়ে চিতার আগুনের মত জ্বলছে। ধুলোয় পা-ফেলা যায় না। সেই জন্যেই জুতো পায়ে দিয়ে বেরিয়েছিল রজনী। সস্তা দামের মোটা চামড়ার জুতো। তার ওপর বহুকাল পায়ে দেওয়া হয় নি। তাই চামড়া শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। রজনী সকালবেলায় একবার জলে ডুবিয়ে মেজে-ঘষে নিয়েছে। কিন্তু মাইল খানেক হাঁটার পর পায়ের গোড়ালিতে ফোস্কা পড়তে শুরু হল। রজনী ফোস্কার ভয়েই পকেটে ন্যাকড়া এনেছিল। সেটা জুতোয় লাগাতে ব্যথাটা কমলো বটে খানিক, চলাটা কিন্তু ঠিক স্বাভাবিক হল না। ডান পায়ে খোঁড়ানোর টান রয়ে গেল।

স্টেশনে পৌঁছতে আর যখন মাইল দুয়েক বাকী, সেই সময়ে রজনী দেখতে পেলে দুর থেকে একটা বিরাট মিছিল আসছে। একটা গাছের ছায়ায় দাঁড়াল সে। রোদ লেগে পলাশের মত রক্তিম পতাকাগুলো বাতাসে কাঁপতে কাঁপতে এগিয়ে আসছে মন্থর গতিতে। মেঘ গর্জনের মত মিছিলের সমবেত স্বরের গম্ভীর নিনাদে রজনীর পায়ের তলার মাটিতেও কাঁপুনী জাগল ধীরে ধীরে। সেই সঙ্গে খান খান হয়ে ভাঙতে লাগল তার মনের জড়তা। রজনী ভাবতে লাগল দেশটা কেবল তার গ্রাম নয়। নিজের গ্রামের প্রাণহীন মানুষগুলোকে দেখে যদি সে তার মনের নৈরাশ্যের বোঝাকে ক্রমশ ভারী করে তোলে সেটা তার দেশ সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতার দোষ। দেশে নিদ্রিত মানুষ অনেক রয়েছে বটে, কিন্তু দেশ নিদ্রিত মানুষের দেশ নয়। ক্ষুধা মানুষের জীবনকে জীর্ণ করে তুলেছে বটে কিন্তু মানুষ ক্ষুধার ক্রীতদাসত্বকে স্বীকার করে নি কখনো। শাখা-প্রশাখার শীর্ষে গাছ যেমন পুষ্পস্তবক ফুটিয়ে তোলে, প্রখর রৌদ্র তাপের উর্ধ্বে জলীয় বাষ্প যেমন আয়োজন করে শীতল ধারাজলের মেঘলোক, বেদনা-বঞ্চনা মৃত্যু ও মুমূর্ষার উর্ধ্বে তেমনি চিরস্থির হয়ে রয়েছে একটি নিত্যকালের সত্য। সেই সত্যের কাছ থেকেই প্রেরণা আসে জীবনে, আসে কল্যাণের প্রতি উৎসাহ, মঙ্গলের প্রতি আকাঙ্ক্ষা, শান্তি ও সমৃদ্ধির প্রতি অবিচলিত বিশ্বাস।

রৌদ্রদীপ্ত দুর দিকচক্রবালের পটভূমিকায় বহুদুরব্যাপী বিরাট মিছিলের ধ্বনিত নিনাদের দিকে কান পেতে রেখে রজনী অন্তরে যেন অনুভব করলে সেই সত্যকে।

মিছিল সামনে আসতে রজনী দেখলে সেটি পরিচালনা করছে একটি মেয়ে। অল্প বয়সের বিধবার মত দেখতে। রুগ্ন কিন্তু গায়ের রঙ উজ্জ্বল। এত উজ্জ্বল যে চেঁচিয়ে শ্লোগান দেওয়ার সময় তার গলার ফুলে-ওঠা নীল শিরাগুলো প্রত্যক্ষ করা যায়। সর্বাঙ্গে কোথাও সাজ-সজ্জা বা মহিলাজনোচিত আভরণের বালাই নেই। পুরুষালি নাক। মাথার এলোচুল বাতাসে আগুনের শিখার মত উড়ছে।

তার পিছনে গৃহস্থ চাষী-সংসারের বৌ-ঝি ও বৃদ্ধা-প্রৌঢ়া রমণী। মেয়েদের পিছনে পুরুষ। তাদের মধ্যেও বৃদ্ধ বা প্রৌঢ়ের সংখ্যা কম নয়। একটি চাষী-বৌকে দেখে রজনীর চারুর মুখ মনে পড়ে গেল। কোলে দুধের শিশুকে নিয়েই মিছিলে চলেছে। চারুকে সঙ্গে নিয়ে এলে হত। সে-কথা গ্রামে বসে মনে মনে একবার ভেবেও ছিল রজনী। কিন্তু সঙ্গে আর কেউ থাকবে না কেবল

চারু একা আসবে, রজনীর গ্রামের সমাজ সেটাকে মুখ বুজে সহ্য করার মত মৃত বা অসাড় নয়, এটা বুঝেই রজনী চারুকে আমন্ত্রণ জানাতে সাহস পায় নি। অথচ এখন এই স্ত্রী-পুরুষের সমবেত মিছিলের সামনে দাঁড়িয়ে রজনীর সেই অসম্ভব ইচ্ছাকে মনে হচ্ছে কত স্বাভাবিক। আসলে রজনীর রক্তে জীবনের নির্ভয় উদ্দীপনা জেগে উঠেছে এই মুহূর্তে।

রজনী মিশে গেল সেই মিছিলের সঙ্গে। প্রথম দিকে তার চীৎকার করে শ্লোগান দিতে লজ্জা করছিল। বিপুল জন সমষ্টির উষ্ণ প্রাণাবেগের স্পর্শে সে-লজ্জা-জড়তা-স্থবিরতা গলে গেল। কিছুক্ষণ পরে সে অনুভব করলে তার সারা শরীর ঘামে ভিজে উঠেছে। কপালের নোনতা ঘাম এসে পড়ছে মুখের মধ্যে। কিছুক্ষণ সে বোধ হয় আচ্ছন্নের মত তারস্বরে চীৎকার করেছিল। অনভ্যাসের ফলেই তার গলার কণ্ঠনালীর ভেতরটা টনটনিয়ে উঠেছে। রজনী গলার স্বরটাকে খাটো করে নিলে।

স্টেশনের সোয়া মাইল দুরে উঁচু চওড়া বাঁধের নীচে বাজারের ফাঁকা চত্বরে লোক জমা হচ্ছে। দুপাশে দোকান-পাট। আরও খানিকটা দুরে সিনেমা হল। এখনো বেশী লোক জমা হয় নি। দুপুরটা পেকে উঠেছে। ঠা-ঠা রোদে পথের ধুলো থেকে আগুন ঠিকরোচ্ছে। রজনীর মিছিলটাও সেই চত্বরে পেঁাছে বিশ্রাম নিল ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসে। কেউ গাছের ছায়ায়, কেউ দোকান-পাটের ঝাঁপের নীচে। মাঠের কোণে একটা ঝাঁকড়া শিরীষ গাছ রোদে জ্বলছিল। একজন উৎসাহী অল্প বয়সের কৃষক তার হাতের ঝাণ্ডাটা গাছের ওপর উঠে একেবারে মগডালে বেঁধে পত্‌পত্‌ করে উড়িয়ে দিলে। রজনী একটা বিড়ির দোকানের বেঞ্চে বসেছিল। সঙ্গের কৃষকদের সঙ্গে তার আলাপ করার ইচ্ছা ছিল যথেষ্ট। কিন্তু তাদের উৎসাহ-উদ্দীপনা ও ঐক্যবদ্ধ মনোভাবের দিকে তাকিয়ে রজনীর বড় নিষ্প্রভ ঠেকছিল নিজেকে।

কিছুক্ষণ পরে একজন কৃষক নিজেই এসে আলাপ করলে তার সঙ্গে।

আপনার বাড়ী কোথায় কমরেড ?

রজনী জবাব দিলে—বাখুরী।

বাখুরী ? উটা ত রবিভাগ থানায়, না ?

হ্যাঁ।

আচ্ছা, সাবুটি শিয়েখালি আপনাদের পাশের গ্রাম ? উটাত তাহলে বিজনবাবুর এলাকা। বিজনবাবুকে চেনেন ?

হ্যাঁ, চিনি বৈকি, ওঁর বাড়ী আমাদেরই গ্রামে। আমরা ওঁকে ছোটবাবু বলে ডাকি।

তাহলে ত ভাল জায়গাতেই বাড়ী আপনার। তা আপনাদের গ্রাম থেকে মিছিল এল নি?

না। মিছিল আসে নি। তবে লোকজন আসবে কিছু।

আলাদা আলাদা আসবে? সেটা তো ভাল নয় কমরেড। সংগ্রামটা কি একা-একা আলাদা আলাদা করবার জিনিষ? একসঙ্গে একজোটে করতে হয়। আপনাদের গ্রামের সমস্ত মেহনতী মানুষ যে ঐক্যবদ্ধ সেটা বিরোধী পক্ষের কাছে প্রমাণ হবে কিসে যদি আলাদা আলাদা হয়ে থাকেন সবাই?

কৃষকটির কথা শুনতে শুনতে রজনীর মনে পড়ে নিখিলের কণ্ঠস্বর। ঠিক তারই বক্তব্য শুনছে যেন। রজনী ভাবে সামান্য একজন কৃষক হয়েও লোকটির চিন্তা-ভাবনা কত উন্নত।

রজনী একটা বিড়ি ধরায়। আর একটা দেয় পাশের কৃষক সঙ্গীটিকে। সেই সময় ওরা শুনতে পায় অনেক দূর থেকে একটা প্রবল গর্জন দ্রুতবেগে এগিয়ে আসছে। পাশের লোকটি এবং চত্বরের লোকজন ছুটে গিয়ে উঁচু বাঁধের ওপরে দাঁড়ায়। রজনীও উঠে আসে।

একটা ট্রেন এল স্টেশনে। মেদনীপুরের দিক থেকে। ট্রেনের প্রতিটি কামরার জানালা থেকে উড়ছে লাল পতাকা। মানুষকে দেখা যায় না। কিন্তু তাদের উত্তাল গর্জন স্টেশনের প্লাটফর্মকে কাঁপিয়ে ছড়িয়ে পড়ছে দিগ্‌দিগন্তে। প্লাটফর্মের উঁচু দেবদারু গাছের মাথার ওপর কুণ্ডলী পাকাচ্ছে এঞ্জিনের কালো ধোঁয়া। মানুষের গর্জনে ভীত সন্ত্রস্ত কাক-পক্ষীর দল গাছের আশ্রয় ছেড়ে ঘুরপাক খাচ্ছে সেই কালো ধোঁয়ার ভেতর। তীব্র কয়েকটা শিস টেনে ট্রেনটি প্লাটফর্ম ছাড়ল। কোলাহলের শব্দ মিলিয়ে গেল দূরান্তে। বাঁধের ভিড় নেমে এল নীচের চত্বরে। কিন্তু এঞ্জিনের ধ্বক্ ধ্বক্ শব্দ আর যাত্রীদের গর্জনের প্রতিধ্বনি অনেকক্ষণ ধরে বেজে চলল রজনীর বুকের মধ্যে।

সেটা থামতে না থামতেই আবার কানে এল দূরাগত মিছিলের কোলাহল। দিগন্তের নানা প্রান্ত থেকে লম্বা মিছিল হেঁটে আসছে মাঠের ওপর দিয়ে। লাল পতাকায় দিগন্তে যেন রক্তের রঙ লেগেছে। কেন বোঝা যায় না রজনী লাল রঙের বেশী প্রাচুর্য বেশীক্ষণ সহ্য করতে পারে না।

কিন্তু সব পতাকার রঙই লাল নয়। অন্য দলের অন্য রঙের পতাকাও ছিল

অনেক। তবে লাল রঙটারই প্রাচুর্য বেশী। এক-একটা মিছিল এসে পৌঁছয়। চত্বরের সমাবেশ আকাশ মাটি কাঁপিয়ে তাদের সম্বর্ধনা জানাতে জয়ধ্বনি তোলে। শিরীষ গাছের সরু সরু পাতায় তার রেশ অনেকক্ষণ শিরশির করে বেড়ায়। ওদিকে স্টেশনে এসে থামে একের পর এক আরও অনেক কলকাতাগামী ট্রেন। চত্বরের মানুষের মধ্যে ক্রমশ আলোড়ন ওঠে উৎসাহের। ইতিমধ্যে কে একজন গায়ক চড়া রামপ্রসাদী সুরে একতারা বাজিয়ে গান ধরেছে। তাকে ঘিরে একটা গোলাকৃতি ভিড়। চারপাশেই চাপ চাপ ভিড়। চাপা কলরব, কথা, উত্তেজনা, থেকে থেকে আকাশ-মাটি কাঁপানো জিন্দাবাদের ধ্বনি আর দৃষ্টির সীমার মধ্যে ক্রমশ ছাপিয়ে-ওঠা উত্তাল জনস্রোত রজনীকে এক চেতনাহীন আবিষ্টতায় আচ্ছন্ন করে তুলল। সে যেন এই জনস্রোতে কুটোর মত ভাসছে।

ছোটবাবু কিছুক্ষণ আগে একটা মিছিল নিয়ে পৌঁছলেন। রোদে ঝলসে ছোট হয়ে গেছে ছোটবাবুর মুখখানা। নিখিলেরও তাই। নিখিলকে অনেকবার কাছ দিয়ে চলে যেতে দেখেছে। নিখিলের চোখ পড়ে নি তার দিকে, খুব ব্যস্ত। রজনীর মিছিল পরিচালনা করেছিল যে মেয়েটি তার নাম মীরা। নিখিলকে কয়েকবার মীরা নামে ডাকতে শুনেছে সে। ওরা দুজনে প্রায়ই কি সব কথা বলছিল, হাসছিল। ওদের মুখে কোন দুশ্চিন্তার দাগ ছিল না।
হঠাৎ সমস্ত চত্বরটা থমথম করে উঠল। চত্বরের সমস্ত মানুষ জিন্দাবাদ দিয়ে উঠল সমস্বরে। আবার থমথমে ভাবটা ফিরে এল। কেউ বোধ হয় বক্তৃতা শুরু করেছে। হ্যাঁ, বক্তৃতা হচ্ছে। মুখ দেখা যাচ্ছে না বক্তার। এইবার অভিযান শুরু হবে। সরকারের খাদ্য-নীতির সমালোচনা হচ্ছে।
কলকাতার ডালহৌসী অঞ্চলটা নাকি ছেয়ে আছে পুলিসে। হাওড়া স্টেশনেও ধরপাকড় চলার সংবাদ এসে পৌঁছেচে। এখানেও থানার সামনে থেকে স্টেশন পর্যন্ত জারী করা হয়েছে একশ চুয়াল্লিশ ধারা। দেশের বুভুক্ষু মানুষকে আজ কোটি কণ্ঠে শপথ নিতে হবে। আমরা এই প্রজাপীড়ক দুঃশাসনের রাজত্বকে উপড়ে ফেলবো মাটি থেকে।
একের পর এক বক্তা একই রকম বক্তৃতা দিয়ে চলেছে। ছোটবাবুর গলার আওয়াজ কানে এল রজনীর। হয়তো তিনিও কিছু বললেন। কে একজন ঘোষণা করলেন জনতাকে এইবার শান্তভাবে স্টেশনের দিকে অগ্রসর হতে। সঙ্গে সঙ্গে চত্বর জুড়ে জনতার কণ্ঠ আবার ফেটে পড়ল উচ্চ নিনাদে।

বাঁধের ওপর দ্রুতবেগে লোক উঠছে। আগে আগে মেয়েরা। বুড়ীদের হাত ধরে বাঁধে তোলা হচ্ছে। ক্রমশ দীর্ঘ হচ্ছে মিছিলটা। সামনে এগোনোর জন্যে ছটফট করছে মানুষগুলো। লোকের ঠেলায় রজনী কখন অনেক পিছিয়ে পড়েছে।

রজনী কয়েকবার ঘাড় বাঁকিয়ে লক্ষ্য করেও মিছিলের শুরু ও শেষের খোঁজ পেল না। বাখুরী থেকেও কেউ আসে নি। অবিশ্রান্ত শ্লোগানের শব্দে ভারী হয়ে উঠেছে বাতাসটা। কোথাও কোথাও শ্লোগান থামলে নানারকম কথা কলরব গুঞ্জন ভেসে আসে। নিজেদের দুর্ভাগ্যকে নিয়ে বিদ্রূপ করছে নিজেরাই।

ও সাঁতরা কাকা, ধামা নিয়ে এসছো।

কেন রে ?

হাই দ্যাখ। চালের মিনিষ্টার যে মোদের জন্যে ছ'আনা সেরের চাল নিয়ে বসে আছে। আনবে কিসে।

তুই কি এনেছু রে ফচকে ছোঁড়া।

আমি ? এই দেখ না ফুটো পকেট দুটো। হাতী গলালে হাতী গলে যাবে।

চলতে চলতে এক জায়গায় এসে হঠাৎ সমস্ত মিছিলটা থমকে গেল।

কি হল ?

ঠেলা মার কেন হে ? আগের লোক দাঁড়িয়ে পড়লে আমি কি করে এগোবো।

দাঁড়াও, দাঁড়াও। থানার সামনে আটকেছে।

বন্দুক দেখাচ্ছে নাকি ? কটা বন্দুক আছে ?

বন্দুকে বারুদ আছে কিনা দ্যাখ আবার। সবটাই ত ওদের ফক্কীবাজীর কারবার।

মাথায় চাঁদা তুলে একটা করে চাঁটি মারলেই ত তুবড়ী উড়ে যাবে।

থাম হে, আটকেছে। গণ্ডগোল হবে।

কি করে বুঝলে ?

এ্যারেষ্ট করবে নাকি ?

করছে নাকি ? ঢিল মার, ইঁট ছুঁড়ো না গোটাকতক।

থামুন, থামুন, আপনারা ও রকম হট্টগোল করবেন না।

নেতারা আগে আছেন। তাঁরা কথা বলছেন।

নেতা-ফেতা পরে হবে। গায়ে যদি হাত দেয়, মাথার খুলি উড়িয়ে দুবো।

আমরা কি হামলা করতে বেরিয়েছি কমরেড। ওসব কথা বলবেন না।

সোজা আঙুলে ঘি ওঠে না কমরেড। রক্তের বদলে রক্ত চাই।

মেয়েদের এ্যারেষ্ট করছে।

এ্যারেষ্ট করছে? এই ছুটো। ফাটাও দেখি।

আপনারা শান্ত হোন। কোথায় চলেছেন? এ-রকম করলে পরিণতি খুব খারাপ হবে। আপনারা ধৈর্য ধরুন। কোন গণ্ডগোল হবে না।

সমস্ত মিছিলের শৃঙ্খলা তছনছ হয়ে গেল নিমেষে। সব লোক নয়, কয়েকজন লোকই উত্তেজিত হয়ে এই-রকম বিশৃঙ্খলা ঘটালে। কয়েকজন কর্মী মিছিলের শুরু থেকে শেষ প্রান্ত পর্যন্ত চীৎকার করে গেল—

আপনারা হট্টগোল কিংবা হাঙ্গামা করলে ভুল করবেন। যারা হাঙ্গামার চেষ্টা করছে তারা কৃষকশ্রেণীর বন্ধু নয়। তারা এই আন্দোলনকে ফাঁসিয়ে দিতে চায়। শান্ত হোন আপনারা।

ইনকিলাব···জিন্দাবাদ।

পুলিসদের আক্রমণ করে ইঁট ছুঁড়েছে।

ছিঃ ছিঃ! ওদের থামাবার লোক নেই।

কি জানি, সামনে কি হচ্ছে।

গুলী চালাবে নাকি?

ওদের থামান না মশাই।

গুলী চলবে। একজন কনেষ্টবলের মাথায় লেগেছে।

ইনকিলাব···জিন্দাবা-আ-দ।

ইনকি···

রজনীর কণ্ঠস্বর আচমকা যেন বজ্রাঘাতের শব্দে বজ্রাহতের মত স্তব্ধ হয়ে গেল। পর পর তিনবার বন্দুকের গুলীর শব্দ মানুষের বিপুল গর্জনকে ছাপিয়ে বাতাস বিদীর্ণ করল। রজনীর অন্তরে একটা ভয়ার্ত বেদনা ডুকরে উঠল সেই মুহূর্তে। সে পাশের লোককে বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে প্রশ্ন করলে—

গুলী চলল? মরল নাকি কেউ?

মারবার জন্তেই ত গুলী চালায়।

এগিয়ে চলুন। এবার আর থেমে থাকা নয়। লাঠি চালালে পারত। গুলী কেন?

মেয়েরাই তো আগে ছিল। তাদের কেউ কি···

একজন কৃষক মারা পড়েছে।

আহা-হা। কেউ চেনেন নাকি, কোথাকার কৃষক।

ওরা বলছে আমরা দাঙ্গাকারীকেই আক্রমণ করেছি। মিছিলকে নয়।
হাতে একটা হেঁসো' থাকলে—
মিছিলের সামনের দিক থেকে এবার একটা নতুন শ্লোগান গর্জন তুলে এগিয়ে আসে।
শহীদ নিতাই মণ্ডল···জিন্দাবাদ।
অভিযান কি বন্ধ থাকবে?
নেতারা কি বলেন দেখ।
থেকে থেকে শ্লোগানের শব্দ ঝাঁঝিয়ে ওঠে।
শহীদ নিতাই মণ্ডল···জিন্দাবাদ।
হত্যাকারীর বিচার···চাই।
দূরে আবার একটা কোলাহল জেগে উঠেছে। বসে থেকে থেকে মাথাটা চিন্তায় ভারী হয়ে উঠেছিল রজনীর। সে উঠে দাঁড়িয়ে ধীরে ধীরে ভিড়ের পাশ কাটিয়ে একটু এগিয়ে গেল। বেশ কিছুটা এগোতেই চোখে পড়ল একটি আলুথালু যুবতী ও একটি উন্মাদিনী বৃদ্ধাকে অন্য কয়েকজন নারী পুরুষে মিলে সামলাবার চেষ্টায় হিমসিম খাচ্ছে। যুবতীটি বেশী জোরে কাঁদতে পারছে না। কেবল চেষ্টা করছে মাটিতে আছাড় খাওয়ার। আর বৃদ্ধাটি চীৎকার করছে—
হায় বাবা, তুই কোথা গেলু রে, ও বাবা, তুই কোথা গেলু রে।
রজনীর চোখ দুটো জলে আবছা হয়ে এল।
ক্রমে ক্রমে সমস্ত উত্তেজনাতেই ঝিম ধরে আসে। কোলাহল থিতিয়ে গিয়ে মরা আগুনের নিস্তেজ শিখার মত কেবল একটুখানি উষ্ণতার ছিটে-ফোঁটা আভাস এখানে-ওখানে উঁকি দেয়। মাঝে মাঝে জনতার বিপুল স্তব্ধতা চিরে মেয়েলী গলার করুণ কান্না বাতাসে ভর দিয়ে ব্যথিত বিপর্যস্ত মৌন হৃদয়গুলির ওপর আছড়িয়ে পড়ে। কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত যে-হারে রজনীর রক্তে বীরত্বের উত্তেজনা সংক্রামিত হয়েছিল, ঠিক সেই হারে তার অন্তর মৃত্যুশোকে অভিভূত হতে শুরু করে। জীবনের সন্ধানে বেরিয়ে যে লোকটা জীবন হারাল, তার অপূরণীয় ক্ষতি কি দিয়ে পরিশোধ করা হবে, রজনী এ প্রশ্নের কোন উত্তর খুঁজে পেল না। ঐ মৃত রক্তাক্ত মানুষটিকে পথের প্রান্তে ফেলে রেখে তারা কি যে যার নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রয়োজনে আবার শহরের দিকে এগিয়ে যাবে? এই অভিযানের মধ্যে যেন এইরকম একটা সমষ্টিগত স্বার্থপরতার স্বরূপ ধরা পড়ল রজনীর বিবেচনায়।

রজনী লক্ষ্য করেছে নেতাদের মুখে কোথাও কোন বেদনা বিষণ্ণতার চিহ্ন নেই। এই মৃত্যু যেন তাঁদের আন্দোলনকে বলশালী ও ব্যাপ্ত করে তোলার পক্ষে পরম প্রয়োজনীয়। শস্যের পুষ্টির জন্যে যেমন পচা সারের প্রয়োজন, এ-প্রয়োজনও কি সেই স্তরের?

গুলীবিদ্ধ একটি মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রজনীর পূর্বেকার বহু ধারণা ও বিশ্বাসের রঙ যেন ঘোলাটে হয়ে এল। সঙ্ঘবদ্ধ সংগ্রামের মধ্যে মানুষের বীরত্বের, বিজয়ের ও গৌরবের দিকটাই তার চোখে উদ্ভাসিত হতো আগে। আজ তার উল্টো দিকটা প্রকাশিত হল। সে দিকটা সম্ভ্রম ও মর্যাদাহীনতার দিক, মনুষ্যত্বের একটা বিরাট দৈন্যের দিক। মানুষ বঞ্চিত, পীড়িত, ক্ষুধার্ত। সেইজন্যেই কি আমার অধিকার তাদের ভেড়ার পালের মত এক জায়গায় জড়ো করে পথের রৌদ্রে শুকিয়ে পুড়িয়ে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া এমন একটা পথে, যে-পথে প্রাণধারণের সুযোগ-সুবিধা যতই দুরবর্তী হোক, গুলীবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু, কারাবাস ও নানাবিধ লাঞ্ছনার জ্বালা নগদ-বিদায়ের মত অবশ্যম্ভাবী। যেখানে একটি জীবনও বিপন্ন কিংবা বিপদগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে, সে পথে মানুষকে জীবনের প্রলোভন দেখিয়ে আহ্বান করাকে মনুষ্যত্ব-বিরোধী বলে ঘৃণা করা হয় না কেন? স্বেচ্ছায় যারা প্রাণ দিতে চায় দিক। কিন্তু দলের প্রয়োজনে মানুষকে সে-পথে আকর্ষণ করার পন্থাকে নিষিদ্ধ করা হোক।

রজনী একা মৃতের মত অসাড় নিস্পন্দ শরীরে বাঁধের ধুলোর ওপর বসে এই জাতীয় চিন্তা করে চলল। মানুষের জীবনে বেদনা বঞ্চনার চেহারাটা আজ প্রেতমূর্তির মত বিরাট ও বিকট আকার নিয়েছে, অভিযানে আসার আগে এই সত্যটাই রজনীকে ক্ষেপিয়ে তুলেছিল। অভিযানের মধ্যে দাঁড়িয়ে আজ আর-একটি ভয়ঙ্কর সত্যকে উপলব্ধি করল সে। জীবন্মৃত হয়ে বেঁচে থাকা যথেষ্ট বেদনাদায়ক। কিন্তু জীবিত থাকার মোহ ও মহিমা সকলের চেয়ে বড়। আমি বেঁচে আছি, নিশ্বাস-প্রশ্বাসে দুঃখের ও আনন্দের, গাছের ও ফুলের, জলের ও আলোর ঘ্রাণ ও স্পর্শ পাচ্ছি, এর চেয়ে বৃহত্তর-মহত্তর উপলব্ধি আর কিছু নেই।

রজনী তাই বসে থেকে তার মনের অসীম ঘৃণা প্রকাশ করল তাদের উদ্দেশ্যে, যারা নরহত্যার শাণিত অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ক্ষুধিত মানুষের পথযাত্রাকে অবরোধ করে দাঁড়ায়, আর যারা সেই পথকেই মুক্তিলাভের একমাত্র পথ বলে নির্দেশ দেয়।

আকাশে সূর্যাস্ত ঘনিয়ে এসেছে। দিগন্তের মেঘে চাপ-বাঁধা জমাট রক্তের রঙ। পৃথিবীতে একটি দিনের অবসান হল, একটি জীবনের আত্মাহুতি নিয়ে।

দূরের কোলাহলটা ক্রমশ জট পাকিয়ে উঠছে। রজনী একটা চায়ের দোকানের চালায় উঠে দাঁড়াল। দূরে তাকিয়ে দেখতে পেলে কি একটা বিষয় নিয়ে দু-দল মানুষের মধ্যে তুমুল বাক-বিতণ্ডা চলেছে। দু-দল মানুষই হয়ে উঠেছে প্রায় মারমুখো।

রজনী চায়ের দোকানদারকে ডেকে জিজ্ঞেস করলে—আবার কিসের হট্টগোল শুরু হল?

দোকানদার জবাব দিলে—এখন মড়াটাকে নিয়ে টানাটানি চলেছে।

সে কি?

হ্যাঁ সেটাই ত হচ্ছে। একদল বলছে—ও মড়া আমাদের। আমাদের দলের লোক। আমরা ওকে নিয়ে গ্রাম-প্রদক্ষিণ করবো। আরেক দল বলছে—না, লোকটা আমাদের মিছিলে এসেছিল। ও মড়া আমাদের।

দোকানের ভেতরে একজন ভুঁড়িওলা মোটাসোটা লোক কিছু খাচ্ছিল। লোকটি রজনীর দিকে তাকিয়ে বললে—একটা কাজ করলেই ত সব ঝামেলাটা চুকে যায় বাবা। লোকটা ত মরেইছে। মরতে ত আর বাকী নেই। তাহলে দু-দলে ঝগড়া না করে এ আধখানা ও আধখানা ভাগাভাগি করে নিলেই ত হয়।

রজনীর ইচ্ছে করল তার কড়া-পড়া হাতের একটা চড়ে লোকটার থসথসে ফোলা গালের চামড়াটা ফাটিয়ে দেয়। মানুষের মৃত্যুও এদের রসিকতার বিষয়!

রজনী দোকান থেকে নেমে ভিড়ের একজন লোককে জিজ্ঞেস করলে—তাহলে শহরে ত যাওয়া হবে না।

লোকটা রজনীর এই বোকার মত প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে এমন বিদ্রূপ-ভরা চোখে তাকাল যে সেটার মধ্যেই রজনী উত্তর পেয়ে গেল তার জিজ্ঞাসার।

হ্যাঁ, সত্যিই ত, সন্ধ্যে নেমে এল। এখন কি আর শহরে যাওয়া যায়।

রজনীর আর বাঁধে দাঁড়িয়ে থাকতে ইচ্ছে করল না। বেদনায় বিক্ষোভে তার সমস্ত অন্তঃকরণ হাঁফিয়ে উঠেছে। আরও কিছুক্ষণ এখানে থাকলে তার মাথাটা বোধ হয় খারাপ হয়ে যাবে। যারা দেশের জনসাধারণকে সঙ্ঘবদ্ধ হবার উপদেশ দেয়, তাদের নিজেদের মধ্যেই এত বিরোধ! একটা মৃত মানুষের

গায়ে নিজেদের দলের ছাপ মারার জন্যে যারা অমানুষের মত কলহ-বিদ্বেষে উন্মত্ত হয়ে উঠতে পারে তাদের হাতেই দেশের মঙ্গলের ভার তুলে দিল কারা ?

বাঁধের নীচে নেমে অন্য বাঁকা পথে অনেকখানি ঘুরে রজনী ঠিক করল নদীর বাঁধ ধরবে। বড় রাস্তা দিয়ে বাড়ী ফিরবে না। তার গ্রামের অনেক লোক সাইকেল রিক্সা চালায়। তাদের সঙ্গেও দেখা হতে পারে। দেখা হলে লোকে যেন তাকেই এই হত্যাকাণ্ডের জন্যে দায়ী ভাববে, এই রকম একটা ভয় বা ভাবনা মাথায় এল তার।

বাঁধের নীচে নেমে দোকান-পাট পেরিয়ে জলা-জমির ওপর আঁকাবাঁকা পথে বেশ কিছুটা এগিয়ে রজনী দেখতে পেলে একটি ছেলে ও একটি মেয়ে পাশাপাশি বেশ উচ্ছল হাসিতে কথা বলতে বলতে তারই দিকে এগিয়ে আসছে। কাছে আসতে রজনী অবাক হয়ে দেখলে, ভুতু। সঙ্গের মেয়েটিকে রজনী চেনে না।

ভুতু বাবু !

আরে রজনী ! কোথা এসেছিলে তুমি ?

আজকে ঐ এ ছিল কিনা আমাদের।

ও—ঐ কলকাতায় খাদ্য অভিযান ছিল বটে, হ্যাঁ হ্যাঁ। তা একটা না ক'টা মানুষ মরেছে শুনলাম পুলিসের গুলীতে।

হ্যাঁ। মারা গেছে একজন। আর কয়েকজন জখম হয়েছে।

পুলিস গুলী চালিয়ে একজনকে খুন করে ফেললে, আর তোমরা খালি হাতে ফিরছ? কিছু না পার ব্যাটাদের বন্দুকগুলো ত ছিনিয়ে নিতে পারতে।

বন্দুক নিয়ে কি হবে ? ওতে ত পেট ভরবে না।

ভুতু হোহো করে হেসে উঠল।

এত নিরামিষাশী হলে আর রাজনীতি হয় না। দু-চারটে করে বন্দুক এইভাবে দখল করতে না পারলে, লড়াই হবে কিসে ?

লড়াইটা কি মানুষ মেরে ?

এত অল্পেই বৈরাগ্য এসে গেল তোমার। বাড়ী ফিরছ তুমি ?

হ্যাঁ।

আচ্ছা; গৌরাঙ্গ শিবু নিতাই কিংবা বাদল কারুর সঙ্গে দেখা হলে বলো— আমি কাল বাড়ী যাব।

বাড়ীতে কিছু খবর দিতে হবে নাকি ?

বাড়ীতে? না।

রজনীর আরও অনেক কথা জিজ্ঞেস করার ছিল ভুতুকে। কিন্তু সঙ্গে মেয়েটি থাকায় পারল না। হাঁটতে হাঁটতে নদীর বাঁধে পা দিয়ে পায়ের জুতোটা খুলে ফেললে সে। পায়ের ফোস্কাটা বড্ড বেড়ে উঠেছে।

ভুতুর সঙ্গের মেয়েটি শশধরবাবুর। আজ সকালেই থানা থেকে খালাস করিয়ে ভুতুকে তিনি নিজের বাড়ীতে এনে রেখেছেন। মেয়েটির নাম শ্রীলেখা। ফার্স্ট ক্লাসে পড়ে। দেখতে শুনতে অপরূপ নয়। কিন্তু খুব স্মার্ট। পাড়াগেঁয়ে চেহারার ওপর শহরের সবচেয়ে আধুনিক বসন-ভূষণ তাকে বেশ লোকের চোখে লাগার মত আকর্ষণীয় করে তুলেছে।

শ্রীলেখার সঙ্গে ভুতুর দেখা ও আলাপ পুরো একদিনেরও নয়। ভুতু অবাক হয়ে ভেবেছে পিতৃবন্ধু হিসেবে তার চেনা-জানা একটা সংসারে এমন একটি মেয়ে ছিল যার সঙ্গে তার মনের ফর্দের অনেকাংশেই মেলে অথচ ভুতু সম্পূর্ণ ভুলে ছিল তাকে। সত্যিই খুব স্মার্ট মেয়ে শ্রীলেখা। বাড়ীটাও তেমনি। একা একা দুজনের সিনেমায় আসাতে কেউই আপত্তি করলে না। শ্রীলেখা তিন মিনিটে সেজে এল। একদিনেই যেন ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠেছে বহুকালের। আরও বেশী ঘনিষ্ঠ হওয়া যায় কি?

সে-পরীক্ষা এত তাড়াতাড়ি করতে সাহস হল না ভুতুর। তবু সিনেমা দেখতে দেখতে আলগোছে কয়েকবার হাতের ছোঁয়া লাগিয়ে দিলে তার হাতে। কিন্তু শ্রীলেখা এত তন্ময় হয়েছিল ছবির দিকে, যেন চক্ষু ছাড়া তার আর সব কটি ইন্দ্রিয়েরই কার্যক্ষমতা লোপ পেয়েছে। এর ফলে ভুতুর অন্তরের কৌতুহলটা বেড়ে উঠল।

খাওয়া-দাওয়া সেরে রাত্রে ভুতু শোবার ঘরে ঢোকার আগে বললে—মাসীমা, আপনাদের খাওয়া হলে আমার জন্যে কিন্তু এক গ্লাস জল পাঠাবেন। খাওয়া সেরে জল নিয়ে এল শ্রীলেখা। অতি অন্তরঙ্গতার সুরে বললে—বাঃ বা, এত জল খেতে পারেন? ভাত খাওয়ার সময়ই ত দু-গ্লাস খেলেন। ভুতু বললে—এটা তৃষ্ণার মাস।কনা, তাই।

এই বলে গ্লাসটা খাটের সামনে টেবিলে রাখতে না দিয়ে নিজেই হাত বাড়িয়ে দিলে—দাও। শ্রীলেখার আঙুলগুলো তার আঙুলে চাপা পড়ল। সে চোখ দুটো নামিয়ে নিলে। শ্রীলেখা চলে যাচ্ছিল। ভুতু আবার ডাকলে—শোনো।

কি আবার?

এখনো বাকী আছে। রাত্রে শোবার আগে খানিকক্ষণ একটা কিছু না পড়লে আমার ঘুম আসে না।

আমাকে কি করতে হবে?

আলোটায় তেল আছে কি?

শ্রীলেখা হ্যারিকেনটা নেড়ে বললে—সারা রাত ত আর পড়বেন না। যথেষ্ট আছে। আমি চলি।

বাঃ, বেশ কাণ্ড। কেবল আলো হলেই বুঝি বই পড়া হয়। বই চাই ত একটা।

বই কোথায় পাব আমি। বীজগণিত পড়বেন ত দিতে পারি।

তাই দাও।

শ্রীলেখা একটা নতুন লেখকের লেখা উপন্যাস এনে দিলে। ভুতু বইটা খুলেই বললে—ঈস্। যার নাম শ্রীলেখা তার হাতের লেখাটা এত বিশ্রী হওয়া উচিত নয়।

বেশ তাহলে পড়তে হবে না আপনাকে, দিন।

শ্রীলেখা তখুনি চলে না গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ।

কাল থাকছেন ত?

তুমি যদি বল, থাকবো।

সবটাতেই আপনার রসিকতা। বেশ, আর কিছু দরকার নেই ত আপনার?

শ্রীলেখা এমনভাবে কথাটা বললে যেন ভুতুর আরও কিছু দরকারকেই সে এড়িয়ে যেতে চাইছে। ভুতুও তার উত্তরে এমনভাবে 'না' জানালে যেন তার সব চেয়ে বড় দরকারটা 'হ্যাঁ' এর মত ফুটে উঠল।

শোনো। একটু বোসো এখানে।

ভুতু বিছানায় থাপ্পড় মেরে জায়গাটা নির্দিষ্ট করে দিলে।

শুনুন, মা জেগে আছেন।

ভুতুর কাছাকাছি এসে দাঁড়াল সে। সমস্ত শরীরে ভয়ের আড়ষ্টতার কাঁপুনী এল ভুতুর।

না, কিছু নয়। যাও।

আচ্ছা, বসছি। বলুন।

ভুতু তার কাঁপা কাঁপা হাতটা শ্রীলেখার শক্ত ঘাড়ের ওপর রাখতেই সেটা লতার মত বেঁকে নেমে এল। কিন্তু ঠোঁট দুটো পরিপূর্ণভাবে ভালবাসার আস্বাদ

পাওয়ার আগেই শ্রীলেখা ভয়-পাওয়া পাখীর মত ঝটপটিয়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

ভুতু ঘরে খিল দিয়ে আলো নিভিয়ে অন্ধকার জেগে রইল চুপচাপ। চোখে তার ঘুম এল না। মনের মধ্যে চিন্তা এল অনেক। শ্রীলেখার কাছে নিজের তৃষ্ণাকে এত সহজে প্রকাশ করা উচিত হয় নি তার। তার যোগ্যতার কাছে শ্রীলেখা তুচ্ছ। তার পক্ষে ও-ধরনের মেয়েদের পোষ মানানো কিছুই কঠিন নয়। শ্রীলেখা ভাববে তার মত একটা মেয়ের শরীরের স্বাদ পাওয়ার জন্যে সে বোধ হয় কতই না লালায়িত।

কালই আমাকে চলে যেতে হবে সকালে। হ্যাঁ, কাল সকালেই।

শ্রীলেখা শুক্লারাণী নয়।

চব্বিশ

রজনী পরের দিন বাড়ী থেকে বেরোল না প্রায়। তার চোখ-মুখের চেহারা একদিনেই অনেকদিনের জ্বরের রোগীর মত বিবর্ণ হয়ে উঠেছে।

জীবনকে আজ নতুন চোখে দেখছে সে। গা-জ্বালানো চড়া রোদটাও তার মনে হচ্ছে কত মধুর। উঠোনের লাউ-ভারার নীচে সুরেনের পেট-রোগা মেয়েটা গায়ে-মুখে কাদা মেখে চলেছে আনমনে। বীণাপাণি শিলের ওপর ঠক্‌ঠক্ করে হলুদ ছিঁচছে। সুভদ্রা দাওয়ায় পা ছড়িয়ে বসে উঠোনে শুকোতে দেওয়া ধান পাহারা দিচ্ছে লম্বা ছড়ি হাতে। কাক চড়ুইগুলো যেন লুকোচুরি খেলছে সুভদ্রার সঙ্গে। গোয়ালঘরে সুরেনের গলার আওয়াজ। গরুগুলো সুরেনের সঙ্গে কথা বলে। সুরেনও বোঝে তাদের মনের সমস্ত কথা।

পদ্ম এসে বললে—যাও, তাড়াতাড়ি চান সেরে এস দিকি আজ। বলেই সে রজনীর ঝাঁকড়া মাথায় তেল মাখিয়ে দিলে।

পুকুরে কাদের কয়েকটা হাঁস গুগলি খুঁজছিল ডুবে ডুবে। বৈশাখের রোদ পুকুরের জল শুষে নিচ্ছে দিনকে দিন। আর কদিনে বুঝি তলার পাঁক বেরিয়ে পড়বে। রজনীর ইচ্ছে করল এই পেঁকো জলে স্নান না করে আজ সে একটু দূরের পুকুরে স্নান করতে যাবে।

পৃথিবীতে যেন পুনর্জন্ম হয়েছে রজনীর। যেন কালকের গুলীটা তারই বুকে

লাগার কথা ছিল। কিন্তু সে বেঁচে গেছে দৈবক্রমে। তাই তার হৃদয়ে মানুষের প্রতি, মাটির প্রতি, ছোট আনন্দ বড় বেদনায় মেশানো প্রত্যেকের জীবনের প্রতি গভীর মমতা সঞ্চারিত হয়েছে আজ।

দুপুরের ভাত-খাওয়া সেরে রমণী যখন কাজে বেরুচ্ছে রজনী তাকে বললে—মেজদা, কাল মেজকীকে বাপের বাড়ী দিয়ে আসি। অনেক দিন ধরে যাব-যাব করতেছে। আসুক না দুদিন ঘুরে।

বড়দাকে বলেছু? তার মত হলেই মত।

সুরেন গররাজী হল না।

পদ্ম শুনে আনন্দে বোবা হয়ে গেল যেন। মনের অসম্ভব খুশীর নেশাতেই সে সারাদিন মেতে উঠল বেশী-বেশী কাজে। এমন কি বিনা আহ্বানেই দুপুর-ভর সুভদ্রার পা দুটো টিপে দিলে সে।

বীণাপাণির কাছে সে জানিয়ে বসল এক অসম্ভব আবদার।

বড়দি, খুদিকে আমি সঙ্গে নিয়ে যাব। ওতো আমার কাছেই থাকে। ওকে ছেড়ে থাকতে আমার মন কেমন করবে।

খুদি অর্থাৎ ঐ পেট-রোগা মেয়েটা।

একটা বয়সের পর মেয়েরা স্বভাববশতই কী ভাবে মা হয়ে যায়, পদ্মর কথায় সেটাই প্রকাশ পেল। সে কই একবারও বলল না যে রমণীর জন্যেও তার মনটা কখনো কেমন-কেমন করে উঠবে। মা না-হতে পেরেও মা হওয়ার বয়সটা পেরিয়ে আসার ফলে প্রকৃতিই তার মনের স্বভাবটাকে বদলে দিয়েছে। যার হোক, যেমন হোক কোলে একটা সন্তান পাওয়াটাই স্বর্গ-সুখ। স্বামী-সুখও তুচ্ছ তার কাছে।

গ্রামের চারপাশে ছড়িয়ে গেছে কালকের হত্যাকাণ্ডের খবরটা। রজনী বুঝতে পেরেছে ঝড়ু বা শ্রীপতি কেউই অভিযানে যায় নি। গেছল কি না সে প্রশ্ন করতেও সাহস পেল না সে। পাছে তাদের সঙ্গে পথে দেখা হয়ে যায় সেই-ভয়েই সে আড়ষ্ট হয়ে রইল।

পদ্মকে নিয়ে বাপের বাড়ী যাওয়ার আগে আর কারুর সঙ্গে নয়, কেবল এক জনের সঙ্গে দেখা করবে সে। চারুর সঙ্গে। এতদিন যাবৎ সে যে চারুর প্রতি অমনোযোগ দেখিয়ে এসেছে, সেটা তার অন্তরের এক ধরনের হীনতা। সে কি তাহলে চারুর রূপ-যৌবনটাকেই ভালবেসেছিল কেবল? রূপ-যৌবনের রসটা শুকিয়ে পুকুরের পাঁকের মত শারীরিক দৈন্যের ময়লাটা ফুটে উঠতেই

সম্পর্কের বাঁধনটাকে ছিন্ন করে ফেলতে চাইছে সে। অথচ সে ছাড়া আর কেই-বা আছে চারুর জীবনের দুঃখ-বেদনা নিয়ে ভাববার মত আপন-জন।
রাত্রে চারুর ঘরের দরজার কড়া নাড়া দিলে রজনী।
চারু নিশ্চয়ই খুব অবাক হবে রজনীকে দেখে। অনেক অভিমান প্রকাশ করবে তার ওপর। রজনী নিজের দোষ-ত্রুটির কথা বলে ক্ষমা চেয়ে নেবে। চারুকে সে ভোলে নি। চিরদিনই সে প্রত্যাশা করেছে চারু সুখী হোক্। না, নিছক রূপ-যৌবনের মোহময় ঘোরটা কেটে গেছে বলেই চারুর কাছ থেকে সে দূরে সরে আসে নি। চারু একদিন এই গ্রামের মাটিতে রাজ-রাণীর বেশে পদার্পণ করেছিল। চারুর দিকে চোখ তুলে তাকাতে বুকে সেদিন সাহস কুলতো না লোকের। সেই চারুর আজকের এই ঘুঁটে-কুড়োনীর বেশ রজনীর কাছে বড় মর্মান্তিক। সুখের দিনে সে তার সংগীতের আসরের শ্রোতা থেকে ক্রমে ক্রমে জীবনের অবিচ্ছেদ্য সঙ্গী হয়ে উঠেছিল। দুঃখের দিনে তাঁর হয়ে রজনীর কিছু প্রতিদান দেওয়ার বা প্রত্যুপকার করার ক্ষমতা নেই বলেই নিজেকে আত্মগ্লানিতে গুটিয়ে নিয়েছে সে।
চারু নয়, দরজাটা খুলে দিল আবছা মত একজন পুরুষ মানুষ। দাওয়ায় আলোয় এসে রজনী তাকে চিনতে পারল। কচি পরামানিক। তাকে দেখে অবাক হল রজনী। কচিকে রজনী যথেষ্ট চেনে। চিরকালের ফাজিল ফোকড়, সব সময়েই নব-কার্তিকের মত সেজে থাকে, মেয়েদের সিঁথি কাটার মত করে চুল বাগায়, মেয়ে-ঘটিত ব্যাপারে তার দুর্নামও আছে যথেষ্ট। তবে ছেলেটা খুব আমুদে-আহ্লাদে।
রজনী কচির মুখে তাড়ির গন্ধ পেল।
কচি হাঁক দিলে—ও বৌদিদি, বেরি এস, রজনীদা এসেছে যে।
বৌদিদি! তা হতে পারে। চারুর স্বামী শীতল পরামানিক আর কচির বাবা গজেন পরামানিকের মধ্যে হয়তো কোন আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকতে পারে। কিন্তু এতকাল ত টিকির দেখা মেলে নি কারুর।
চারু রান্না ঘর থেকে বেরিয়ে এল।
এই কি চারু নাকি? চারুর এমন বেশ-বাস, এমন মাজা-ঘষা উজ্জ্বল রূপ ত বহুদিন চোখে পড়ে নি রজনীর। সাদা থানের নীচে সরু কাল পাড়ের বাহারটা নতুন। চোখের তাকানো, দাঁড়ানোর ভঙ্গী, মাথায় চুলের গোছগাছ সব কিছুতেই নতুনত্বের ছোঁয়া। রজনী তার মুখ থেকে চোখ নামাতে পারলে না।

সাদা দাঁতে কাঠের পুতুলের মত প্রাণহীন একটুখানি হেসে চারু বললে—কি মনে করে।

রজনীর মুখে জবাব এল না কিছু।

বোস।

চারু কাঠের চৌকিটা বাড়িয়ে দিলে। রজনী চৌকিতে বসে শুনতে পেলে ঠিক যেন একটি মানুষের রুগ্ন কণ্ঠস্বরের আওয়াজ। অবাক হয়ে এদিক ওদিক তাকাতে গিয়ে তার চোখে পড়ল শূন্য খাঁচায় আর একটি ময়না সাড়া দিচ্ছে। রজনী চারুর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলে—

আবার একটা কিনলে নাকি? এর আগেরটাকে ত আমিই উড়িয়ে দিয়ে গেছলুম। জান কি?

জানি। এটা কেনা নয়, সেইটেই।

সেইটেই? কি করে পেলে তাকে?

কদিন পরেই পুকুর পাড়ের তেঁতুল গাছটায় এসে বসত। ভাল উড়তে পারত না। ঠ্যাংটায় আঘাত লেগেছিল বোধ হয়। পাড়ার ছেলেরা ধরে আনল।

রজনী বসলে চারু চিরকাল তার কাছে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসেছে। বরং দূরত্ব রাখবার চেষ্টা করেছে রজনীই, চারু নয়। সেই চারু আজ কত দূরে। কেন? রাগে অভিমানে? নাকি কচি পরামানিকের উপস্থিতির জন্যে সংকোচে, দ্বিধায়? এখনো কচি পরামানিক কেন বসে রয়েছে এখানে? কি প্রয়োজন তার? কচির উপস্থিতির জন্যে সেও ত মন খুলে কথা বলতে পারছে না। অথচ চারু ছাড়া আর কার কাছে সে তার মনের আর্তি উজাড় করে দিয়ে মনটাকে হালকা করতে পারে। কচির গ্যাঁট হয়ে বসে থাকাটাকে রজনী সহ্য করতে পারলে না। রজনী কচিকে উদ্দেশ করে বললে—তা, কচি কি মনে করে?

কচি এক গাল হেসে জবাব দিলে—এই আর কি!

কিছু দরকার আছে বুঝি?

দরকার? না দরকার কি আর।

রজনী চারুর দিকে তাকাল। সে মৃতের মত দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা খুঁটি ধরে। আকাশে অমাবস্যা ও মেঘের আভাস। দাওয়ায় হ্যারিকেনের আলোটা চারুর মুখ পর্যন্ত পৌঁছতে পারছে না। চারু একবারও মুখ ঘুরিয়ে তাকাল না তার দিকে। চারুর বাড়ীতে এমন মাজা-ঘষা হ্যারিকেনও সে আগে দেখেছে কিনা সন্দেহ হল রজনীর।

রজনী কি করবে, কি বলবে ঠিক বুঝে উঠতে পারল না। শেষ পর্যন্ত সে কচির অস্তিত্বকে অগ্রাহ্য করেই চারুর সঙ্গে কথা বলবার চেষ্টা করলে।

অনেক দিন আসতে পারি নি বিবি-বৌ। মিটিং-অভিযান এই সব নিয়ে ভারী মেতে উঠেছিলাম।

একটু থেমে রজনী আবার বলতে লাগল—কতদিন তোমার এই বাড়ীর পাশ দিয়ে গেছি, তবু ঢুকি নি। মন-মেজাজটা তখন যেন কেমন উল্টোমার্কা হয়ে গেছল। উসব কাজের মধ্যে ভারী একটা নেশা আছে। নেশাটাই সার হল শেষ পর্যন্ত। আর কিছু হল নি। মানুষ এক-ভেবে একটা কাজ করতে চায় হয়ে যায় অন্য রকম।

রজনীর কণ্ঠস্বরে তার পরাজিত আত্মার বেদনা ফুটে ওঠে। চারুর মন তাতেও গললো কি না বোঝা গেল না। গললে সে নিশ্চয়ই মুখ ঘুরিয়ে তাকাতো। তাকিয়ে একটা কিছু কথা বলতই। রজনী সঠিক বুঝে উঠতে পারল না চারুর এত গম্ভীর হয়ে থাকার কারণ কি। এবং কি করেই বা চারুর দৃষ্টি ও মন দুটোকেই সে আকর্ষণ করতে পারবে।

চারু আরও কিছুক্ষণ স্তব্ধ দাঁড়িয়ে থেকে বললে—বোস, চা করি।

চা খাওয়ার অভ্যাস রজনীর নেই। চারুরও কখনো ছিল না। আশ্চর্য! এই কদিনে চারুর জীবন-যাত্রার ভেতরে একটা বড় রকমের ওলোট-পালোট হয়ে গেছে রজনীর অগোচরে। গুঁড়ি পর্যন্ত কাটা অশ্বত্থকে যেমন মাটি থেকে রস, আলো-বাতাস থেকে প্রাণশক্তি সঞ্চয় করে নতুন শাখা-প্রশাখায় আবার একটা নবীন বৃক্ষ হয়ে উঠতে দেখা যায়, চারুর জীবনেও যেন প্রকৃতির সেই রহস্য সুস্পষ্ট।

চারু একটু পরে রান্নাঘর থেকে ফিরে এসে কচিকে বললে—কচি, একটা কাজ করতে হবে যে তোমাকে। চিনি ফুরিয়েছে খেয়াল করি নি। আধপো চিনি এনে দাও না।

কচি বললে—ঝড়তি-পড়তি নেই কিছু। তিন কাপ চায়ের মতও নেই?

কচির যেন দাওয়ার মাটি ছেড়ে উঠতে ইচ্ছা নেই। সে আবার আপত্তির সুরে বললে—অন্ধকারে আবার যেতে হবে এতখানি।

তবু অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাকে উঠতে হল। চারু বললে—টর্চটা নিয়ে যাও।

কচি চলে যেতেই চারু রজনীর পাশে এসে দাঁড়াল।

রজনী বুঝল তাহলে কচির জন্যেই চারু এতক্ষণ দূরে সরে ছিল এমন একটা ভাব

দেখিয়ে যেন রজনী একটা রাস্তার লোক, তার সঙ্গে চারুর মনের প্রাণের সম্পর্ক নেই কিছু, রজনীর আসা-যাওয়ায় কিছুই আসে যায় না তার।

রজনী চারুর দিকে তাকিয়ে বললে—শুধু শুধু ওকে দোকানে পাঠালে ত।

কেন?

চিনি বুঝি সত্যিই ছিল নি?

হ্যাঁ, ছিল।

তাহলে বেচারীকে এতটা খাটালে কেন?

তোমাকে একটা কথা বলার জন্যে।

কি কথা, বল।

তুমি আর এখানে এস নি, ঠাকুরপো।

রজনী ভাবলে অনেকদিন সে চারুর খোঁজ-খবর নেয় নি বলেই চারু কথাটা অভিমান করে বলছে। রজনী সেই অভিমান ভাঙানোর জন্যে বললে—তুমি আমার ওপর রাগ করেছ বিবি-বৌ। সত্যি জান, আমার আসা উচিত ছিল, কিন্তু কি যে হয়ে গেছলাম কদিন।

না, আমি রাগ করে বলছি নি। আমি সত্যি করেই বলছি, তুমি আর কোনদিন এখানে এস নি।

কেন বিবি-বৌ?

আমি খারাপ হয়ে গেছি।

খারাপ? খারাপ তোমাকে কে বলেছে?

কেউ বলে নি। আমি নিজেই খারাপ হয়ে গেছি। খারাপ না হয়ে ক-বছর ছিলাম, সেইটেই বড্ড খারাপ লাগত। পুরুষ মানুষ হয়েও তুমি এত বোকা কেন ঠাকুরপো? আমাকে দেখেও বুঝতে পারছ নি কিছু।

যে মুহূর্তে রজনী খারাপ হয়ে যাওয়ার যথার্থ অর্থটা বুঝে উঠতে পারল, তার মাথার মধ্যে কি যেন একটা জিনিস ভেঙে যাওয়ার মত ঝনঝন শব্দ তুলে বুকের দিকে ভারী হয়ে নেমে এল দ্রুত গতিতে। কিছুক্ষণের জন্য তার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসও স্তব্ধ হয়ে গিছল হয় ত। চারুর দিকে তাকাবার চেষ্টা করতে গিয়ে সে অনুভব করল চারু যেন তার থেকে কোটি যোজন দূরত্বের ব্যবধানে দাঁড়িয়ে। রজনীর জীবনের উজ্জ্বল রঙের অতীতটুকু সেই দূরত্বের মাঝখানে কোথায় যেন হারিয়ে গেছে বিন্দুর মত। চোখ ফেটে কান্না নেমে আসার উপক্রম হতেই রজনী বললে—আমি তবে চলি বিবি-বৌ।

চারু বললে—থাম, চা খেয়ে যাও।

না, চা আমি খাই নি। থাক।

রজনী উঠোনে নামবার উপক্রম করতেই চারু হাত বাড়িয়ে ধরল তাকে। ব্যথিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলে—আমার ওপর রাগ করে চলে যাচ্ছ বুঝি।

রজনী কথার উত্তর না দিয়ে চোখের উদ্গত অশ্রুকে সামলাবার চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না। অশ্রুভরা কণ্ঠে সে হঠাৎ বলে উঠল—না বিবি-বৌ, তোমার ওপর রাগ করি নি আমি। তুমি যদি এইভাবে বেঁচে সুখী হও, তাহলে আমার রাগ করার কি আছে। তবু আমার মনে একটা কষ্ট রয়ে গেল শেষ পর্যন্ত তুমি এভাবে না বাঁচলেই আমি সুখী হতাম বেশী। ছনিয়ায় মানুষ শেষ পর্যন্ত সুখী হয় বটে, কিন্তু ঠিক যে যেভাবে সুখী হতে চায় সে সেভাবে পারে না। তোমার খাঁচার পাখীটাকে আমি আকাশে উড়িয়ে দিয়েছিলাম. আকাশের পাখী আকাশে উড়েই সুখ পাবে বলে। কিন্তু দেখ আবার সেই খাঁচাতেই ফিরে এসেছে ঠিক। আকাশকে ভুলে গেছে বলেই দাঁড়ে দড়ি-বাঁধা হয়ে দিন কাটাতেই ওর সুখ এখন।

রজনীর কথাগুলো চারুর কানে যতই হুর্বোধ্য ঠেকুক, কিন্তু তার ভাষার বেদনা-মণ্ডিত আবেগটুকু চারুর অন্তরকে অভিভূত করে তুলল। চারু তাই হঠাৎ বলে ফেলল—চল না, আমরা কোথাও চলে যাই রজনী।

চারুর কণ্ঠে এমন বেসুরো বেপরোয়া প্রশ্নে রজনী বিস্মিত হল না, চারুর মনটা তার জানা আছে বলেই। সে চারুকে প্রবোধ দেওয়ার ভঙ্গীতে বললে —পৃথিবীতে আর কোন্‌খানে গেলে তুমি এর চেয়ে অন্যরকমভাবে বেঁচে থাকার সুখ পাবে বিবি-বৌ? সবখানেই এক রকম বিঘ্ন। আলো ভেবে যার দিকে হাত বাড়াই, আগুন হয়ে সেই হাত পোড়াতে আসে। অন্ধের মত বাঁচতে পারলে সুখ আছে খানিকটা। অন্ধের কাছে অন্ধকারই আলো।

অন্ধকারে দরজার কপাট নড়ে উঠতেই রজনী বললে—আমি যাই।

চারু কি যেন একটা কথা বলতে চাইছিল। ততক্ষণে কচি সামনে এগিয়ে আসায় সে কিছু না বলে ঠায় নিস্তব্ধ দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ।

কচি চিনি আনল বটে কিন্তু চারু আর চা করতে গেল না। কচিকেও বিদায় করে দিলে সঙ্গে সঙ্গে। কচিকে আজ একটা কথার জবাব দেওয়ার দিন ছিল চারুর। শশী রাউত এখানে আসতে চায়। টাকার পরিমাণও জানিয়ে দিয়েছে। চারু ঘোরাচ্ছে কেবল, জবাব দিচ্ছে না। আজও কচিকে বিনা জবাবে

ফিরে যেতে হল। শশী রাউতকে গিয়ে কী জবাব দেবে সেই ভাবনাই বিপর্যস্ত করে তুলল কচিকে। বাইরে বেরিয়ে তার দাঁতগুলো কড়কড় করে উঠল রজনীর বিরুদ্ধে আক্রোশে।

ঐ শালার ছেলে এসেই বোধহয় কানে ফুস-মন্তর দিয়ে গেল কিছু। অনেক বছর আগে ওকে একবার ঠেঙানো হয়েছিল। আর একবার দরকার হয়ে পড়েছে দেখছি।

কচি পরামানিকের চেয়ে আরও জোরে গুমোট মেঘের আকাশটা মধ্যরাত্রে ডেকে উঠল কড়কড় শব্দে। তার পর উঠল প্রবল ঝড়। উঁচু গাছের মাথার ওপর দিয়ে ছুটে চলা ঝড়ের হু-হু হাওয়ায় খড়ের চাল তছনছ হয়ে উড়ে গেল অনেক সংসারের। চারপাশের জঙ্গা-জমির আলে একটা বাবলা গাছও সিধে ঘাড়ে দাঁড়িয়ে নেই, সব মুখ থুবড়ে শুয়ে পড়েছে মাটিতে। ঝড় থেমেছে শেষ রাতে। তার পর সকাল পর্যন্ত চলেছে বৃষ্টি।

পদ্ম এসে ঘুম ভাঙালো রজনীর। রজনীর ঘুম ভাঙতেই পদ্ম বললে—বিকেলে যদি রোদ ফোটে তাহলে বিকেলেই যাবে ত ঠাকুরপো?

আজ সকালে পদ্মর বাপের বাড়ী যাওয়ার ঠিক ছিল রজনীর সঙ্গে। রজনী সায় দেয় পদ্মর জবাবে। পদ্ম খুশী হয়ে রজনীর মাথায় আঙুল বুলোতে থাকে।

রজনী জিজ্ঞেস করে সুরেন ও রমণী কোথায়?

রমণী গেছে কাজে। সুরেন গেছে মাঠে। বৃষ্টিতে মাঠের মাটি কতটা নরম হল, লাঙল গাঁথবে কিনা, না গাঁথলে আরও কতটা বৃষ্টির দরকার উপর্যুপরি, বৃষ্টি না-নামলে সামনে যে-সব কোটাল আছে সে কোটালে কোন্‌খানে খাল কেটে জমিতে জল তুলতে হবে, এ-সবের হিসেব-নিকেসের প্রয়োজনেই সকাল হতেই সুরেন মাঠে বেরিয়েছে। মাটির চেয়ে আপন তার জীবনে আর কেউ নেই।

দরজা জানালা ভেজানো আবছা ঘরে পদ্মর আদর পেয়ে রজনীর মন হঠাৎ এত খুশী হয় যে সে বিছানায় উঠে বসে পদ্মর কাঁধে হাত রেখে বলে—একটা কথা তোমাকে বলতে পারি মেজকী। কাউকে বলবে নি বল।

না গ, বলব নি।

আমার গা ছুঁয়ে দিব্যি কর।

এইতো করলাম। এবার বল।

আমি চারুকে নিয়ে কোথাও চলে যাই যদি।

ওমা! সে যে তোমার চেয়ে বয়সে বড়। আর তা ছাড়া সে বিধবা না?

বিধবা সধবা নিয়ে আমার কি হবে। আমাকে পেলে সে যদি সুখী হয় জীবনে, আমি সেটা করব নি? পৃথিবীতে মানুষকে দুঃখ দেওয়ার লোক অনেক আছে, সুখী করার লোক কজন? আমি যদি পৃথিবীর একটা মানুষকেও সুখী করতে পারি তাহলে ধন্য হয়ে যাই।

পদ্ম তার কাঁধ থেকে আস্তে হাতটা সরিয়ে দিয়ে রজনীর দিকে পিছন করে দাঁড়ায়। একটু পরে আস্তে আস্তে কেমন একটা অচেনা স্বরে বলে—মানুষকে সুখী করার জন্যে তোমার বুকে বুঝি মমতা একদম উপচে পড়ছে। আর সেইজন্যেই পৃথিবীতে চারু ছাড়া আর কোন দুঃখী মানুষ খুঁজে পাও নি তুমি। পুরুষ মানুষ না হলে আর এমন অন্ধ হয়।

পদ্ম কথাগুলি খুবই আস্তে উচ্চারণ করে। প্রায় মনে মনে বলার মত নিঃসাড়ে। কিন্তু সেই অর্ধস্ফুট কথাগুলিই রজনীর বুকে ঢেঁকির পাড়ের মত ঢপঢপ করে বেজে ওঠে। কিছুক্ষণের জন্যে বিমূঢ় ও স্তব্ধ হয়ে যায় সে। তার পর পদ্মর হাতটাকে ধরবার চেষ্টা করে ডাকে—মেজকী।

পদ্ম হাতটা ছাড়িয়ে নেয়। রজনী তার মুখখানাকে জোরে নিজের মুখের দিকে টেনে তোলে। টেনে তোলার ঝাঁকুনিতেই তার চোখের কোণের অশ্রুর দুটি বড় ফোঁটা রজনীর আঙুল ছুঁয়ে গড়িয়ে মাটিতে পড়ে।

রজনী বোকার মত বেরিয়ে আসে ঘর থেকে।

আকাশের নির্মল ও স্বচ্ছ বৃষ্টি ধারা মাটির স্পর্শে কদর্য কাদার স্রোত হয়ে যেখানটায় পুকুরে গড়িয়ে পড়ছে, রজনী সেখানে এসে দাঁড়ায়। মাথার ওপরে একটা বড় আম গাছ। তার পাতা থেকে টপ্‌টপ্‌ করে জল ঝরে পড়ছে রজনীর আলগা গায়ের ওপর। সরে দাঁড়াবে সে কোথায়? এদিকে জাম অর্জুন শিরীষ ওদিকে কাঁঠাল নারিকেল কামরাঙা। এতদিন ধরে যে-সব গাছ শাখা-প্রশাখায় ও সমূলে দগ্ধ হয়েছে এবার তাদের পাতা বেয়ে এমনি জল ঝরবেই।

রজনী সেই সঙ্গে আরও অনুভব করল এতদিন ধরে যে-মাটির প্রতিটি ধূলিকণা প্রখরতর রৌদ্রে তপ্ত হয়ে উঠেছিল বৃষ্টির শীতল স্পর্শে তাদের উত্তপ্ততা কমে নি আদৌ, বরং যেন মাটির গভীর তলদেশ থেকে ঘন গাঢ় একটা উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস সবেগে উত্থিত হবার চেষ্টা করছে উর্ধ্ব আকাশের দিকে।

এখন মধ্য-বৈশাখ। পৃথিবীতে ঝড়-ঝঞ্ঝা অশ্রু-উত্তাপ অন্ধকার ও ধ্বংসের সময়। পৃথিবীর আকাশ যেখানে বাখুরীর দিগন্তে নেমে এসেছে রজনী সেই দিকে মৃতের মত তাকিয়ে রইল।